সুন্দরবন সমগ্র

শিবশঙ্কর মিত্র

সমকাল প্রকাশনী

৮/২এ গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ : ১৩৭১

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক করেছেন :
সিবিএইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নিউ প্রাইমা প্রেস
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
সুনীল কুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯।২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

বেদে বাউলে

এই রোমাঞ্চময় কাহিনী, এই বেদনায় আসিক্ত ও আনন্দে আপ্লুত কাহিনী কেমন করে কথা-সাহিত্যে তুলে ধরলাম—এই প্রশ্ন অনেক বন্ধুবান্ধব আমার কাছে করেছেন। তার উত্তর একটাই আছে : এই গাঁথার নায়ক, নায়িকা ও প্রতিটি পার্শ্বচরিত্রই আমার কাছে যেন জীবন্ত। আমি এদের সঙ্গে মিশেছি একান্ত আপনজন হিসেবে, ভালবাসায় একাত্মা হয়ে গেছি যেন। এদের বেদনার কাহিনী যা লিখেছি তা পুনরায় যখনই আমি নিজে পড়তে গেছি, আমার চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। তেমনি বিপদের মুখে এদের বীরদর্পমণ্ডিত পদক্ষেপগুলির কথা পড়তে গেলে পুনরায় তার ধ্বনি আমার কানে আসে—আমার মেরুদণ্ড খাড়া হয়ে ওঠে। এমনই একাত্মা হয়েছি এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে। তবুও মনে হয়, এদের মনের তরঙ্গগুলি আর এই কাহিনীর পটভূমি সুন্দরবনের অব্যক্ত ইশারাগুলি পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে অপারগ হয়েছি আমার লেখনীর অক্ষমতার জন্য।

আমার একাত্মবোধটা হঠাৎ একদিনে আসেনি। এসেছে সুন্দরবন ও ততোধিক সুন্দর উপকূলবাসী মানুষগুলির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের যোগাযোগের ফলে। সেই ১৯২৮ সাল থেকে যখন আমি সবে যৌবনে পদার্পণ করি। প্রথমেই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক। মনে কামনা ছিলো স্বাধীনতা সংগ্রামী সশস্ত্র এক সৈন্যদলের পরিচালনায় সুন্দরবনের পটভূমিকে কাজে লাগাতে হবে। পিতৃদেবের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' ও তাঁর মুখ থেকে শোনা সুন্দরবনের গল্পগুলি এই ব্যাপারে আমাকে কম প্রেরণা দেয়নি। তখন থেকেই সুন্দরবনের নদী-নালার রেখাচিত্র ও মানুষের ইতিবৃত্ত নিয়ে যেমন মেতে উঠি, তেমনি এই বনে ও এই অঞ্চলে আসা-যাওয়া শুরু করি। বৈপ্লবিক সংগ্রাম আমলে পলাতক জীবনে এই অঞ্চলের নদী-নালা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাই। তারপর দীর্ঘ আট বছর জেলে বন্দীদশায় কাটে। তখনও আমার পড়াশুনা চলে সুন্দরবন সম্পর্কে বইপত্র যা কিছু যোগাড় করতে পারি।

কারাবাসের প্রথমেই পিতৃদেবের তিরোধান হয়। মৃত্যুর আগে সংসারের অন্ন সংস্থানের জন্য খাস সুন্দরবনবেষ্টিত এক খণ্ড জমি সংগ্রহ করেন। দীর্ঘ কারাবাসের পর এই জমিখণ্ড পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব যেমন আসে, তেমনি আমার জীবনে এক মহাসুযোগ আসে সুন্দরবনের চাষীদের সংস্রবে আসা এবং তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে একত্র বসবাস করার। এই সম্পর্ক নিবিড়তর হয় তাদের সঙ্গে একত্রে তে-ভাগা আন্দোলনে মেতে ওঠাতে।

তারপর থেকে আজ অবধি এপার-ওপার সুন্দরবনের উপকূলবাসী অতুলনীয় মানুষদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনও দিন ছিন্ন হয়নি।

ছিন্ন হবে কি করে! অপূর্ব সুন্দরবনের যেমন যে-কোনও মানুষকে মোহগ্রস্ত করার মোহিনী শক্তি আছে, তেমনি ততোধিক অপূর্ব এই মানুষদের যে-কোনও ব্যক্তিকে কাছে টেনে একান্ত আপনার করে নেবার, একাত্মা করে নেবার এক অসাধারণ চুম্বক-সম আকর্ষণ আছে। কেননা, এমন সরল, এমন দুর্ধর্ষ, এমন সবল ও তেজময় মানুষগোষ্ঠী মেলা দায়। ফলে আমি যেমন বনের মোহিনী শক্তিতে আবিষ্ট হই, তেমনি এইসব মানুষের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হই একান্তভাবে একাত্মা হয়ে।

সুন্দরবনের এক অসমসাহসিক বনোয়ালি বেদে বাউলে

এক

সুন্দরবন অঞ্চলের সব চেয়ে বড় গঞ্জ—'বড়দল'। চব্বিশ-পরগনা থেকে বরিশাল অবধি বিস্তৃত সুন্দরবনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত এই গঞ্জ। নদী-পথে এই গঞ্জের যোগাযোগ সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে।

এ-দেশের মামুলি রীতি অনুযায়ী বড়দলে হাট বসে সপ্তাহে একদিন—রবিবার। সেদিন ভোর সকাল থেকে গভীর রাত অবধি লাখো-লাখো টাকার বিকিকিনি হয় এই হাটে। সামনের বিস্তৃত নদী যেন ঢাকা পড়ে যায় ডিঙি, পানসি, টাবুরে, পালোয়ার, আরও কত রকম-বেরকমের নৌকোয়। টানা তিন মাইল পরিসরে নদীর এপারের জল দেখা যায় কি যায় না।

নামে হাট মাত্র একদিন হলেও সারা সপ্তাহ কেনাবেচার ধুম চলে অবিরাম। কেউ বা আসে জোয়ারের টানে, কেউ বা আসে ভাটির টানে। দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীরা, কলকাতার বড়-বড় কারবারিরাও পাকা কোঠার দোকান দিয়েছে শত-শত।

এমনি ধরনের একটা কাপড়ের দোকানে অনিল কাজ করে। অনিলচন্দ্র নাথ। বয়স তার আর কত হবে—এই উনিশ, না হয় বিশ। গোঁফ-দাড়ির রেখা দেখা দিয়েছে সবে। অনিলের দোহারা চেহারা শত-শত লোকের মধ্যে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে না হোক, গ্রামে গ্রামে দু-একজন যুবক থাকে—কেমন যেন তাদের দেখলেই মনে হয় কবি-কবি ভাব। অনিল তেমন দেখতে হলেও তার দেহের গড়ন কিন্তু বলে দেয়—সে শক্তিধর আর কর্মঠও বটে।

কিন্তু মা-র তো ছেলের চরিত্র বুঝতে বেগ পেতে হয় না; তাই মা অনিলের আদুরে নাম দিয়েছিলেন 'বেদে'। রাতদিন বনে-বাগানে, না হয় মাঠে ও বিলে ঘুরে বেড়াবে। সংসারে জমি-জিরেত বিশেষ নেই। সংসারে আর কেউ সমর্থজন না থাকাতে বিধবা মা একদিন বেদেকে অনুরোধ উপরোধ করে বলেন,—কী রে! এমনি করে শুধু ঘুরে বেড়ালেই হবে! লেখাপড়া যা একটু শেখার তা তো হয়েই গেছে। কিছু আয়-টায় কর। এমনভাবে আর তো সংসার টানা যায় না।

বেদে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে বলে,—কেন? আমি আয় করি না? এই তো সুপুরি পাকলে কত টাকা এনে দিলাম। দিই নি?

—তা তো দিয়েছিস। কিন্তু তাতেই কি বছর ঘোরে? যা না বড়দলে। একটা কাজ নিশ্চয়ই মিলবে।

—তোমার যেমন মেয়েলি বুদ্ধি! গঞ্জ হলেই মনের মানুষ মেলে?

—রাখ তোর কাব্যি। যা না নগেন দত্তের বিলেতি কাপড়ের দোকানে। অত বড় দোকান ওখানে আর একটিও নেই। একটা না একটা কাজ ওখানে মিলবেই।

সুপুরি পেড়ে কিছু পয়সা অনিল সত্যিই তিন-চার বছর এনেছে। ভবঘুরে হয়ে ঘুরতে অনিল যেমন মজা পেত, তেমনি কথা-নেই বার্তা-নেই গাছের ডালে উঠে দোল খাওয়াও ওর নেশা ছিল।

এই নেশাই সুপুরি পাড়ার কাজে ওকে টেনে নেয় বটে, কিন্তু ওর আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভও ওকে কম টানে নি।

যশোর, খুলনা বা বরিশালের সুপুরি-বাগান যে দ্যাখে নি, তার পক্ষে এই নেশা বোঝা দায়। শত-শত সুপুরি গাছ একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ-পঁচিশ হাত মাথা তুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে সারা বাগান জুড়ে। অনিল কিন্তু প্রতি গাছে ওঠা-নামা করে সুপুরি পাড়ে না। দীর্ঘ বাগানে একটা গাছেই মাত্র একবার ওঠে। তারপর দে-দোল করে সে গাছের মাথা দোলাতে দোলাতে ঝুলের মাথায় চট করে আরেকটা গাছের মাথা জড়িয়ে ধরে সে গাছে চলে যায়। এমনি করে দোলার পর দোলা খেয়ে প্রায় শ'খানেক সুপুরি ভাঙার পর শেষ গাছটা আলগোছে হাতে-পায়ে জড়িয়ে ধরে সেদিনের মত সড়্-সড়্ করে মাটিতে নেমে আসে। বাগানের মালিক তো ব্যাপারখানা দেখে বলে উঠে, 'শাবাশ!'

গাছ থেকে গাছের দোলানি আর এই 'শাবাশ'-টুকু পেতেই অনিল মশগুল। গুনতিতে কত পয়সা পাবে কি পাবে না, সেদিকে ওর মন থাকতো না।

এখন দোকানেই অনিল পয়সা রোজগার করছে। কিন্তু এই দোকানের কাজই ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। দোকানি বিধবা মায়ের অনুরোধ মেনেছে বটে, কিন্তু কাজ দিয়েছে মাত্র সপ্তাহে তিনদিন। অনিলকে কাজ করতে হয় শনিবার, রবিবার আর সোমবার। সপ্তাহে এই তিনদিনই দোকানে থাকে মহাভিড়। শনিবার প্রস্তুতির ঝামেলা, রবিবার খদ্দেরের তাড়াহুড়ো ও হৈহল্লা, আর সোমবার উৎসবের শেষ-বেশ ও হিসেব-নিকেশ। তারপর চারদিন ছুটির পরিবেশ। অনিলের মতো কাব্যিক মনের পক্ষে বন-বাদাড়ের এই অঞ্চলে আত্মজ উপভোগ করতে এতটুকুও বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে কাল হলো একটা বন্দুক। শনিবার দোকানে যে কোণটায় বসে অনিল হিসেব-নিকেশের কাজটা করতো, তারই সামনে মালেকের গদির পাশেই এই বন্দুকটা ঝুলতো। যতই দিন যায় ততই এই বন্দুকটা আকর্ষণ করতে থাকে অনিলকে। আবাদি নদীর দমকা হাওয়ায় বন্দুকটি একটু নড়ে উঠলেই অনিল একবার সেদিকে তাকাবেই তাকাবে। তেমন দোলানি হলে তো হাতের কর গুনে হিসেব করতে গড়বড় হয়ে যেত; আবার নতুন করে কর গুনতে হতো।

বন্দুক মানেই তো শুধু প্রাণ-হরণকারী যন্ত্র নয়। বনের রহস্যে আমোদিত হবার ভরসা জোগায় এই অস্ত্র। কাজেই এই বন্দুকই অনিলকে টেনে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত বনে—সুন্দরবনের বাদায়।

মালেক ঠিক নয়, মালেকের ছেলে, নাম হলো অবিনাশ সাহা। সে নিজেই শনিবার দোকানের হিসেব-নিকেশ দেখতো। ভাটি অঞ্চলের মানুষের কেমন যেন গালভরা নাম পছন্দ হয় না। 'অবিনাশ'কে সরল করে নিয়ে ওকে প্রথম প্রথম সবাই ডাকে 'বিনাশবাবু' বলে। ফাঁকা নদীর দেশে একে অপরকে হাঁক দেবার সময় শব্দ যেন ছুঁড়ে মারতে হয়। সেইজন্যই 'বিনাশবাবু' শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে 'বিলাসবাবু'।

একদিন অনিল তো কাজের ফাঁকে ঝুলন্ত বন্দুকের দিকে তাকিয়ে বলেই বসলো,—তা বিলাসবাবু! বন্দুকে তো মরচে ধরে যাবে। চলো না একবার বনে ঘুরে আসি?

উঠতি-বয়সের রক্ত বিলাসবাবুর গায়েও। সঙ্গী পেয়ে ঝট করে বলে,—তা কার না ইচ্ছে করে, বলো? কিন্তু বাপে কি ছাড়বে!

—তুমি তো আচ্ছা, বাপে জানবে কোত্থেকে? সুন্দরবন তো এক গোনের পথ, ভাটিতে যাবো আর জো-তে ফিরে আসবো। সকালে যাবো, বিকেলে ফিরে আসবো। ধরা পড়লে, সটান বলতে বাধা কী—দোকানের বাকি-বকেয়া আদায় করতেই তো গিয়েছিলাম!

এমনি করেই একদিন শুরু হয় ওদের সুন্দরবন অভিযান। সুন্দরবনের সংস্পর্শে এসে বিলাসবাবুর কী হয়েছিল বলতে পারবো না। তবে, অনিল যেন একদম মজে যায়। সুন্দরবনের সঙ্গে বেশিদিন দেখা না হলে যেন ওর মন উশখুশ করতে থাকে।

প্রথম যেদিন যায় সেদিন সঙ্গে বন্দুক ছিল বটে, কিন্তু শিকারের কথা মোটেই ভাবতে যায় নি! ভয় ছিল দুটো—প্রথমত, বাঘের, আর দ্বিতীয়ত, বনকর পেট্রলবোটের। এই দুইয়ের খপ্পরে যাতে ওদের না পড়তে হয়। অঘোষিত ভাবে সুন্দরবন তো বাঘের রাজ্য; আর বন মানে তো শুধু বন আর বাঘ নয়, বন এক মহাসম্পদ, আর সে সম্পদের ঘোষিত রাজা হলেন বনকর অপিস। দুই-ই দুভাবে বনের রক্ষক। বনের আওতায় এলে কখন যে এরা আচমকা ছোবল মারবে, তার হদিস পাওয়া দায়।

বনের সীমানা বরাবর বড় নদী থেকে একটি খাল বনের মধ্যে সর্পিল গতিতে প্রবেশ করেছে। খালটি খুব বড়ও না, আবার খুব ছোটও না। ভাটি শেষ আর জো আগন্তুক; জলের গতি থমকে আছে। অনিল ডিঙির মুখ খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ডিঙিতে ওরা মাত্র দুজন—পেছনের গলুইতে অনিল বোঠে হাতে, আর সামনের গলুইতে বিলাসবাবু বন্দুক হাতে। ধারে-কাছে চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেমন কোনও জীবন্ত জীব নেই, তেমনি কোনও তৃতীয় মানুষের সাড়াও নেই। নিঝুম—এত নিঝুম যে ওদের গা শিরশির করে ওঠে। ওদের কথাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। আশপাশের কাকলি যেমন মানুষকে সরব করে তোলে, নিদারুণ নির্জনতাও তেমনি মানুষের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেয় যেন। অনিলকে বোঠে চালাতেই হচ্ছে। কিন্তু বোঠে এখন জল থেকে না তুলেই চালাতে থাকে—যাতে বোঠে আর জলের আঘাতে ছপ্‌ছপ্ শব্দে ওদের আগমনবার্তা আগেভাগেই ঘোষিত না হয়ে যায়।

একটা বাঁক ঘুরতেই অনিল চমকিত এবং পুলকিতও বটে। খালের দুপারের বড়-বড় গাছগুলি যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই হেলে একে অপরের শাখার বাহু-বিস্তারে আলিঙ্গনাবদ্ধ। একে অপরে জড়াজড়ি করে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করেছে। নীচে পলিসিক্ত শুভ্র জলধারা, আর মাথার উপর গাঢ় সবুজ পাতার ছাদ। এমন সুড়ঙ্গ পথে এগুনো ঠিক হবে কি না, তা না ভেবেই অনিল এগিয়ে নিয়ে যায় তার ডিঙি এই মজার পরিবেশে।

আলো-আঁধারে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ-পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। এতক্ষণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ ছিল, এবার ওদের ভয়গ্রস্ত ও আশঙ্কান্বিত হবার পালা। খাল হঠাৎ বিস্তৃত হয়ে একটা গোলাকার জলাশয় সৃষ্টি করেছে বনের গহিনে। এই ফাঁকা জলাশয় সূর্যালোকে আলোকিত। আর তাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে ঠাসা গোল-ঝাড়ের বলয়। ডিঙির মাথা এই জলাশয়ে প্রবেশ করতেই দূরে যেন কোনও বড় জলজীব জলকে তোলপাড় করে তুলল। বড় কইভোল মাছ, না কুমির—তা পরখ করার অপেক্ষা না করে অনিল মুহূর্তমধ্যে ডিঙি ঘুরিয়ে দিয়ে পশ্চাৎগামী। এবার ধীরেসুস্থে নয়, ঝপ্‌ঝপ্ করে বোঠে চালালো। বিলাসবাবুও বিপদ গুনে বন্দুক রেখে ক্ষিপ্রবেগে বোঠে চালালো। যে-কোনওভাবে দ্রুত ফিরে আসতে হবে বড় নদীতে, তারপর অন্য চিন্তা।

ফিরে এলো ওরা সে-বারের মতো। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে এলো। ফিরলে কী হবে,

সুন্দরবনের উপকূলবাসী যুবক ভয়ের প্রথম ঝলকে সন্ত্রস্ত হলেও পিছপাও হয় না। ওরাও হয় নি।

এরপর বারবার কতবার যে ওরা দুজনে বনে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বড়দলের হাটে কোনও শিকারির সন্ধান পেলে তো কথাই নেই; তাকে আপন করে নিয়ে বাঘ বা হরিণ শিকারের গল্পে মেতে উঠতো। বাঘ-শিকারের গল্পে ততটা উৎসাহিত হতো না। কারণ, ওরা ধরেই নিয়েছিল ওটা ওদের এখন এক্তিয়ারের বাইরে শুধু নয়, সাধ্যের বাইরেও। কিন্তু কোথায় হরিণ পাওয়া যায়, কী ভাবে পাওয়া যায়, আর কীভাবেই বা শিকার করা যায়, তা জানবার জন্য ওদের ব্যগ্রতার শেষ ছিল না। শুনতে শুনতে আর বারবার বনে গিয়ে শোনা কথা পরখ করতে করতে ওদের আত্মবিশ্বাস এসে গেছে—ওরা একদিন না একদিন হরিণ শিকার করতে পারবেই। পারতেও দেরি হয় নি। এখন ওরা সুযোগ পেলেই বনে যায়, আর প্রায়ই শিকার করে নিয়ে আসে।

একবার একই দিনে এবং এক যাত্রায় দুজনে তিন তিনটে হরিণ শিকার করে আনলে বড়দলে 'ধন্যি-ধন্যি' পড়ে যায়। তিনটির মধ্যে দুটি ছিল শিঙেল। শিং নিয়ে বড়দলের দোকানিদের মধ্যে রেষারেষি দেখা দেয়। সে নিজেই তিনটি হরিণ শিকার করেছিলো এবং বড়দলের অনেক অনেক দোকান-ঘরে মৃগ-মাংসের ভাগ দিতে পেরেছিলো—তাতেই অনিল পরম পরিতৃপ্ত। উৎসাহে তার মা-কেও টেনে নামায় ঘর-ঘর মাংস বিতরণের কাজে। 'শাবাশ' কথাটা এবার মা-র মুখ থেকেও শুনে বেদে যেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে যায়। সে নিজের জন্য কিছুই রাখে নি —মাংস, চামড়া বা শিং, কিছুই না। সবই বিলিয়ে দেয়।

বড়দলের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আদব-আপ্যায়ন পেয়ে অনিলের দিনগুলি সহজ হয়ে এসেছিল। মা তো বেদের বিয়ে-থাতে রাজি করাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কাল হলো ১৯৫০ সাল। খুলনার ১৯৫০ সালের দাঙ্গা। তার রেশ বড়দলেও পৌঁছতে দেরি হয় না। দাঙ্গা অবশ্য এখানে হয় নি। কিন্তু হিড়িক পড়েছে সরে পড়বার। ডিঙির পর ডিঙি জুটিয়ে হাঁড়িকুড়ি, বিছানা-পেটরা নিয়ে জো'তে ভাসিয়ে দিচ্ছে আশাশুনি-হিংগলগঞ্জ পথে।

একে একে নয়, দলে দলে। দলে দলে বটে, তবে হৈ-হল্লা বিশেষ নেই। বিপদে-আপদে দলে দলে চলার নেশা সর্ব মানুষের। এমন অবস্থায় দেশ-ভুঁই ছেড়ে যাবার পেছনে অকাট্য যুক্তি থাকলেও, কিসে যেন ওরা ম্রিয়মাণ! বাঘের ভয়ে নয়, বন্যার ভয়ে নয়, প্লাবনের ভয়ে নয়, মহামারীর ভয়ে নয়—এসবের বিরুদ্ধে ওরা রুখে দাঁড়াতে জানে। শেষ পর্যন্ত কিনা মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসের আগুনে ওরা পলাতক! ওরা যেন মাথা তুলে কথা বলে না আর। তাই হৈ-হল্লা বিশেষ ছিল না। একমাত্র ছোটদের কাছে এটা একটা মজার যাত্রা ছিল—মা-বাবা, পাড়াপড়শি সবাই একত্র চলেছে। এতেই যা একটু সরবতা দেখা দেয় এই মানুষের ভিড়ে।

হিংগলগঞ্জ পশ্চিম-বাংলার সীমানায় কালিন্দী নদীর তীরে। তারপর এক জো'তে পৌঁছে যাবে সবাই হাসনাবাদ-কলকাতার রেলপথ ধরতে। কলকাতামুখী হলে আশ্রয় নিশ্চয় মিলবে, এটা এ দেশের সবারই বদ্ধমূল ধারণা। কলকাতা মহানগরী, মহান তার আতিথ্যও।

অনিল ও তার মা ভিড়ে পড়েছে এই দলে। বিলাসবাবুই ওদের ডিঙি জুটিয়ে দেয়। বিলাসবাবুদের ডিঙির বহরও এই সঙ্গে চলেছে। মা-র এক মহা বিশ্বাস ছিল—আর কিছু না হোক, বিলাসবাবু ওদের একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেই দেবে।

বিলাসবাবুর বহরের পাশেই অনিলের ডিঙি। এক ফাঁকে কিছু সময়ের জন্য বিলাসবাবু সে-ডিঙিতে এক লাফে এসে পাটাতনের উপর লেপটে বসে মা-র সঙ্গে গল্প করে যায়। গল্প যাইহোক, তার মধ্যে অনিলের নানা গুণের তারিফই ছিল বেশি। মা বিশেষ কথা বলেন নি।

'হ্যাঁ' বা 'না' বলেই সব প্রশ্নের উত্তর শেষ করে দেন। শুধু বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন—এই ছেলেটাই আজ ওঁর ভরসার স্থল। বারবার কামনা করেছেন, বেদে যেন ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে মুহূর্তের জন্য কোনদিনও ভুলে না যায়!

বড়দল থেকে কয়েক বাঁক উত্তরে এগিয়ে ওরা আশাশুনির খাল ধরেছে। এবার সোজা পশ্চিমে যাবে কালিগঞ্জ অবধি। গোটা পথটা কিন্তু একটানা যাওয়া যায় না। আশাশুনি খাল দোয়ানি; দুদিক থেকে জোয়ারের জল ঢোকে। এই দীর্ঘ খালপথে প্রথমার্ধে জোয়ারের টানে এগুতে হবে, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভাটির টানে কালিগঞ্জ পৌঁছতে হবে। মাঝপথ থেকে ভাটির টান ধরতে কিছুটা গড়িমসি করতে হয়, অথবা লগি পুঁতে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের। দুদিকের জো'র জল ধাক্কা খেয়ে এখানে দুপাশে বিস্তৃত বিল সৃষ্টি করেছে। এখানেই যতো ডাকাতের ভয়। ছিপ্ নৌকোয় তীর-বেগে এসে লুটপাট করে বিলের মাঝ দিয়ে রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। কিন্তু তেমন ডাকাতের ভয় আজ মিছে—নৌকো ও ডিঙির বহর চলেছে গায়ে গায়ে, প্রায় গোটা খালটা জুড়ে। খালটা যেন লোকে-লোকারণ্য।

বড়দল থেকে আশাশুনি অবধি অনিল যাত্রা শুরুর প্রাথমিক তোড়জোড় ও গোছগাছ নিয়েই ব্যাপৃত ছিল, মা-কেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো। আশাশুনি আসতে যেমন সন্ধ্যাও নেমে এসেছে তেমনি ব্যতিব্যস্ততাও কমে এসেছে। স্থির হয়ে বসে অনিল এবার ডিঙির হাল ধরেছে। স্থির হলো বটে, কিন্তু মনের মাঝে একটা বেদনাসিক্ত তোলপাড় শুরু হতে থাকে—এ কোথায় চলেছি দেশভুঁই ছেড়ে; বনকে পেছনে ফেলে এ কোন ইট-পাথরের দেশে চলেছি। পাকা ঘরবাড়ি আর পাথরের রাস্তায় আমার স্থান কোথায় হবে! শেষ পর্যন্ত আমাদের ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে না নিতে হয়।

যতোই এগিয়ে চলে ততোই যেন অনিল পিছনের টান অনুভব করতে থাকে। কিন্তু এই টান কিসের জন্য তার কার্য-কারণ তখনকার মতো ধরতে পারে না। যুক্তি পায় না, তবুও পিছুটানকে অবজ্ঞা বা অবহেলাও করতে অপারগ হয়ে উঠেছে। এই সবুজ গাছ, এই তরতরে নদী, এই ধুধু আবাদ! না, সে তো আগেই দেখেছে কলকাতার উপকূল অবধি গাছের ওপর গাছের সবুজ ঝাড়, দেখেছে খাল ও নদীর জল, দেখেছে ধান খেতের ফাঁকা মাঠ। তাহলে কিসে ওকে পেছনে টেনে ধরছে!

মা তো বেদের এই ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করেন,—কীরে! তুই যে চুপ মেরে গেছিস! কী হলো তোর? এধার-ওধার সবাই কত কথা বলছে, তুই যে চুপ্‌সে গেলি! আরে তোকে অতো ভাবতে হবে না। বিলাসবাবুই তো তোকে ভরসা দিয়েছে একটা কিছু বিহিত হবেই! দেয়নি তোকে ভরসা!

বেদে মা-র কথা শুনে কেমন যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ভরসা!! বিলাসবাবুই তো তার ভরসায় বনে উঠতো, তাই না! ওর ক্ষুব্ধ মনে বনের কথা উঠতেই নিজের বেদনার মূল যেন হঠাৎ খুঁজে পায়—যে-বনে সে নিজেই অন্যের ভরসা, সেই বন ছেড়ে সে আজ কোথায় চলেছে? না, না, বন ছেড়ে কোথাও যাবো না।...বনই আমার ভরসা। বন আছে, আর আছে আমার এই ডিঙি...কে আমাকে জীবন-যুদ্ধে হারাবে!!

তোলপাড় করা এই আবেগ বেদের মনে এলো বটে, কিন্তু মা-কে কিছুই বলতে পারে না। মা-র মনে যে ব্যথা লাগবে। বলুক, মা বলতে থাকুক। গৃহ-হারা গৃহিণীকে পাগল করে তোলা বড় বেদনাদায়ক। চুপ করেই রইলো বেদে। আর বিড়-বিড় করে বলেই চললেন মা।

রাত গভীর. ভাটাও অনেকক্ষণ এসে গেছে। সামনেই কালিগঞ্জ। মাঝারি ধরনের গঞ্জ। না, ডিঙির বহর এখানে থাকবে না। সোজা কালিন্দী নদীতে পড়েই ভাটি থাকতে ওপার হিঙ্গলগঞ্জের চরে লগি পুঁতবে। যাতে জো'র প্রথম টানেই ওরা নৌকো ভাসিয়ে দিতে পারে—উত্তরমুখো। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে প্রায় এক জো'র মুখে হাসনাবাদ—তারপরই কলকাতার পথে বা ছোট রেলগাড়িতে। কিন্তু তারপর ? আর কোনও হদিশ নেই। নাই বা থাকলো, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তো পা দেবে ওরা!

কালিন্দী নদীতে পড়বার মুখে মা তো শেষ রাতের আবছায়া আলোতে বিলাসবাবুর ডিঙির সন্ধান হারিয়ে ফেলেছেন। বিড়বিড় করে বলেন,—হাঁ রে বেদে ! সে ডিঙি তো দেখছি না !

—রোসো ! এবার বড় নদীতে, সাবধানে আঁকড়ে ধরে বসো।...বিলাসবাবু... বিলাসবাবু... !

বেদের ঝাঁঝালো সুরে মা প্রমাদ গুনলেন। এবার হিঙ্গলগঞ্জের চরে সবাই লগি পুঁততেই ভোরের আলোয় পাটাতনে দাঁড়িয়ে বিলাসবাবুর ডিঙি খুঁজতে থাকেন। সেই ডিঙির পাশাপাশি থাকতে মা বড় ব্যস্ত।

বেদে চরে নেমে ভেড়ির ওপর দোকানগুলির দিকে হাঁটু-কাদা ভেঙে এগুতেই মা কেঁদে ওঠেন।

বেদের রুদ্ধ আবেগ এবার রুক্ষ হয়ে যেন ফেটে পড়লো,—না মা, আমি যাব না, যাব না উত্তরমুখো। এপার যখন এসেছি, ওপার আর যাবো না। কিন্তু...বন, বন আমি ছাড়বো না। বনের পাশেই আমি থাকবো। যাবো না ওদের সঙ্গে !

যেমন দৃঢ়ভাবে কথাগুলি বললো, তেমনি দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটুকাদা ভেঙে উপরে উঠে যায়।

ক্রন্দনরত মা-কে ফেলে অনিল বেশিক্ষণ বাজারে থাকতে পারে না। কোনো মতে চিঁড়ে-বাতাসা কিনে যেন ছুটে চলে আসে ডিঙিতে।

তখনও মা ডুকরে-ডুকরে কাঁদছেন দেখে বেদে আর থাকতে পারে না—চলো মা ! তোমার যখন এতই সাধ, তোমাকে বিলাসবাবুর ডিঙিতে দিয়ে আসি। তুমি কলকাতা যাও। আমি যাবো না...কিছুতেই যাবো না।

কথাগুলি শুনতেই মা-র কান্না থেমে গেছে। চুপ করে কালিন্দীর থম মারা জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বেশ আস্তে আস্তেই বললেন,—বেদে ! তুই কি পাগল হয়েছিস ! আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাবো ! তোর যা খুশি তাই কর।

এবার বেদের চোখে জল আসার পালা। ভিজে চোখের পাতায় ধরা গলায় বললো,—মা, চিঁড়ে খাবার ব্যবস্থা করো। জো' এসে গেছে। এখনই ওরা লগি তুলতে ব্যস্ত হবে। যাকগে ওরা যে চুলোয় যেতে চায়। আমরা এবার চান করে খেয়ে-টেয়ে নি। তারপর ভাটির টানে আমরাও চলে যাবো উল্টো দিকে।

শ'খানেক ডিঙি আর নৌকো-বোঝাই ভাবনায় পীড়িত মানুষের দল দেখতে দেখতে জোয়ারের টানে আর পালের হাওয়ায় 'ভাসিয়ে দিল তাদের তরী'।

* * *

দুপুর গড়াতে না গড়াতে ভাটি এসে গেছে। কাপড় ঠেকা দিয়ে ডিঙিতে খুপরি বানিয়েছিল অনিল। গায়ে আড়মোড়া দিয়ে তারই ভিতর থেকে বাইরে উঠে এসে বলে ওঠে,—দেখেছো মা ! আমরা একা নই। কতো নৌকো একে একে ছাড়ছে ভাটির টানে। এরা সব নিশ্চয় এসেছিল মালপত্র নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জের হাটে। মালপত্র ওপার পাচার করে এখন সব ঘরমুখো। চলো, আমরা এদের সঙ্গেই চলে যাবো।

মা এখন শান্ত। ছেলের ওপর একান্ত নির্ভরশীল। বললেন, —ভালই হলো, বেদে। ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চল। তাড়াতাড়ি লগি তোল।

স্রোতের টানে বনের উপকূলে আসতে দেরি হয় না। বন দেখতেই অনিল যেন চিৎকার করে বলে ওঠে,—মা ! মা ! দেখেছো বন। তুমি তো কোনোদিন বনে ওঠোনি। এবার দেখে নাও সুন্দরবন কাকে বলে।

মা-ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন,—এগুলি কী গাছ ? এ গাছ তো বড়দলে দেখিনি।

—দেখবে কোত্থেকে ? এ গাছ বনে ছাড়া আর কোথাও মেলা দায়। ঐ দ্যাখো গরান আর গেঁয়ো গাছের ঝাড়। বনের এই 'ঘেরের' নামও আমি জেনে নিয়েছি। এটা হলো গিয়ে ঝিলার বন। এখানেও বেশ হরিণ পাওয়া যায়।

কাপড়ের খুপরিতে একটু গা এলিয়ে দিতে গিয়ে মা মাদুরে মোড়া কাঁথা-বালিশ বের করতে গেছেন। বের করবেন কি ! আঁতকে উঠে চাপা গলায় যেন আর্তনাদ করলেন,—বেদে ! বেদে ! এটা কী রে ?

—ওঃ তাইতো ! আশাশুনি বড্ড ডাকাতের ভয়। ভয়ে বিলাসবাবু ডাকাত তাড়াতে বন্দুকটা আমার হাতে দেন। আমিও ভুলে গেছি, উনিও ভুলে গেছেন নিতে। যেটা যার ভাগ্যে থাকে। যাকগে, ভালই হলো।

—ভালই হলো ? ওর জিনিস তুই রেখে দিবি ? এটা কেমনধারা কথা হলো ?

—রেখে দাও ওটা কাঁথা-বালিশ চাপা দিয়ে। না হয়, পাটাতনের নিচে রেখে দাও। পিটেল-পুলিশ দেখলেই হুজ্জত করবে।...আরে, তোমার অত ভালমন্দ বিচার করতে হবে না।

মায়ের বিবেককে শান্ত করতে অনিল আরও বললো—আরে, আমরা তো পশ্চিম দিকেই যাব। কলকাতাও নিশ্চয় কাছে-পিঠে পড়বে। না-হয় একবার কলকাতায় গিয়ে বিলাসবাবুর খোঁজ করা যাবে।

সত্যি-সত্যি মা এবার শান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন, ঘুমিয়েও পড়লেন।

অনিলের ডিঙি অনেক দূর এসে গেছে। বিশাল রায়মঙ্গল নদীও পার হয়ে এসেছে। কিন্তু বড়নদী পার হবার পর নৌকোর বহরও হালকা হয়ে এসেছে। এ-খাল সে-খাল ধরে যে যার বাড়িমুখো হয়েছে। তবুও ক্যানিং যাবার দলের সংখ্যাও খুব ছোট নয়। তাদের নৌকোর পাশে-পাশেই অনিল এগিয়ে চলেছে।

মাঝপথে দু-একটা ছোট-বড় গঞ্জ যে পড়েনি তা নয়। কিন্তু কোনোটাই অনিলের পছন্দ হয় না। গোসাবায় ওরা যখন হাজির, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সেদিন রবিবার। জম্‌জম্‌ করছে গোসাবা ডিঙি আর মানুষের মেলায়। অনিল ডাঙ্গায় উঠতেই যেন বড়দলের গন্ধ পায় ! চরের উপর সারি-সারি ডিঙি। নদীর ধারে রাস্তার দুপাশে দোকানের সারি। ভিতর দিকে পাকা বাড়ির মহল্লাও দেখা যায়। বড়দলের মতো স্টিমার স্টেশন নেই বটে, তবে লঞ্চ-ঘাট আছে। হঠাৎ অনিল সিদ্ধান্ত নেয়—এটাই হবে আমার আস্তানা। মা-র সম্মতি

পেতেও দেরি হয় না। দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার অনেক কিছু আছে। তা থাকুক। বড়দলের ছোট ভাই এই গোসাবা।

বাদা আছে, ডিঙি আছে, আর বন্দুকও ভাগ্যক্রমে হাতে এসে গেছে। তা পাশি বা বে-পাশি বন্দুক হোক। বে-পাশি বন্দুক কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, তার খবরাখবর আগেভাগেই অনিলের রপ্ত হয়ে আছে বড়দল থাকা কালে। কাজেই অনিলের পক্ষে গোসাবায় আস্তানা গাড়তে কোনোই বেগ পেতে হয় নি। শরণার্থী তাকে হতে হয়নি—এই গর্বেই সে গর্বিত। সে গর্ব অনিলের চোখে-মুখে সর্বত্র ফুটে থাকতো।

দুটি প্রাণীর জীবন-যাপনের জন্য কোনোদিন চিন্তান্বিত হয়নি, আজও নয়। বনের অঢেল সম্পদ তো ওর নাগালের মধ্যে। সুন্দরবনের মানুষের মনে বনের সম্পদ আহরণের ব্যাপারে কোনও সংকোচ বা দংশন নেই। আইন মোতাবেক যাই হোক, এই কাজ ওরা কখনও অন্যায়ের মধ্যে ধরে না।

এবং এই কাণ্ডকারখানায় একে অপরকে সাহায্য করতে ওরা কার্পণ্যও করে না। কাজেই অনিলের জীবনটা ক'বছরের মধ্যে গোসাবায় সহজ হয়ে এসেছে।

সহজ হয়ে এলে হবে কি, অনিলের মনের দুটি আবেগ ওকে স্থির থাকতে দেয় না। ছেলেবেলার কবি-কবি ভাব এখন গোসাবার গানের আসরে আশ্রয় নিয়েছে। গান মানে ওর কাছে ভাটিদেশের ভাটিয়ালি গান। সে গানে সুরের সূক্ষ্মতা ও লহমার ওস্তাদি না থাকলে কি হবে, দীর্ঘ কপালে চন্দন-ফোঁটা টেনে হালকা বাবরি চুলের জটগুলি দোলা দিয়ে গলা ছেড়ে ঢেউয়ের দোলার মতো ভাটিয়ালির টান যখন দেয় তখন আশপাশের লোকেরাও তন্ময় না হয়ে পারে না। বিশেষ করে গোসাবার ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুকে এই গের্দের সবাই খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। সবারই তিনি প্রিয়। এই ডাক্তারবাবুই অনিলের গানের সেরা সমজদার।

তা হলে কী হবে ? ডাক্তারবাবু তো সবাই নয়। অনিল এই অঞ্চলের সর্বমানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তাদের সবার কাছেই 'শাবাশ' পেতে চায়। কিন্তু সুনদরবনাঞ্চলে বনের উপর আধিপত্য না দেখাতে পারলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দায়।

তখন শীতকাল। হিমেল সন্ধ্যায় যে যার ঘরে এসে পড়েছে। বেদেও মা-র কাছে এসে গেছে। ভারী হাসিখুশি আর কথায় কথায় ছড়া কাটছে।

—কী রে বেদে! আজ কী হল তোর ? এত খোশমেজাজ কেন ?

—আছে, আছে, কাল এক মজার ব্যাপার আছে।

—কিসের মজা রে! কেন, কাল বুঝি মেয়ে দেখতে যাবি ?

—তা দেখাদেখির আর কি আছে! তুই তো বেদে, তোর সব মেয়েকেই ভালো লাগবে। আমি আর পারি না, কত কাল একা-একা তোর হাঁড়ি ঠেলবো!

মা-কে হতাশ করে দিয়ে বেদে বললো,—কাল যাবো বনভোজনে।

—বনভোজন!

—না, ঠিক বনভোজন না। বাদায় কি বনভোজন হয়! যাবো হরিণ-শিকারে।

—সেটা আর নতুন কথা কি ? সে তো তুই রোজই যাচ্ছিস!

—না, সে-শিকার না। সে তো যাই বে-পাশি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে শিকার করতে। কাল যাবো বিয়ের বরযাত্রীর মতো। জনা বারো যাবো। ডাক্তারবাবু যাবেন, বড় ইস্কুলের মাস্টাররা যাবেন, আরও অনেকে যাবেন। সঙ্গে থাকবে তিন-তিনটে বন্দুক। তা ছাড়া আমার বন্দুক।

—আমার বন্দুক কী রে ? ও তো বিলাসবাবুর বন্দুক।
—ঐ হলো। এখন তো আমার।
রাত বারোটা। ভাটির টানে ওরা যাত্রা করেছে। বিরাট একখানা পানসি নৌকোয় জনা তেরো হৈ-হল্লা করে চলেছে। পানসির সঙ্গে দুখানি জালি ডিঙি। একেবারে ছোট্ট ডিঙি, কোনোমতে চারজনে চাপা যায়। সঙ্গে চারটি বন্দুক। ডাক্তারবাবুর বন্দুকটা ঠিক বন্দুক নয়, রাইফেল। হাজার হোক বাদা তো, সুন্দরবনের বাদা। বলা যায় না কখন কি হয়। মনের বাসনা, ওরা গের্দের সব্বাইকে হরিণের মাংস খাওয়াবে।
গন্তব্যস্থান সুধন্যখালের বনবিবির টাট্। গোসাবা থেকে দুগ্যোদোয়ানির পথে গুমোর নদীতে পড়বে। সেখান থেকে সজনেখালির দিকে যেতে ডান হাতে সুধন্যখালি। সুধন্যখালি খালও বলা যেতে পারে, নদীও বলা যায়। এই খালের তিন বাঁক এগুলে বনবিবির টাট্ তিন নম্বর পাশ-খালে। টাট্ মানে এই মালে বছর-বছর পলিমাটির চরের চত্বরে এদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বনবিবির আরাধনা করে, মানত করে। এক কথায় তখন যেন নির্জন নিস্তব্ধ নিবিড় বনে শোরগোল তুলে মেলা বসিয়ে দেয়।
ওদের এই টাটে পৌঁছতে শেষ রাত হয়ে যাবে। ভোর না হতেই শিকারের তোড়জোড় করা চাই। এতগুলি লোকে জড়ো হয়েছে যেন এক উৎসবের মুখে ; কাজেই ঘুম কারো চোখেই নেই। ক'জনে মিলে লেগেছে কাঁকড়া মাছ ধরতে। শক্ত দড়িতে 'থোপ' দিয়ে কাঁকড়া মাছ সহজে ধরা যায়। ওরা ধরলেও প্রায় এক ঝুড়ি। শিকার হোক না হোক, আগেভাগে আগামী দিনের ভাতের উপকরণ জুটে গেলো বিনা তোড়জোড়ে।
পুবে উষার আলোর আভা দেখা দিতেই ওরা বনে উঠেছে। তিন দলে তিনটি বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেল নদী বরাবর। এক-এক দলে দুজন, আর একটি করে বন্দুক। বাকি সবাই নৌকোয় রইলো ; তবে তাদের কাছেও একটি বন্দুক থাকলো। কে জানে বিপদ কখন কোন পথে আসবে।
ছ'জনেই দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। সুধন্যখাল বেশ কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকের মাথায় একে একে এবং বেশ দূরে দূরে অনিল দুটি দলকে কেওড়া গাছে উঠিয়ে দিল। নিজেও বেশ খানিকটা আরও এগিয়ে সঙ্গী মন্মথকে নিয়ে একটা কেওড়া গাছে ওঠে। সুন্দরবনের হরিণ গোয়োর পাতা, বানের পাতা ও ফল বা কাকড়াগাছের চাপান ফুল খায়, কিন্তু কেওড়া গাছের পাতা ও ফলই সবচেয়ে প্রিয় ওদের। কেওড়া গাছ বাছাই করার কারণও তাই।
সবাই যে যার গাছে চুপচাপ বসে। চরে ও গাছের তলায় রোদ পড়তেই ওরা বানর ডাকা আর বানরে বানরে ঝগড়ার নকল করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডাল-পাতা ভেঙে নিচে ফেলে। এ বিষয়ে অনিল খুবই সাবধানী—গাছের ডাল এমনভাবে ভাঙে যাতে পাতায় হাতের কোনও স্পর্শ না লাগে। পাতায় মুখ দেবার আগে গন্ধ শুঁকে হরিণে ঠিক বুঝে নেয় কারা এই ডাল ভেঙেছে। পাতায় মানুষের হাতের গন্ধ পেলেই সোজা ছুটে পালাবে।
একটু পরেই অনিলও হরিণের ডাক নকল করতে থাকে। দেখতে না দেখতে একটা হরিণ-শিশু এসেছে। শিশুকে দেখে অনিলের গুলি করতে মন চায় না। ডাকাও থামিয়ে দিয়েছে। এমন সময় দেখে দূরে একটা বড় শিঙেল ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অনিল মেয়ে-হরিণের স্তিমিত ডাক 'উ···উঁ' নকল করতে শুরু করে। শিঙেল হরিণের ডাক বড় উচ্চগ্রামে। এত উচ্চগ্রামে যে অনেক সময় শিকার বুঝে ফেলে আসল না নকল। কিন্তু হরিণীর স্তিমিত ডাকে আসল কি নকল তা সহসা ধরা দায়।

শিঙেল এগিয়ে আসতে থাকে ধাপে ধাপে অতি সন্তর্পণে। এখনও অনিলের বন্দুকের আওতার মধ্যে আসেনি। ত্রিশ ইঞ্চি নলের বন্দুক, রেঞ্জ কম। অনিল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর দেরি করতে ভরসা পায় না, চোট করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে শিঙেল এক লাফ দিয়ে ছুটে গেলো। অনিল চিন্তিত, তাহলে কি গুলি লাগাতে পারেনি!

ভাল করে তাকিয়ে দেখে, চত্বরে পলিমাটি প্রলেপের উপর গুলির চিহ্ন। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হয় না গুলি ঠিকমত লেগেছে বলে। ইঙ্গিতে মন্মথর কাছে জানতে চাইলে সে-ও নিচের ঠোঁট উলটে জানিয়ে দেয়, সেও বুঝতে পারেনি।

অনিল একটু ইতস্তত—নামবে কি নামবে না। মনে আশঙ্কা নেমে এগিয়ে গেলে দূরে অন্য দুটি দলের শিকার ব্যাহত হতে পারে। দোমনাভাব কাটতে অবশ্য বিশেষ দেরি হয় না। সাঙাতদের কাছ থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। আওয়াজটা বাঁধা আওয়াজ ; বিদ্যুৎগতিতে ফর্‌ফর্‌ শব্দে ডাল-পাতা ভেদ করে যাবার আওয়াজ নয়। নিশ্চয় শিকারের দেহ ভেদ করেছে। পরপর কয়েকটি চোটের আওয়াজ।

অনিল ও মন্মথ নেমে এলো। কিছুটা এগিয়ে দেখে, ঝাঁকাল বনগাছের আড়ালে ওদের শিঙেল গলাটা লম্বা করে এগিয়ে দিয়ে মরে পড়ে আছে। ভাল করে একবার দেখে নিয়ে অনিল খুশি মনে বলে,—সাঙাত, কলজেতেই লেগেছে, তা না হলে অমন করে মরতো না। চলো যাই, এখানে দেরি করো না।

ওদিকে অন্য সাঙাতেরা সবাই নেমে জড়ো হয়েছে। অনিল সেদিকে দ্রুত এগিয়ে খুব ব্যস্তভাবেই ওদের বলে,—তোমাদের কি হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই। যাও তোমরা আমাদের শিঙেলটা বেঁধে ধরাধরি করে নিয়ে যাও নৌকোয়, আমি আর মন্মথ যাচ্ছি তোমাদের শিকারের খোঁজে।

মন্মথকে প্রায় হাতে ধরে টেনে নিয়ে অনিল রক্তের চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে যায় ওদের শিকারের সন্ধানে। এইভাবে আহত হরিণের পেছনে যাওয়ায় সুন্দরবনে এক মহা বিপদ আছে। বহু সময় বাঘের মুখোমুখি হয়ে পড়তে হয়। অজস্র হরিণ দলে দলে ঘোরে এই বনে। তাহলেও বাঘকে বহু মেহনত করে এদের শিকার করতে হয়। কাজেই সে এমনি ধারা সুযোগের তাকেতাকে থাকে। আহত হরিণকে বাগে আনতে ওদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। অনিল এ কথা জানে। জানে বলেই ওদের না যেতে দিয়ে নিজেই এই দায়িত্ব নিয়েছে। তাছাড়া অনিলের মনটাও খুব তেজী হয়ে আছে। অত বড় শিঙেলটা যে এইমাত্র মেরে এসেছে।

ওরা দুজনে এখন গভীর বনে। সারা পথ শিকার মাঝে মাঝে শুয়েছে আর রক্ত ঝরে পড়েছে সেখানে, আবার এগিয়ে গেছে। গুলি নিশ্চয় ওর পেটে লেগেছে, বুকে লাগে নি। সামনে একটা ছোট নদী ভরন্ত জোয়ার। সুধন্যখালের জলে কামোট ও কুমিরের বড় দাপটি, জোয়ার হলে তো কথাই নাই। এ অঞ্চলের বনবাসী জীবেরও সে খেয়াল নিশ্চয় আছে কিন্তু নিতান্ত প্রাণে বাঁচার আশায় সটান নদী পার হয়ে ওপারে যেতে আহত হরিণ দ্বিধা করে নি।

''খলসে' গাছের একটা মোটা ডাল পুঁতে চিহ্ন রেখে অনিল সঙ্গীকে বলে,—চল, জলে নামা ঠিক না, ডিঙিতে পার হওয়াই ঠিক। চল, ফিরে যাই।

নৌকোয় ফিরে এসে দেখে, ডাক্তারবাবুর তদারকিতে কাঁকড়া মাছের শাঁস আর শিঙেলের মেটের ঝোল টগবগ করে ফুটছে। ডাক্তারবাবু বললেন,—সবাই যখন নৌকোয় এসে গেছে, তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাটটা সেরেই নাও।

অনিল মাথা চুলকিয়ে বলে,—কিন্তু…

ডাক্তারবাবু মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—তোমার আবার কিন্তু কিসের ! না, না, আগে বাদার বনভোজন চুকে যাক, তারপর যা করার তা করা যাবে। শিকারের সন্ধানে যাবার কথা বলতে চাও তো ? তা বেশ ! আগে পেটে কিছু দাও, তারপর আমরা সবাই মিলে যাবো। ওকে তো পাবই। পালাতে গিয়ে যখন বারবার শুয়ে পড়তে হচ্ছে, জাদুকে বেশিদূর যেতে হবে না ! —একনাগাড়ে কথাগুলি বলেই নিজে ছইয়ের ভিতর থেকে মাটির শানুক আনতে গেলেন।

অনিল আবার বলে ওঠে,—তা তো হল, ডাক্তারবাবু ! কিন্তু···

—আবার তোমার কিন্তু ! বলো, কি তোমার কিন্তু।

—আমার একটা আর্জি ছিল। দুটো হরিণে তো গোসাবার সব বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো যাবে না। আমি বরং ডিঙি নিয়ে···

তা বেশ ! যেতে হয় যেও, আগে শানুক নিয়ে বসো তো !

গভীর নির্জন ভয়ঙ্কর অরণ্যে পানসির পাটাতনে বসে রসাল গল্পের আর হাসি-ঠাট্টার মধ্যে বনভোজন-পর্ব শেষ হতেই অনিল আর একটুও দেরি করতে চায় না। মন্মথ ও আর একজন সাঙাতকে সঙ্গে নিয়ে দুটি বন্দুক হাতে ছোট্ট ডিঙিতে বসে পড়েছে। হরিণ পেতে হলে সূর্যের রশ্মি তির্যক হবার পূর্বেই গাছে উঠতে হবে।

অনিলের কাণ্ডকারখানা আর ভাবগতিক দেখে ডাক্তারবাবুর কি যেন একটা সন্দেহ হয়। হঠাৎ বললেন,—শিকেরি : তোমার বন্দুকের বদলে এবার আমার রাইফেলটা নিয়ে যাও।

দ্বিধাগ্রস্ত মনে অনিল নিজের বন্দুকটা হাতছাড়া করতে চায় না ; বে-পাশি বন্দুক, বলা যায় না, বিপদে পড়লে অন্যে হয়ত নদীগর্ভে ফেলে দিতেও কসুর করবে না ! তা হলেও যাত্রার মুখে ডাক্তারবাবুর ইচ্ছাকে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করে নিজের বন্দুকটা আলগোছে রেখে রাইফেলটাই নিয়ে গেলো।

স্রোতের টানে ওদের ডিঙি সাঁ-সাঁ করে চলে সোজা দক্ষিণে। সুধন্যখালি এখানে পূব দিকে বাঁক নিয়েছে। তারই ফলে এই ট্যাঁক। ট্যাঁক ঘুরে অনিল ডিঙি নিয়ে গেল সুন্দরবনের আরও এক-বাঁক পথ।

মালে উঠেছে তিনজন। পছন্দসই স্থানে এসেই অনিল ফস করে এক কেওড়া গাছে উঠে গেল। গাছে উঠতে উঠতে বাকি দুজনকে ফিসফিস করে বলে,—যা, তোরা উ-ই দূরের গাছটায় উঠে বোস। দুজনেই এক গাছে, বুঝলি।

মন্মথ ও তার সাঙাতের সঙ্গে একটি বন্দুক। বন্দুকটি দোনলা, আর ওরা ফাঁদ পাতছে হরিণের আগমন উপলক্ষে। কাজেই ওরা নির্ভয়ে ধীর পদক্ষেপে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে।

অনিল গাছে উঠেই দেখে, বনে পাতার ছাতির বেশ নিচুতে এক তে-ডালাতে শকুনের বাসা। অত বড়ো বাসা, তাতে আবার কোনও শকুন নেই দেখে অনিলের একটু আশঙ্কা জাগে। রাইফেলের নল দিয়ে নেড়ে দেখলো—না, কোনও সাপ-টাপ নেই। উঠে গিয়ে পাখির বাসার উপর নিজের গামছাখানা বিছিয়ে আরাম করে পেতে ডালায় বসতে গেছে। বসবে কি ! থ মেরে গেছে। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে দ্যাখে, কালো ও হলদে রঙের লম্বা ডোরা লম্বা লম্বা শূলোর সঙ্গে মিশে আছে। তারই ডানদিকে বেশ কিছুটা দূরে। লক্ষ্য তার ঐ সাঙাতদের দিকেই। মুহূর্তের মধ্যেই অনিল যেন কেমন হয়ে যায়। হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে। কয়েক সেকেণ্ড কাটতেই সচেতন হয়ে ভাবে—সে কি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখছে ? না, তার মতিভ্রম ? নিজের গায়ে চিমটি কেটে দ্যাখে—না, তার চেতনা তো সজাগই। তবে। তবে আর কি !! তা ওদের গতি এতো ধীর কেন ? তাড়াতাড়ি গাছে

উঠতে পারিস্ না ! বিকট চিৎকারে সাবধান করে দেবো ? কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়ে যায় ? মরুক গে ! বনে কে কাকে সাবধান করতে পারে, যার-যার 'সাবধান' তার-তার কাছে। অনিলের এক বুদ্ধিভ্রম অবস্থা।

হঠাৎ নিঃশব্দে বাঁ হাঁটু ভেঙে তেডালার এক ডালে চেপে বসলো। ঠিক বসলো না—দেহের ওজন আর শক্তি জড়ো করেছে নিচের ডালের উপর রাখা টান্‌টান্ করা ডান পায়ের উপর।

না, তার কাছে তো রাইফেল আছে। শিকারী জীব এবার গুটি মেরে গুঁড়ির আড়ালে দুই সাঙাতের দিকে কয়েক হাত এগিয়েছে।...রাইফেল ! রাইফেলে তো এল্ জি গুলি নেই। বুলেট, একটাই মাত্র বল্ ! যদি ফশকে যায় !!

রাইফেলটা ধরে হাঁটুর উপর বাঁ হাত রেখেছে। এতক্ষণে বুঝি হাতের কাঁপুনি কমে এসেছে। পরপর পাঁচবার নিরিখ করলো। পাঁচবারই রোমাঞ্চিত লোমে ঢাকা বুকে তাক হয়। ও যে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুচ্ছে। আবার ক্ষণিকের জন্য মনে হয় এই বুঝি ভীষণ বেগে ঝাঁপ দিলো। না, আরও একটু এগুতে চায়। সুনিশ্চিত হতে চায়—চকিতে এবং বিদ্যুৎসম গতিবেগের এক ঝাঁপে হাতের থাবা যাতে শিকারের ঘাড়ে মারতে পারে। উবু হওয়া মানুষকে ওরা প্রথমেই এক কামড়ে শূন্যে তুলে ধরতে চায়। কিন্তু খাড়া মানুষকে ঘাড়ে থাবার আঘাতে বেহুঁশ করে মাটিতে ফেলে দেওয়াই ওদের লক্ষ্য।

সাঙাত দুজন এবার গাছে উঠতে যেতে পারে। সুন্দরবনের নরখাদক সে সুযোগ দেবে না। অনিলও আর দেরি করতে চায় না। যমদূত পেছনের পা গুটিয়ে নিয়ে এসেছে। লেজের ডগা মাটিতে বাড়ি মারার জন্য উঁচু হয়ে উঠেছে। মানুষের মতো বোধ হয় ১-২-৩ গুনে মাটিতে লেজের আঘাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ এক হুঙ্কারে ধনুকের জ্যা থেকে মৃত্যুবাণের গতিবেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মানুষের বেলায় যেমন সজোরে উচ্চারিত 'তিন' কথাটা দেহে এগিয়ে যাবার ধাক্কা আনে, সমভাবে ওদের লেজের ডগার সজোরে শেষ বাড়িটাও বুঝি দেহকে ঊর্ধ্বমুখী করে লাফ দিতে সাহায্য করে। সাহায্য সামান্যতম হলেও, শেষ মুহূর্তের এই সাহায্য কম কিসে ! দেহের তুলনায় কান দুটি যৎসামান্যই উঁচু, কিন্তু শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে তাও হেলিয়ে দিয়েছে পেছনের দিকে এবার। না, অনিল এক মুহূর্তও আর দেরি করতে চায় না। করেওনি। বুকের নিরিখেই রাইফেলের চোট্ করে দিল।

চোট্ করার পূর্বক্ষণে রাইফেলের সেফ্ তুলবার সময় অনিলের আশঙ্কা ছিল সেই সামান্য শব্দটা বিমনা করলেও করতে পারে, আর তখন নিজেই হয়তো হয়ে পড়বে এই মৃত্যুদূতের প্রধান লক্ষ্য। না, তা হয় না। নরখাদকের এই মুহূর্তের একনিষ্ঠতা যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের তন্ময়তার মতো। ওদের দেহ-মন, শিরা-উপশিরা যেন এই হিংস্রতম কাজের জন্য উদগ্র থাকে।

অনিল গুলি করেছে, বাঘও হুঙ্কারে লাফ দিয়েছে। বাঘের হুঙ্কার আর গুলির আওয়াজ যেন মিশে গেল। বাঘ শূন্যে লাফ দিয়েছে। লাফ দেবার মুখোমুখি গুলির আঘাতে বোধহয় একটু অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বে উঠেছে। শুধু ঊর্ধ্বে নয়, তার গতিমুখও খানিকটা ঘুরে গেছে। ঘুরে যাবি তো যা—একেবারে অনিলের গাছের বরাবর।

অনিলের চিন্তাশক্তি স্তব্ধ। জীবনের তাগিদে মাথার উপরের ডাল আঁকড়ে ধরে উঁচুতে উঠবার চেষ্টা। কিন্তু ঐ চেষ্টাই মাত্র।

লাফের পর মাটিতে পড়েই ছুট দিলো একেবারে অনিলের গাছের গুঁড়ি ঘেঁষেই নয়, গুঁড়িতে ধাক্কা খেলো। আর যেন চার পায়ে ছুটতে পারছে না। ছোটার গতিবেগে মাটিতে

উপুড় হয়ে পড়ে সড়সড় করে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা। দেহের ওজনে আর এগিয়ে যাবার ধাক্কায় গাছের শুলোগুলি মড়মড় করে ভেঙে যেতে লাগে। বাঘের মুখের গজরানি কিন্তু থেমেও থামতে চায় না।

নরখাদক বুঝি থমকেছে। না, ঠিক থমকায়নি। আবার খাড়া হয়ে দ্রুত কয়েক কদম টলতে টলতে ছুটে গেলো ডানদিকের গরান-বনে। কিছুক্ষণ ধরে গরান-বনের আড়ালে হুড়মুড় শব্দ। তারপর শান্ত। বনও শান্ত।

অনিলের চিন্তা—গুলি লেগেছে ঠিকই, কিন্তু ঠিকমতো লেগেছে তো। ইত্যবসরে বেশ উঁচুতে মগডালে উঠে নিশ্চিন্ত হয়েছে, বাঘ ফিরে এলেও ওকে নাগাল পাবে না। রাইফেল কাঁধে ঝুলছে। এতক্ষণে আবার গুলি পুরে রাখবার খেয়াল হলো।

সহসা গরান-বন থেকে দীর্ঘ একটা হাঁফ ছাড়বার ফড়ফড় শব্দ, অনিলও হাঁফ ছাড়লো! না, তবুও বিশ্বাস নেই এই দুর্ধর্ষ জীবকে। প্রায় পনেরো মিনিট কেটে যাবার পর অনিল মতি স্থির করতে চায়। কিন্তু এক কু-ই দেবে, না, জোড়া কু-ই দেবে? পাখির ডাকের নকলে এই কু-ই দেবার রীতি, যাতে কিনা অন্য কোনো জীব সন্ত্রস্ত বা সজাগ না হয়। এক কু-ই মানে—আমিও গাছ থেকে নামলাম, তোমরাও নেমে এগিয়ে চলো। আর জোড়া কু-ই, ইঙ্গিত করে—তোমরা সবাই নেমে আমার গাছের তলায় ছুটে এসো।

ইতস্তত করে অনিল জোড়া কু-ই দিয়ে বসে। দুই সাঙাত অমনি গাছ থেকে দ্রুত ছুটে এসেছে। গাছ থেকে নামতে নামতে অনিল বেশ সাহসভর করে জোরে জোরে বলে,—অতো কী নিচে দেখছিস্! খবরদার! দেখলেই গুলি করবি! খবরদার পিছুবি না!

—দেখেছো! কী রক্ত! কলসখানেক রক্ত!

—দেখেছি, আমার কথা কানে গেছে তো! দেখলেই গুলি···দ্যাখ, দ্যাখ, ভাল করে চারদিকে দ্যাখ···দেখলেই গুলি!

অনিল নিচে নেমে রাইফেলের সেফ তুলে ওদের প্রায় হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেলো গরান-বনের ঝোপে।

চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ে আছে; এ জীবকে বিশ্বাস নেই। অনিল রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে নলের মুখটা দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে পরখ করে। এতটুকু নড়লে ট্রিগার টিপে দেবে।

ওদের এখন আনন্দ ও দাপটির কোনও সীমা নেই। নদীর ধারে এক গাছের মাথায় উঠে সবাই মিলে প্রাণপণে জোড়া কু-ই দিতে থাকে।

দেখতে না দেখতে ওদের বড় নৌকো এসে হাজির। ডাক্তারবাবু তো ছইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়ছেন সুখবরটার ইঙ্গিত পেতে।

ডাঙায় নেমে ডাক্তারবাবু তো ঘোষণা করার মতো করে বললেন,—আমি তো আগেই বলেছি, অনিল বাউলে না হয়ে যায় না! তা না হলে ও আগে থাকতে জানলো কী করে এখানে বাঘ আছে! সাধে কি আমি ওর হাতে রাইফেলটা তুলে দিয়েছিলাম!

গোসাবায় ফিরে আসতে দুটি বড় বড় হরিণ আর ততোধিক বিশালকায় বাঘ গোটা গোসবাগঞ্জকে কাঁপিয়ে তুললো। ডাক্তারবাবু তো বলেই চলেছেন, তোমরা শাবাশ দিয়ে যাও বেদে বাউলেকে। অনিলের আদুরে নাম যে 'বেদে' সে কথা অনেকেই জানে ওর মা-র দৌলতে।

প্রাথমিক চমক ও উল্লাস স্তিমিত হতেই অনিল সহসা চললো ছুটে নিজ গৃহমুখো। আজ কি আর কেউ বেদেকে অমন করে চলে যেতে দেবে। বাচ্চারা তো বটেই, বড়দের একদল

চললো ওর সঙ্গে, ওর গতিপথকে স্তিমিত করে আর ওর কাহিনী সবার কাছে সবার আগে কাড়া পিটিয়ে দিতে।

হৈ-হল্লা শুনে মা এসেছেন আঙিনায় হুড়কোর কাছে। পরণের থানের আঁচল বেশ আঁটোসাটো করে ফোকলা দাঁতে আধো-আধো ভাবে বললেন,—কি রে বেদে ! তুই নাকি আজ 'বেদে বাউলে'…'বেদে-বাউলে' !

অনিল সামনে এগিয়ে এসেছে। মুখে হাসি নিয়ে কথা নেই বার্তা নেই টিপ করে মা-কে প্রণাম করলো।

দুই

বেদের প্রতি গোসাবার মানুষের এই অভিনন্দন মায়ের মনে এক অসাধারণ তৃপ্তি এনে দেয়। এনে দিলেও মা কিন্তু বিলাসবাবুর বন্দুকটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত একদিন রাতে শোবার সময় বেদেকে প্রশ্ন করেই বসেন,—আচ্ছা বেদে, তুই বাঘটাকে মারলি কি করে ? তোর সেই বন্দুকটা দিয়ে মেরেছিস তো ?

—না মা, এতো বড়ো বাঘকে কি ঐ বন্দুকে অতো সহজে ঘায়েল করা সম্ভব ! ভাগ্যি, দ্বিতীয়বার যখন বনের ভিতরে যাই, তখন ডাক্তারবাবু তাঁর রাইফেলটা আমার হাতে তুলে দেন। বাঘটা যে কি ভীষণ জোরালো আর কি ভয়ঙ্কর তেজী ছিল, তা তুমি ভাবতেই পারবে না !

সুযোগ পেয়ে মা এবার তাঁর মনের যাতনাটা খুলেই বলেন,—তা ভালোই হলো। ডাক্তারবাবু একবার যখন খুশি মনে বন্দুকটা তোর হাতে দিয়েছেন, তখন তোর আর কোনও অসুবিধা হবে না। চাইলেই তো তুই পাবি নিশ্চয়।

মায়ের বক্তব্যটা আগাম অনুমান করেই বেদে ঝমাৎ করে বলে বসে,—তা মা, অন্যের বন্দুক আর নিজের বন্দুকে অনেক তফাৎ। নিজের বন্দুকে যেমন হেলেফেলে যেমন-তেমন ভাবে চোট্ করা যায় তা কি…

মা-ও কম নয়। ছেলের কথা থামিয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন,—সে কি আর বুঝি না, নিজের ছেলে আর পরের ছেলে !!—বলি, বন্দুকটা তোর নিজের হলো কি করে ?

—না, না, তা ঠিক বলছি না। তোমাকে তো প্রথম থেকেই বলেছি, যাবো একদিন কলকাতায় বিলাসবাবুর খোঁজে। তুমি তো বোঝো না, কলকাতা কি জিনিস ! এ কি বড়দল না গোসাবা, যে লোকের নাম জানলেই ঠিকানার হদিস পাওয়া যায়।

—কেন, 'বাঘবাজার' বলে তো তোর জানাই আছে ঠিকানা।

—যা জানো না তা নিয়ে কেন মাথা ঘামাও ! কলকাতা যা, 'বাঘবাজার'ও তাই। তুমি ভেবো না, আমি নিশ্চয় একদিন যাবো, বলছি যাবো।

সে-রাতের মতো আর কথা কাটাকাটি হয় না বটে, তাহলেও বন্দুকটা গোড়া থেকেই বেদের মনে একটা দ্বন্দ্ব এনেছে। ভারি টান ওর বন্দুকটার ওপর ; সুন্দরবনের উঠতি বয়সের মানুষের কাছে অস্ত্রের প্রতি লোভ ও আকর্ষণ দুর্নিবার।

তাহলেও বেদের মতো গান-পাগলা ও কবি মনের কাছে সততার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাও কম দুর্নিবার নয়। কাজেই মনের মধ্যে নিদারুণ দ্বন্দ্ব চলে।

রক্ষে, বন্দুকটি ওর বাড়িতে কখনই রাখতো না। চোখের সামনে থাকলে তো অহরহ

মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করতো। তাছাড়া মা-ও মানসিক যন্ত্রণায় দিবানিশি ভুগতেন।

সুন্দরবনের মানুষের আছে অজস্র বে-আইনী বন্দুক। তারাও পারতপক্ষে সে-সব বন্দুক কখনও নিজেদের ঘরে রাখে না। বনের গভীরে রেখে দেয়। বেদেও তাই করেছে। নদীর ওপারে বনের বেশ গভীরে এক বানগাছের খোঁড়লে বন্দুকটা রেখেছে।

সজনেখালি বনকর অপিসে লোকের বড্ড আনাগোনা। সে-অঞ্চল এড়িয়ে পীরখালি বনের গভীরে একটা বানগাছের খোঁড়লে বেদে লুকিয়ে রেখেছে। তেমন দরকার হলে ডিঙি করে ছুটে গিয়ে বন্দুকটা নিয়ে আসে।

একবার তো আনতে গিয়ে এক মহা আপদের মুখে পড়ে। খোঁড়লের মুখটা বেশ একটু উপরে। ওর মধ্যে রাখলে গোটা বন্দুকটাই ঢাকা পড়ে যায়। গাছে একটু উঠে তবে বন্দুকটা হাতের নাগালে আসে। গুড়িটাও বেশ মোটা। এরকম মোটা বানের গুড়িতেই খোঁড়ল হয়। অবশ্য গাছ অনেক পুরনো হলে তবেই খোঁড়ল দেখা দেয়।

তখন বর্ষাবাদলের দিন। বৃষ্টির জলে গুড়িটা বেশ পিছোল হয়ে আছে। কোনমতে ধরাধরি করে উঠতে গিয়েই একটু-আধটু শব্দ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই খোঁড়লের ভেতরে কি যেন নড়াচড়া করে ওঠে।

বেদে মুহূর্ত মধ্যে গাছ থেকে লাফিয়ে মাটিতে। দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে বুঝবার চেষ্টা করে, কি হতে পারে? বনে জন্তু-জানোয়ারের তো অভাব নেই, কিন্তু কোন জীবই বা হতে পারে!

সাবধানের মার নেই। ভেবেই, কোমরে ঝোলা কুড়ুলের দু-তিন কোপে একদলা কাদামাটি নিয়ে খোঁড়লের ঠিক পাশেই গরান বল্লার ছোট গাছটায় উঠে পড়লো। বেশ খানিকটা উঠলো যাতে খোঁড়লের মুখটা ভাল ভাবেই দেখা যায়।

এবার মাটির গোল্লা বানিয়ে বানিয়ে খোঁড়লের ভিতর টিপ করে ফেলতে লাগে। যেই থাকুক খোঁড়লে নরম মাটির গোল্লায় কতোটাই বা আঘাত পেতে পারে. তাহলেও শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই বুঝি মুখ বাড়িয়েছে। সে-মুখ দেখামাত্র আঁতকে ওঠার কথা। বেদে এবার সশব্দেই বলে ওঠে,—অবশেষে তুই এসে যক্ষের ধন পাহারা দিচ্ছিস!! কিন্তু পরক্ষণেই সাবধানী হয়ে ওঠে।

সাপ! বিষধর সাপ! সুন্দরবনের কালকেউটে। কালো মিশমিশে. চোপসানো ফণার পদ্মচিহ্ন স্পষ্ট।

একদম নিঃসাড় ও নিঃশব্দ হয়ে গেছে বেদে। অন্য কেউ হলে কথা ছিলো; এ যে কালকেউটে. দেখামাত্র দূর থেকে ছুটে এসে ছোবল মারে। এ সাপ বড় ভিতু, নিজের প্রাণভয়ে তেড়ে ছুটে এসে শত্রুকে আগেই নিধন করতে চায়, ক্রোধ বা হিংসার জন্য নয়। এর দংশনে বিষও মোক্ষম। অসহ্য যন্ত্রণায় প্রায় তৎক্ষণাৎই মৃত্যু অনিবার্য, এতটুকু সময় পাওয়া দায়।

বেদে নিস্তব্ধ হয়ে তার গতি দেখে বুঝবার চেষ্টা করছে, ওকে সে দেখতে পেয়েছে কিনা। কালনাগিনীও নিশ্চল। কিন্তু ও যদি ওর শত্রুকে কোথাও ঠাহর করতে পারে একবার, তাড়া সে করবেই। দুরন্ত বেগে ছুটে আসবেই।

মনে আতঙ্ক আনে বটে, কিন্তু কি সুন্দর দেখতে! সারা দেহটা চক্‌চকে কালো, রক্ত জবার মতো চোখ, মাথায় শ্বেতপদ্মের চক্র, দৃঢ় ওষ্ঠ বলয়ের ফাঁকে লকলকে বিদীর্ণ জিহ্বার মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমক্‌। সৌন্দর্য বটে, কিন্তু তা বিহ্বল ও বিমোহিত করার সৌন্দর্য।

একবার ঘাড় বেঁকিয়েছে গরান বল্লার দিকে, আর বুঝি রক্ষা নেই! বেদে নিশ্বাস বন্ধ

করে দিয়েছে। চোখও প্রায় বন্ধ করেছে, চোখের পাতির আড়ালে কোনমতে আবছায়াভাবে দেখছে যাতে আপন চোখের দ্যুতি নাগিনীর লাল চোখে ছায়াপাত না করে !!

কয়েক লহমা কেটে যায়। তারপর নাগিনী ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে সরসর করে চলে যায় বেদের দিক থেকে অন্যদিকে। নজরে নিশ্চয় আনতে পারেনি বেদেকে।

বেদে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বাঁচে বটে, কিন্তু আরেক আশঙ্কা ওকে পেয়ে বসে। খোঁড়লে ওর কোনও সঙ্গী আছে কিনা ? থাকলে এতক্ষণে সে-ও বেরিয়ে আসতো, একা একা পড়ে থাকবে কেন ? তা না থাকুক, বাচ্চার দল তো মায়ের অপেক্ষায় চুপচাপ খোঁড়লে পড়ে থাকতেও পারে। আছেও হয়ত, সজনেখালি অঞ্চল সুন্দরবনের পাখির বড় এক আলয়। হাজার হাজার পাখি যেমন উড়ে এসে বসে, তেমনি অজস্র বাসা বানায় গাছের মাথায়। দমকা বাতাসে ওদের অনেক ডিম নিচে পড়ে যায়। এই ডিমের লোভে সাপ তো দূরের কথা, বাঘেরও আনাগোনা কম নয়।

সুন্দরবনে প্রবেশ করে অতো সব ভাবতে নেই। ভাবতে নেই বলেই বেদে এবার গরান বল্লা থেকে দ্রুত নেমে খোঁড়লের পাশে গেল। আবার কয়েকটা ছোট ছোট গোল্লা বানিয়ে আলগোছে পায়ের পাতায় উঁচু হয়ে খোঁড়লের মুখে আস্তে ফেলে দিলো। গুড়ির গায়ে কান লাগিয়ে পরখ করতে চায় আর কোনও জীবের সাড়া পায় কিনা।

না, সাড়া পায় না। এবার সটান গাছে উঠে নজর দেয় খোঁড়লে। ঠিকই দেখতে পায় বন্দুকের নল। ধরতে গিয়েও ধরে না। তাহলেও একবার স্পর্শ না করেও বুঝি পারে না। কি সুন্দর এই বন্দুকের লোহা—এতো জলবৃষ্টিতেও এতোটুকু মরচে ধরে নি।

ভাবে, না থাক, আজ নিয়ে কি করবো। কিন্তু মা-কে যে কথা দিয়েছি। তা হোক, আগে আমি বিলাসবাবুর কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি। তারপর না হয় নেওয়া যাবে। ভালোভাবেই তো আছে। যক্ষের ধনের তো ভালো পাহারাদার জুটে গেছে। কেউ আর এই খোঁড়লে হাত দিতে সাহসী হবে না। না, থাক।

নিরাপদে থাকবে ধারণা হতেই নেমে পড়লো খোঁড়লের মুখ থেকে। সটান ফিরে এলো সে-বারের মতো বন থেকে।

তিন

এসে মা-কে কিন্তু কালনাগিনীর কথা কিছুই বলে না। বললে হিতে বিপরীত হয়ে বসতে পারে। তার বদলে বললো,—মা, এবার আমি কলকাতা ঘুরে আসি।

—কেন রে, কলকাতা কেন ?

—না, উনি জানেন না ! কলকাতা যাব না তো কোথায় যাবো ? বিলাসবাবু ! বুঝলে, বিলাসবাবু !

মা তো হকচকিয়ে যান। বললেন,—এতদিনে তোর সুবুদ্ধি হলো ! যাবি তো যা, কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি। কলকাতার কথা কতো শুনি ! কতো যে বিপদ সেখানে, তা বলার নয়। গাড়ি-ঘোড়ার চাপেই যে কতো লোক খুন-জখম হয় রোজরোজ ! তাছাড়া ছেলে-ধরা লোকও নাকি ঘোরাফেরা করে।

ছেলেধরা লোকের কথা শুনে বেদে তো হেসেই উঠলো,—বলো কি, আমাকে ছেলে-ধরার ভয় করতে হবে ! তুমি কি আমাকে ছোট্ট খোকা বলতে চাও !!

—তা না তো কি ! এখনও বিয়ে-থা করলি না। বিয়ে-থা না করলে কেউ কি বড় হয় ! আর বড় না হলে তো লোভের অন্ত নেই। দেখিস, খুব সাবধানে থাকবি।

—না, মা-র কাছে বোধহয় কোনো ছেলে কোনোদিনই বড় হয় না।

—তা তুই তো যাবি, কিন্তু বন্দুকটা কই ? সেটা নিতে হবে তো।

—তোমাকে নিয়ে তো বড্ড মুশকিলে পড়লাম। পাশ ছাড়া বন্দুক নিয়ে কলকাতায় যাবো ! এ কি গোসাবা ! মোড়ে মোড়ে সব পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে কলকাতায়। তারা তোমার বনকর পিটেল পুলিশ নয়, তক্ষুনি হাতকড়া পরিয়ে হাজতে টেনে নিয়ে যাবে।

—তাহলে উপায় কি হবে ?

—যার বন্দুক সে পাশ সঙ্গে করে এখানে এসে নিয়ে যাবে তার জিনিস।

—বলিস কি রে ! বিলাসবাবু নিজে গোসাবায় এসে নিয়ে যাবে। তোর তো খুব বুদ্ধি ! যা, যা, শীগগীর করে যা কলকাতায়।

কলকাতায় যেতে বললেই সুন্দরবনের মানুষের কেমন যেন গড়িমিশি ভাব আসে। বনের কোথাও যেতে বলো—তা রায়মঙ্গলের মোহানা বা বিদ্যাব মোহানায় যেতে বলো না কেন, ওরা প্রায় তখন-তখুনি বেরিয়ে পড়বে ডিঙি আর বোঠে নিয়ে। কিন্তু কলকাতার মতো মানযালয়ে আসতে ওদের কেমন যেন অনীহা।

বেদে কিন্তু এবার নিশ্চিত কলকাতায় আসবেই বলে স্থির করে ফেলেছে। এর আগে সে অনেকবারই এসেছে কলকাতায়। সেই যখন বড়দলে থাকতো তখনও এসেছে। সেবার যখন আসে তখন এসেছিল হিংগলগঞ্জ-হাসনাবাদ পথে ছোট রেলগাড়ি করে। খেলনার মতো এই রেলগাড়ি, ভারি মজাই লাগে বেদের বা অনিলের। ঘুটঘুট করে ঐ গাড়িতে ঘণ্টা তিনেক চড়ে বাগুইহাটি আসে। নামটা শুনে খটকা লাগে ওর। ভাবে, লোকে বলছে বটে বাগুইহাটি, ভুল বলছে। ওটা হবে নিশ্চয় বাঘুইহাটি। এখানে স্তূপাকার কয়লা আর ছোটো ছোটো ইঞ্জিনের সারি ! বারবার তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে, কেমনভাবে একটা ইঞ্জিন তার পেটে হুড়হুড় করে জল পুরছে। কি জোর এই ইঞ্জিনগুলির ! কতো লোককে টেনে নিয়ে এলো ঘটাং ঘটাং করে। এক একটা ইঞ্জিনের জোর বাঘের থেকে বেশি না হয়ে যায় না।

এরপর ঘুটঘুট করে আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছিল পাতিপুকুর স্টেশনে। তারপরই কলকাতা আসার শেষ স্টেশন, শ্যামবাজার। পশু হাসপাতালের বাগান বাড়ি ছাড়িয়েই বাঁ হাতে কয়েকটা বাড়ির গা ঘেঁষে গোটা গাড়িখানা যেন ঢুকে পড়েছিলো একটা খুপরির মধ্যে।

ইতিমধ্যে বেদে গোসাবা থেকে ক্যানিং হয়ে বড় রেলগাড়িতে শোঁ শোঁ করে কলকাতায় এসেছে। বেদের কিন্তু বড় গাড়ি ভাল লাগে না। ছোট রেলগাড়ি চড়ার আনন্দের কথা আজও সে ভুলতে পারে না। আর শিয়ালদায় এসে বেদে যেন খেই হারিয়ে ফেলে। বনের বাসিন্দার এতো হৈ-চৈ যেমন ভাল লাগে না, তেমনি ভাল লাগে না এতো শব্দ। ভাবে, দিন নেই রাত নেই কলকাতার লোকে এতো শব্দের মধ্যে থাকে কি করে ! এখন যদি আমাকে কেউ গান করতে বলে, তাহলে তা ওরা শুনবে কি করে ! ওরা বোধহয় গান-টান ভালবাসে না !

এবার সে কিন্তু ছোট বা বড় কোনো গাড়িতেই আসবে না। এবার সটান ডিঙি করেই কলকাতা আসবে। সুন্দরবনের মানুষ ডিঙি-বোঠেতেই যেন মনের জোর পায়। তার উপর যদি ডিঙি নিজের হয়, তাহলে তো কথাই নেই। যেমন খুশি, যেদিকে ইচ্ছে সাইসাই করে

চলে যেতে পারবে। যখন ইচ্ছে হয়, শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে, আবার যখন ইচ্ছে হয়, বোঠের খোঁচে তরতর করে চলে যাবে। সঙ্গে হাঁড়ি আর চুলো থাকলে তো খাবারও ভাবনা নেই।

সুন্দরবনের নদীপথে ডাকাত ও খুনীর অভাব নেই, কিন্তু কলকাতার মতো চোর-ছ্যাঁচোড়ের দাপট নেই। কলকাতার মানুষকে বড়ো ভয়, কেমন করে যে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে তার পাত্তা পাওয়া দায়। এই শহরের মানুষগুলো যেন জলের কামোট। চুপিসারে তোমার হাত-পা কেটে নিয়ে যেতে পারে বোধহয়। তুমি এতোটুকুও জানতে পাবে না।

এতো কথা অবশ্য বেদে আগে থাকতে ভাবেনি। এবার একজন সঙ্গী নিয়ে যাবে। গণেশ মণ্ডলের ছোট ছেলে সবুরকেই সাথী করে বেদের বড়ো ইচ্ছে। সবুর বেদের বড়ো এক ভক্ত। বয়সে ওর থেকে অনেক ছোট। ছোট হলেও খুব তেজী। বনের কোলের ছেলেপুলেরা যেন আপনা থেকেই তেজী হয়ে ওঠে। কিন্তু তার জন্য বেদের ওর প্রতি এতো টান না। সবুর ভাটিয়ালি গান বড্ড ভালবাসে। শুধু ভালবাসে না, বেদের কাছ থেকে শিখেও নিতে চায়। তাই দুজনের কোথাও একত্রে যাবার কথা উঠলেই দুজনারই আনন্দ আর ধরে না। তার উপর ডিঙিতে যাবার কথা উঠতেই ওরা তো উৎফুল্ল। তাই ডিঙিতে কলকাতা যাবার সুবিধা-অসুবিধার কথা মনে আসতে থাকে বা কথাবার্তাও ওঠে।

ওদিকে মায়েরও উৎফুল্ল হয়ে ওঠার যেন সীমা নেই। তাঁর মনে একটা কথাই—বেদে যাচ্ছে বিলাসবাবুর কাছে বন্দুক ফিরিয়ে দিতে। ফাঁকতালে পরের জিনিস আত্মসাৎ করার চাপা বিবেক দংশনের অন্ত ছিলো না। সেকেলে মায়ের মনে এ এক মহাপাপ বলে মনে হতো। এবার বেদে নিজেই যাবার কথা পাড়াতে মায়ের মন থেকে বুঝি এক মহা বোঝা নেমে গেলো। মা জীবনে রেলগাড়ি চড়েননি। বেদে রেলে যাবে, না ডিঙিতে যাবে তা নিয়ে ওঁর মাথাব্যথা ছিলো না। বেদে বিলাসবাবুর কাছে যাচ্ছে, তাতেই মা আনন্দিত।

শীতকাল। ফসল ঘরে উঠে গেছে। এখন কারও এদিক-ওদিক যাবার বাধা নেই। সবুর তো ডিঙি গোছাতে মত্ত। ডিঙিতে বাখারি বেঁধে প্রায় অর্ধেকটা পাটাতন করাই আছে। শুধু ছইটাই যা করে নিতে হবে। বনের সীমানায় পড়ার আগেই দুগ্যোদেয়ানির মুখে এক ঝাঁক বেঁটে গোলগাছ ছড়িয়ে দেখা দিয়েছে। এতো ছোটো যে তাতে ঘরের ছাউনি হবার মতো নয় বলে কেউ এযাবৎ কেটে নেয়নি। সবুর সেই ঝাঁক থেকে কিছু পাতা এনে আর সুন্দরী বল্লা ও বাখারি চেঁছে নিয়ে ছিমছাম ছই বানিয়ে ফেললো দেখতে না দেখতে। এখন তো বর্ষাকাল না, বৃষ্টির ভাবনা নেই। শুধু পথে ভাত ফুটিয়ে নেবার একটু আড়াল, আর গভীর রাতে নীয়ের বা হিম এড়াবার জন্যই সামান্য ছাউনি হলেই হবে।

টুকটাক জিনিস যা নিতে হবে বেদে ও সবুর দুজনে তড়িঘড়ি গুছিয়ে নেয়, নেবেই বা কি আর। সবুরকে তড়িঘড়ির কথা বলাই বাহুল্য। ওর নামটাই চালু হয়েছে—চলাফেরায়, কাজকর্মে ওর ব্যস্ততার জন্য। সবাই ওকে সর্বদাই 'সবুর' 'সবুর' করে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। নামটা ভাটি-বাঙলার মুসলমানী নাম হলেও এটা যেন ওর সহজাত নাম। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান এমন একাত্মা হয়ে মিশে থাকে যে এই ঘটনা মোটেই বিরল নয়—বিশেষ করে মেয়েদের নামের বেলায় তো নয়ই।

ডিঙিখানি, না এখন আর ডিঙি বলা ঠিক উচিত নয়, এখন ছইওয়ালা পানসী বলা যেতে পারে। পানসীখানি জলের কিনারায় পোতা লগিতে বাঁধা। বেদে চরের কাদায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে—সবই তো এসেছে, চোঙায় লবণ, হলুদ, তেল, সবই তো ছইয়ের গায়ে

ঝুলছে। 'কাঁথা ও' বালিশও এসেছে। মায় দুটো মাদুরও এসে গেছে।

বেদে হঠাৎ বলে ওঠে—আরে ব্যস্তবাগীশ ! সব তো এনেছিস, আমার জিনিসটাই তো আনিস নি !

—তোমার জিনিসটা কী ? 'বন্দুকটা !

—না, না, তা হবে কেন ? আমি কি বনে যাচ্ছি ? যা, যা, শীগ্‌গীর নোড়া। আমার হর্‌চি,' টিপ্‌লি' আর সুতোর বল্‌টা। সবই দাওয়ার কোণে আছে। যা।

—ও দিয়ে কী হবে ? কলকাতায় যাবে আবার জালও বুনবে ?

—যা না তুই।

সবুর চরের উপর দিয়ে ভক্‌ভক্ শব্দে ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মা-কেও নিয়ে এসেছে। ঠিক নিয়ে আসেনি, মা নিজেই তখন আসছিলেন। এসেই তবনের ছোট্ট আঁচলে মাথার চুল ঢেকে কোণাটা ওপাশে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছেন। 'দুগ্যোদোয়ানি' নদীর কূলে তখন ভোরের বাতাস। সে-বাতাসে নদীর বুকও যেমন ঝিরঝিরে দোলায় দুলে উঠেছে, তেমনি মায়ের দোপরতা বেড় দেওয়া তবনেও ঢেউ উঠেছে।

মায়ের কাছে এগিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বেদে ডিঙিতে উঠতেই সবুর চিৎকারে যেন মা-কে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো,—'বদর ! বদর !'

বেদে যেন মমতাভরে বলে উঠলো,—কেন, তোর বুঝি আর দেরি সয় না। দাঁড়া, যাত্রামন্ত্রের পুরো বয়ানটা বলে নিই :

'বদরের পায়ে দিয়ে ফুল।
বেয়ে ওঠো নদীর কূল ॥
মুখে বলো হরি হরি।
গুরু আছেন কাণ্ডারি ॥
লাও ভাই বদরের নাম।
গাজী আছে লেগ্‌পান ॥
দরিয়ায় পাঁচ পীর।
গাজী বদর বদর ॥'

বলেই বেদে দু-হাতের কোশে নদীর জল তুলে ছিটিয়ে দিলো ডিঙির গলুইতে, নিজের মাথায় আর সবুরের মাথায়। মন্ত্রপূত জলে যেন সকল বিপদকে আড়াল দিল। সঙ্গে সঙ্গেই লগি টেনে তুলে ধরে সেই হাতেই মা-কে দূর থেকে আবারও প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলো বিদ্যাধরীর স্রোতের টানে !

চার

বিদ্যাধরী। ভাগীরথীর পূর্বপারে ভাটি অঞ্চলের মানুষের কাছে আজ বিদ্যাধরী যেন বৃদ্ধা মায়ের মতো। মায়ের কাছে ঋণের কি কোনও সীমা-পরিসীমা আছে ! 'দু'হাজার বছরের ইতিহাসে যেটুকু জানা গেছে, তাতে বলা যায়, একদা দুর্দান্ত এই জলস্রোত গঙ্গার পলিমাটি বহন করে আপন মমতায় পলির প্রলেপ দিয়ে দিয়ে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর সৃষ্টি করে নিজে এখন শীর্ণ কায়া। এই বিদ্যাধরীর কূলে অতীতে দু-হাজারও বেশি বছর পূর্বে 'গঙ্গারিডির মতো সমৃদ্ধ' নগর বিরাজ করতো ; পলিস্তরের গভীর পরতে পরতে তার হাজার নজির মিলছে

এখন। পাঠান আমল তো সেদিনের কথা, সে যুগের কত কীর্তি চিহ্ন আজও যে ছড়িয়ে আছে এই বিদ্যাধরীর কূলেই।

বৃদ্ধা মা-কে মানুষ কিন্তু আজও ছেড়ে চলে যায়নি। মায়ের বুকের শীর্ণ জলধারাকে কোনোমতে নানা কলাকৌশলে বাঁচিয়ে রেখে তারই কূলে কূলে বসতি, বাজার ও গঞ্জের স্পন্দন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে যেন মেতে আছে। কুলটি, ভূষিঘাটা, হাটগাছিয়া, হাড়োয়া, কালিনগর, ন্যাজাট, সন্দেশখালি, রামপুরহাট, চুনাখালি, আর তারপরই রাঙাবেলিয়া ও গোসাবার পাশ কাটিয়ে বাঘের রাজ্য। বাঘের রাজ্যে এসে আজও বিদ্যাধরী যেন তার তেজময়ী রূপ বজায় রেখেছে। তেজী বাঘের চারণভূমি সুন্দরবনকে তেজী রাখতে তেজী স্রোতধারার যে একান্ত আবশ্যক।

দুগ্যোদোয়ানি বেঁকে এসে বিদ্যাধরীতে পড়েছে! সেই ত্রিমোহানায় উজান ঠেলে ওদের পানসী উত্তরমুখী বিদ্যাধরীর জোয়ারের টানে এবার পড়েছে। সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলেছে। বেলা সাড়ে আটটা বাজে। আজ দ্বিতীয়া, কাজেই নদীতে ইতিমধ্যে জো'র টান বেশ ধরেছে। ডিঙি দ্রুত এগুলেও বেদে সবুরকে বলে,—কি রে? চুপ করে বসে আছিস কেন, পালটা টাঙানা। দেখবি কেমন বেগে ছুটবে। লঞ্চের চেয়েও বেশি জোরে।

—তোমার বুঝি দেরি সহ্য হচ্ছে না! দাঁড়াও না, রাঙাবেলিয়া পার হতে দাও না!

—কেন, তুই বুঝি রাঙাবেলিয়ার মায়া ছাড়াতে পাচ্ছিস না।

—না, না, তুমি কিছু জানো না। দিদি বলেছিলো, সেই গোমর নদীর কূল থেকে সাতজেলে ছুটে পার হয়ে রাঙাবেলিয়া এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে। দ্যাখো না, ও নিশ্চয় এখনই এসে যাবে।

—দিদিটা কে রে?

—না, উনি জানেন না! মাধুরীদি! দিদির কলকাতা দেখার কি সখ! হ্যামিল্টন স্কুলে পড়ে কিনা, কলকাতার কথা পড়ে পড়ে কলকাতা দেখার জন্য কি যে কান্নাকাটি করে তা বলার নয়।

—তা, ওকে তুই সঙ্গে নিয়ে এলি পাত্তিস্।

—পাগল নাকি, তাহলে ওর পিঠে কি ছাল থাকতো! এক ক্রোস পথ হেঁটে গিয়ে স্কুলে পড়ে তা-ই মা ও বাবা সহ্যই করতে পারে না! আর কলকাতা! তাও আবার আমার ও তোমার সঙ্গে!!

রাঙাবেলিয়ার ঘাটগুলি এসে গেছে দেখে সবুর বলে,—তা বাউলেদা, ওপার দিয়ে চলো না।

—বললেই কি যাওয়া যায়। এখন সবে জো। ভাটির শিরা এখনও ওপার বয়ে গেছে নিশ্চয়। দেখি কতটা যাওয়া যায়। তুই পালটা মেরামত কর।

পালের মাস্তুলটা গুরোর ফোকরে বসাতে বসাতে সবুর দেখতে পায়, দিদি যেন সামনের ঘাটে এসেছে। মাঝনদী থেকে ঘাট অনেক দূর। তাহলেও স্পষ্ট বোঝামাত্র চিৎকার করে ওঠে,—দি-দি, আমরা চললাম। দি—দি, দি—দি......

নদীতে দূরের লোকের সঙ্গে কথা ভেঙে-ভেঙে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে হয়। দিদি তো এতো সবে অভ্যস্ত নয়, কি যে সে বললো কিছুই বোঝা যায় না। বাউলে তো হাতের বোঠে শূন্যে তুলে দোলায়। সবুরও আনন্দে হাতের হলদে-পানা পালখানা বাতাসে দোলাতে থাকে।

ডিঙি তরতর করে এগিয়ে যায়। মাধুরী এবার আড়ালে পড়ে গেছে। বাউলে বলে ওঠে,—সবুর, নে এবার তড়িঘড়ি পালটা টাঙা। আর মোটেই দেরি করিস না।

ডিঙি পালের হাওয়ায় মেতে উঠেছে। কল্‌-কল্‌ শব্দে যেন কথা বলে উঠেছে। বাউলে গুরোয় জড়ানো পালের দড়ি তার পায়ের বুড়ো আঙুলে আটকে নিয়েছে ; আর বাঁ হাতের চাপে বোঠে গলুইতে চেপে ধরে ডান হাতে হাল ঘোরায়। ডিঙি নৌকো, ঠিকমতো শক্ত হাতে হাল না ধরলে কখন যে হেলিয়ে পালের নৌকো জলের তলে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। বাতাসের তেমন দাপটি এখন না থাকলেও, সাবধানের তো মার নেই।

সবুরের কোনও কাজ নেই বললেই চলে। ঘোড়ায় চড়ার মতো গলুই-এর দুপাশে পা ছড়িয়ে বসেছে। যেন ঘোড়ায় চেপে কলকাতা পাড়ি দেবে ! ফুরফুরে বাতাসে সবুর গুনগুন করে ওঠে।

বাউলেও আর থেমে থাকতে পারে না। প্রাণখোলা সুরে ভাটিয়ালি গেয়ে ওঠে :

'ও বিদেশী বন্ধু...'

ঝমাৎ করে সবুর যেন বাউলেকে থামিয়ে দেয়,—আঃ তুমি কি গো বাউলেদা !!

—কেন কি বলতে চাস ?

—কি আর বলবো। একটু আগে তুমি এই গান গাইতে পারতে না ? মাধুরীদি কি ভালবাসে না এই গানটি ! জানো সে-বার গোসাবার রবিঠাকুরের মাঠের জলসায় পরপর দুদিন এই গানটি তুমি গেয়েছিলে। তখন সেই সুর দিদি ধরে নেয় তোমার গলা থেকে ! আর তখন থেকে যখনই একলা ঘোরাফেরা করে তখনই গুনগুন সুরে এই গান ওর মুখে। গাও, গাও, এখনও দিদি শুনলেও শুনতে পারে। গাও, গলা ছেড়ে গাও।

গলায় খাঁকার দিয়ে বাউলে আরও চড়া ভাটিয়ালির টানে গেয়ে ওঠে :

'ও বিদেশী বন্ধু !
তুমি রোজ বিকালে
গাঙের কূলে
রোজ বেয়ে যাও তরী।

আমি একলা ঘাটে
    বসে যে ভাবি
    ভাসায়ে গাগরী।
রোজ বেয়ে যাও তরী।

ভাটির টানের সাথে
    ও তোর ভাটিয়াল সুরে
চোখের কাজল যায় ধুয়ে মোর
    নয়ন আমার ঝরে।
বন্ধু ! নয়ন আমার ঝরে।

তুই যদি গাঙ হোস বন্ধু "
    আমি তাইতে ডুবে মরি.
    বন্ধু ভাসায়ে গাগরী।
    ও বিদেশী বন্ধু !'

দরাজ গলায় ভাটিয়ালির সুর বুঝি সবুরের মনেও ঢেউ তোলে। এ ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ

নয়, কূলকুলও নয়। নদীর বুকের জল অনেকখানি নিজেকে টেনে নিয়ে যেন তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু তুঙ্গে উঠেও সেই দোলায়িত জল কলরবে ভেঙে পড়ে না। আবার নিচে নামার মোলায়েম টানের পরক্ষণেই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে তুঙ্গে ওঠে। মনের আবেগকে যেন ভাটিয়ালি সুর একইভাবে ছন্দায়িত দোলায় দুলিয়ে দেয়।

গান দীর্ঘায়িত করার বাসনায় বাউলে যেন পঙক্তিগুলি বারবার তিনবার করে গাইলো। বাতাসে বিক্ষুব্ধ বিস্তীর্ণ নদীর বুকে ভাটিয়ালি সুর এমনভাবে নাড়া দেয় তা বলার নয়। সবুরের তাগিদের অপেক্ষা না রেখে বাউলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা গান গেয়ে উঠলো।

সে-গান শেষ হতেই বাউলে এক সময়ে মোলায়েম ভাবে ধরা-গলায় বললো,—সবুর সোনা! জানিস আমরা কতদূর এসে গেছি? ঐ দ্যাখ, দূরে দেখা যায় আমতলী নদীর তেমোহানা। তার মানে চুনাখালি অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম পশ্চিম পারে রামপুর হাটে একবার ডিঙি ভেড়াবো! ভুলেই গিয়েছিলাম রামপুর হাট বসে তো সোম ও শুক্কুর। আজ তো রোববার। তাই চল্ সোজা সন্দেশখালি গিয়ে ডিঙি লাগাবো। যেতে যেতে জো' শেষ হয়ে যাবে, ভাটিটা ওখানেই কাটিয়ে নেবো।

—বাউলেদা, তাই করো। ভালই হবে, আজ তো রোববার সন্দেশখালির হাট আজই তো। তাই না?

—তোর দেখি সব খবর জানা আছে। তা অতো ভাবছিস কি?

—বাউলেদা ভাববো আর কি! ভাবছিলাম দিদির কথা। মনে ভারি হাসি পাচ্ছিলো। দিদি বলে কি, তোমার চেহারাটা কাপালিক সাধুর মতো। তাইতেই তো, তোমাকে দেখে বাঘও ঘাবড়ে যায়।

—ধ্যুৎ, বাঘ আবার ঘাবড়ে যায় কখনও। ও-জীব সে-জীব না। রাখ্ ও-সব কথা। কদমতলী নদী ছাড়িয়ে বিদ্যা নদীর দু-বাঁক যেতে না যেতেই আমরা এসে যাবো রায়মঙ্গল নদীব মোহানা, এটাও তেমোনা।

—রায়মঙ্গল! রায়মঙ্গল তো কালোপানির নদী! তাই না বাউলেদা?

—হ্যাঁ, কালোপানির নদীই। ভারি গাঙ। জো'র তোড়ও বড্ড বেশি। তেমোহানার মুখে বড্ড ঘোলা। বিদ্যার জল আর রায়মঙ্গলের জল মিশে তোলপাড় করতে থাকে যেন। জলে ঘূর্ণি ওঠে বারবার। তাইতেই তো পশ্চিম পার ঘেঁষে হাল ধরেছি। ঘোলার ফেরে যাতে না পড়ি।

—বাউলেদা, ঠিক ধরেছো! মোহানা পেরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলেই হবে। তারপর নলছ্যাঁও দিয়ে ওপারে সন্দেশখালি যাওয়াই নিরাপদ। তাই চলো।

—তুই দেখি ওস্তাদ নেয়েব মতো কথা বলছিস।

ওদের পানসীখানা এখন খুবই কূল ঘেঁষে চলেছে। কূলে হরকোচা গাছের ঝাড় মাথা নুইয়ে গাঙের জলে ঝুঁকে পড়েছে। ঝাড় ছাড়ালেই উপরে ভেড়ি। মেছো-ঘেরির ভেড়ি।

হঠাৎ বাউলে চিৎকারে দাবড়ি দিয়ে ওঠে,—সবুর! করছিস কি, এখনও জলে পা ঝুলিয়ে! তুরন্ তোল! পা উপরে তোল। তোল বলছি!

—কেন অমন করছো!

—করবো না! দ্যাখ, ঐ ওদিকে দ্যাখ। কতো বড়ো একটা সাপ হরকোচা ঝাড়ের ফাঁকে ঢুকবার চেষ্টা করছে।

বোঠেখানা লাঠির মতো উঁচিয়ে ধরে বাউলে বলে,—জানিস, ওটা কি সাপ? দাঁড়াস সাপ। ওরা গরুর পা জড়িয়ে ধরে বাঁট থেকে দুধ খেয়ে যায়।

—আমি কি গরু!

—তা না ; তোর জল-ছোয়া পা পেলেই ঝমাৎ করে পা বেয়েই ডিঙিতে উঠে পড়তে দেরি করতো না। তখন ডিঙি থেকে ওকে জলে ফেলা এক দায়।

—বাউলেদা, তুমি ওদিকে নজর দিলে কি করে?

—আমি কি সাপ দেখছিলাম? দেখছিলাম কুমির। বাঁ-পারে জানিস শুধু ভেড়ি আর ভেড়ি। মাছের ভেড়ি। মাছের তল্লাসে কুমির নদী থেকে ভরা কোটালে উঠে উঠে যায় ভেড়িতে। ভাবছিলাম, আমাদের পরে কোনও হামলা না করে।

সবুরের মেছো কুমির নিয়ে তেমন উৎকণ্ঠা আছে বলে মনে হয় না। যতো উৎকণ্ঠা ওর সাপ নিয়েই। সাপের কিলবিল করে চলা দেখলেই ওর গোটা শরীরটা কেমন যেন তিড়বিড় করে ওঠে।

পা দুটো তাড়াতাড়ি তুলে গোটো হয়ে বসে বলে,—আচ্ছা বাউলেদা, তুমি তো বাঘের বাউলে, তুমি কেন সাপের মন্তর শিখলে না?

—সাপের? হবে, পরে সে কথা হবে। আগে সন্দেশখালি পৌঁছে নি তো। জো' তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। ধর বোঠে, খোচ্‌মার। এখান থেকে নলছ্যাঁও দিলে সন্দেশখালি হাটের ঘাটে গিয়ে ঠিক উঠবো। কই? ধরেছিস?

উঠতি বয়সে কোনও কাজের মত কাজ পেলে কি রক্ষে আছে। সবুর ঝমাৎ করে বোঠের খোঁচ মারতে শুরু করেছে। বাউলেও পায়ের আঙুলে আটকানো পালের দড়ি ছেড়ে দেয়। পালখানা মাত্র পৎপৎ করে বেখাপ্পা হাওয়ায় দুলছে। সবুরের খোলা পাল ভালো লাগে না। এক লহমায় বোঠে ছেড়ে পাল গুটিয়ে মাস্তুল নামিয়ে রাখে।

কোণাকুণি পার হয়ে ওরা ঠিকই সন্দেশখালি হাটে এসে ভিড়েছে। এবার ওদের দুজনের বেড়ানো আর টুকটাক বাজার করা ; তারপর রান্না-বান্না সেরে রাতের সুজনের জন্য অপেক্ষা করা।

সন্দেশখালি হাট লোকে লোকারণ্য। লোকের থেকে নৌকাই বেশি বোধহয়। দুই বড় নদীর ত্রিমোহানা। নৌকো সব এসেছে এবং আরও আসছে দুই নদী বেয়ে। কতো রকমারি মালে বোঝাই সব। কেউ এসেছে বনের সম্পদ—কাঠ, পাতা, মধু ও মাছ নিয়ে, কেউ আবার এসেছে বাঙলাদেশের নানা সম্পদ নিয়ে রায়মঙ্গল নদীর স্রোতের টানে। এদের মধ্যে হয়ত অনেকে এসেছে বিদেশী চোরাগোপ্তা মাল বোঝাই করে। আবার হয়ত মেদেনিপুর থেকে মাতলা নদী পথে এসে চলেছে বিদ্যাধরী ধরে খাস্ কলকাতায়। তাদের মধ্যে হাঁড়ি-কলসী আর খড়কুটোর নৌকোই বেশি।

ভাতেভাত আর চিংড়ীভাজা—বনেবাদাড়ে এ তো রাজভোগ। পেটপুরে খেয়ে দুজনে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন সময়ে দ্যাখে, ব্যাপারী নৌকোগুলি একে-একে রাতের জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছে: সবুর আর থাকতে পারে না। বলে,—বাউলেদা, আর ঢিলে দিয়ে কি লাভ। চলো আমরাও রওনা দিই। দল বেঁধে যাবো। ভয় পেয়ে দেরি করি কেন?

—ভয়ের কথা তোর মনে এলো কেন? ডাকাতির ভয়? ছ্যাচড়া ডাকাতি বিদ্যাধরীর কূলে হয় না, আমাদের ওসব নিয়ে ভাববার কিছু নেই।...তবে আমরা পুরো জো'টা কাজে লাগাতে পারবো না। ন্যাজাট আর তিন-পো জো'র পথ। ন্যাজাটের পর শেষ সিকি জো'তে এগিয়ে বিশ্রাম নেবার মতো বড় হাট-বাজার পাবো না। তাই ভাবছি, চল যাই ব্যাপারীদের সঙ্গেই চলে যাই ন্যাজাট পর্যন্ত। সেখানেই সময় কাটিয়ে পরের জো' ধরবো দুপুর গড়ালে।

পাঁচ

ন্যাজাটকেই বোধহয় সুন্দরবনাঞ্চলের শেষ উত্তর সীমা বলা যায়। সুন্দরবনের পরিবেশ, সুন্দরবনের গন্ধ, সুন্দরবনের ছায়া যেন এই অঞ্চল থেকেই বিলুপ্ত। সুন্দরবন থেকে সোজা উত্তরমুখী হয়ে বিদ্যাধরী এখানে এসেই পশ্চিমে বাঁক নিয়ে সোজা চলে গেছে সুদূর বেলেঘাটা অঞ্চলে—কলকাতার শহুর সভ্যতার আওতায়। বিদ্যাধরীই যেন এই সীমানা টেনে দিয়েছে।

ন্যাজাটে এলেই যেন শহর-সভ্যতার ব্যস্ততা ও কর্মযজ্ঞের উন্মত্ততা অনুভূত হতে সময় লাগে না! ফলে সুন্দরবনের ভয়হীন বেপরোয়া কিশোর সবুর এখানে কেমন যেন স্তিমিত হয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও বাউলে যেন সহসা এই শিশুর সহজ সবল উন্মাদনা ফিরিয়ে আনতে পারে না।

এরপরে ওরা একটানা সেই জোঁতেই হাড়োয়া আসে। রাতে হাড়োয়া কাটিয়ে শেষরাতের জোঁতে কলকাতার দিকে এগিয়ে যাবে। এতক্ষণ ওরা পশ্চিমমুখে মালঞ্চ ও হাড়োয়া নদী ধরেই এগিয়েছে। ভিন্ন নাম দিলেও এসব নদীও বিদ্যাধরী, তবে এগুলি স্থানীয় নাম মাত্র। এবার ওরা শীঘ্রই উত্তর-পশ্চিমমুখী ভাঙ্গুর খাল এবং শেষমেশ কেষ্টপুর খাল ধরে এগিয়ে খোদ কলকাতায় এসে পড়বে।

হাড়োয়াতেও ন্যাজাটের পরিবেশ। কলকাতার গন্ধ আরও ঘন হয়ে এসেছে। এখানে রাতে দূরদিগন্তের আকাশে আলোর ছটা বলে দেবে যে তোমরা কলকাতার কাছেই এসে গেছো। মাঝে মাঝে খালের দুপাশে শুধু মাছের ভেড়ি আর ছোট ছোট গ্রামের গাছ-গাছড়া। এই গোটা অঞ্চলেই জলধারার শাখা-উপশাখা যেমন বিদ্যাধরীর, আর এর মাটিরও ধাত্রী তেমনি বিদ্যাধরী। কলকাতার যান্ত্রিক সভ্যতা আজ কোথাও মাটি কেটে, কোথাও বাঁধ বেঁধে, কোথাও খাল কেটে, কোথাও বা মাটি ভরাট করে ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের দিকে বাহু বিস্তার করে চলেছে।

ওদের ডিঙি এখন বাঙ্গুর খালের মধ্যে। হঠাৎ এক ঘটনা ওদের মনকে টেনে নিল সুন্দরবনের দিকে। দ্যাখে, ভোরসকালেই একজনকে খোলা পাটাতনে শুইয়ে এক ডিঙি চলেছে কলকাতার দিকে। জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পেলো, শেষরাতেই লোকটাকে কাল্-সাপে কেটেছে। জনাদশেক জোর দাঁড়-বোঠে বেয়ে সাঁ সাঁ করে চলেছে, কলকাতার হাসপাতালে যদি বাঁচানো যায়। যেন ওরা তীরের বেগে চলেছে। সেদিকে সবুর সামনের বাঁকের মাথা অবধি এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো। বাঁকের মাথায় ওরা মিলিয়ে গেলে মন-মরা মুখ নিয়ে আজও আবার বাউলেদাকে প্রশ্ন করে, —আচ্ছা বাউলেদা, তুমি বাঘের বাউলে, কিন্তু সাপের বাউলে হলে না কেন?

উত্তরে বাউলে তার ছোটবেলার এক দীর্ঘ কাহিনী পাড়ে। কাহিনী দীর্ঘতর করে যায় ছেলেমানুষের মনকে চাঙ্গা করার মানসে। শোন তবে :

শপাং শপাং......বেতের বাড়ি, যাকে বলে কষাঘাত! কি যে মার খেয়েছি একদিন ছেলেবেলায়! পিঠের ছাল উঠে যাবার মতো।

আমার আদি বাড়ি ছিলো কোথায় জানিস! সেই বড়দলের কাছে। দেশ-বিদেশে যার খ্যাতি—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ির কাছাকাছি। তাঁর ভাইপো—যামিনীবাবু। জানিস্ তাঁর মতো সাপের ওঝা এই গেরদে আর কেউ ছিলো না। সুন্দরবনের বাদা ও আবাদে ক'জনকে আর বাঘে খায়! তার চেয়ে সাপে কাটে ঢের বেশি মানুষ। তাই যামিনীবাবুর নাম-ডাক

ছিল সকলের কাছে ও সর্বত্র। মানুষটির সাধুর মতো চলাফেরা। বিয়ে-থা করেননি। পরনে ধুতি, গায়ে কোনো জামা নেই। কোঁচার খুটই গা ঢাকার কাজ মেটাতো। মুখে দাড়ি আর খালি পা। এই মানুষ সুন্দরবনে আইরাজের মতো ভঁয়াল বিষধর সাপ সব ঝমাঝম ধরে ধরে বিষ ঝেড়ে ঝাঁপিতে পুরতেন।

এমন মানুষকে ভক্তি না করে কি উপায় ছিলো। কতো মানুষ যে তাঁর হাতে সাপে কাটা থেকে বেঁচে গেছে তার হিসেব নেই। ছেলেবেলায় তাঁর মত একজন ওঝা হবার ভারি বাসনা হয় আমার। হলে কি হবে, তাঁর দ্বারস্থ হবার উপায় ছিলো না। দেখেছি, তেমন ইচ্ছে নিয়ে কেউ এলে এই মানুষ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। এমনিতে খুব হাসিখুশি। কিন্তু সাপের কথা উঠলে তাঁর মুখ হয়ে যায় গম্ভীর। কে তখন তাঁর কাছে এগুবে!

শেষমেশ, এক বেদে সাধু পথের ধারে এক গাছতলায় এসে হাজির। সেখানেই আগুন জ্বেলে রাত কাটাবার মতলব। তার ঝাঁপিতে কয়েকটা সাপও ছিলো। আমার পাঠশালায় যাবার পথেই পড়ে তার গাছতলা। একদিন তাকে ও তার ঝাঁপিগুলো দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে যাই। মনের খুশিতে তাকে দু-আনা পয়সা দিয়ে ফেলি। সেই হলো কাল। সাধু তো আগে বেড়ে প্রশ্ন করলো,—খোকা, সাপের মন্তর শিখবে? যদি শিখতে চাও তাহলে রোজ আমাকে কিছু দিও।

কি করে সাধু-ওঝা আমার মনের কথা জানলো জানি না। আমি আশায় আশায় আমার পাঠশালার খাবার পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রোজ সাধুকে এক-আনা বা দু-আনা দিতাম। বাড়িতে দাদা বাবাকে কিচ্ছু বলিনি। আমি রোজই পয়সা দিয়ে চলি। আমার জন্য সাধু তো কেমন যেন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এলেই মুখরা হয়ে কত যে এটা-সেটা প্রশ্ন করে তার ঠিক নেই। কিন্তু কিছুতেই সাপের মন্তরের কথা পাড়ে না।

একদিন তো হঠাৎ বলে বসে,—খোকা, আমি চলে যাবো। আমার যেতেই হবে। ডাক এসেছে। কামাখ্যা তীর্থে যাবো। তোমার কাছে যা পয়সা আছে সবই দিয়ে দাও, তোমার মঙ্গল হবে।

—কিসের ছাই মঙ্গল হবে! কৈ, তুমি আমাকে সাপের মন্তর শেখাবে বলোনি?

—আচ্ছা দাঁড়াও, শেখাচ্ছি, শেখাচ্ছি—বলেই ঝাঁপি থেকে একটা সাপ বের করে বিড়বিড় করে কি সব বললো। বলেই সাপটাকে আবার ঝাঁপিতে রেখে দিয়ে বললো,—নাও, লিখে নাও।

আমি তাড়াতাড়ি স্লেট-পেনসিল বের করেছি দেখেই ওঝা বলে,—না, না, ওতে হবে না। ওতে কি সাপের মন্তর লেখা যায়! কলাপাতা নিয়ে এসো আর ঐ ছোটো খেজুরগাছের একটা কাঁটা। কলাপাতার উল্টোদিকে খেজুরের কাঁটা দিয়ে লিখতে হবে। দেখো যেন, আড়াআড়ি লিখো না, না-হলে পাতাই কলা ফেঁড়ে যাবে। লেখো—

"কেঁচো ধরো, কুঁচে ধরো;
ওস্তাদের নাম জাহির করো,
শালা কেউটে ধরেছো কি মরেছো।"

আরও লেখো:

"এই বলেই পিঠেই তিন চাপড়,
ভাণ্ডারের বিষ আপছে নেমে আসবে।"

পরে বাড়ি গিয়ে লালকালি আর খাগের কলমে ওঝার এই মন্তর বেলে কাগজে লিখে

নিবি। খবরদার! সেই কালি ও কলমে আর কোনও কিচ্ছু লিখবি না। তাহলে কিন্তু সব মন্তরই ফস্‌-মন্তর, কোনও কাজে দেবে না।

আমি তো বাড়ি গিয়ে কাউকে কিচ্ছু বলি না। মাটির সরায় লালকালি আর খাগের কলমও যোগাড় করেছি। একখানা বালি কাগজে মন্তরটা লিখে বারবার পড়ে ভাল করে নাম্‌তার মতো মুখস্থ করে ফেলি। চলতে ফিরতে বারবার মনে-মনে আউড়ে নেবার বিরাম নেই, পাছে ভুলে যাই। তারপর, দূরে ভাটির চরে নেমে কাদার তলায় মাটির সরাখানা আর খাগের কলমটা বেশ করে চেপে উপরে মাটি লেপটে দিই।

পরদিন বিড়বিড় করে মন্তরটা আওড়াতে আওড়াতে বাড়ির খিড়কি খুলতেই তো থ মেরে গেছি। দেখি, একখানা বেত হাতে বাবা গুম্‌ মেরে সামনে দাঁড়িয়ে। বাবার সেই কট্‌মটানি চাহনি দেখে আমার আত্মারাম খাঁচা। শুধু একবার হেড়ে গলায় বাবার আওয়াজ এলো—আ-য়!

বাবার বাঁ-হাতে মন্তরের সেই বেলে-কাগজখানা। আমি তো যাবার সময় হাতনের চালায় গুঁজে রেখে গিয়েছিলাম। কেমন করে খুঁজে পেলো? ভাববো কি···, হাতের মুঠোয় লোনাপানির বেত লিক্‌লিকিয়ে উঠেছে······সে কি মার!! বাবার মুখে একবার মাত্র কথা বেরিয়েছিলো—যাবি আর মন্তর শিখতে!···সেই সপাং সপাং মারে তিনদিন বিছানা নিতে হয়েছিলো আমার।

সবুর কিন্তু সপাং সপাং বেতের কষাঘাতের বর্ণনায় নির্বিকার। মন্তরটা নিয়েই তার যতো মাথাব্যথা। বললো,—আচ্ছা বাউলেদা, তুমি মন্তরটা কখনও পরখ করে দেখেছো?

—ধ্যুৎ!···জানিস এতোবড়ো ওঝা যামিনীবাবুর শেষমেশ কি হয়েছিলো? অতো নাম-করা ওঝাকে সাপের কামড়েই মরতে হয়েছিলো। ওসব মন্তর-টন্তর কিচ্ছু না!

ছয়

সাপের গল্প শেষ হতেই সবুর কিছুটা বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। এদিকে দুপুরও গড়িয়ে গেলো প্রায়। কেষ্টপুর টোল অপিস আসতেই বেদে মিষ্টি হেসে বলে,—সাঙাত! চল একটু জোরে বেয়ে চল। আর তো কলকাতা এসে গেছে।

—কি করে বুঝলে এসে গেছে, বাউলেদা?

—দেখছিস না, কতো নৌকো। এই সরু খাড়িতে কতো আর ধরবে! চল পাশ-কাটিয়ে পাশ-কাটিয়ে, আমাদের ছোট্ট, ডিঙি, ঠিকই এগিয়ে যাবো। দূরে ঐ দেখছিস 'লালকুঠি'। লালকুঠি ছাড়ালেই কোলাঘাট পৌঁছে যাব। কত রকমারি নৌকো ও ডিঙি সব আটক পড়ে গেছে—মাছের নৌকা, পানের ডিঙি, পাঁঠা-ছাগলের নৌকো, গুড়ের লম্বা ডিঙি, মুরগীর নৌকো—টোল আদায় না অবধি এদের কাউকে ছাড়বে না। আমাদের তো খালি ডিঙি, চল আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের মিছেমিছি কেন ঠেকাবে। জানিস্‌, কোলাঘাট ছাড়িয়েই উল্টাডিঙির কোল ঘেঁষে বেলগাছিয়ার পাকাপুলে পৌঁছে যাব। সেখান থেকেই তো খাস কলকাতা শুরু।

দেখতে দেখতে ওদের ডিঙি সেই পুলের পাশে এসে গেছে। এলে কি হবে, ডিঙি ভেড়াই দায়। ছোটো বড়ো ডিঙি ও নৌকোয় ছয়লাপ। ডাঙা ছুঁতে না পেরে এক বড়

ডিঙির গায়ে ওদের পানসী বেঁধে দিলো। এ-সব কাজে বেদে তো বড়দল থেকেই অভ্যস্ত, মায় গোসাবায়ও এমন জিনিস ঘটে প্রতি হাটবারে।

কলকাতার মাটিতে নেমেই খালের উঁচু পাড় বেড়ে উঠতে উঠতে সবুর আশ্চর্য হয়ে বলে,—কি প্রকাণ্ড ভেড়ি দিয়েছে বাউলেদা? কতো বড়ো আবাদ এই কলকাতা?

কলকাতার ভেড়ির ওপর উঠেই নাক ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলে,—পাচ্ছ বাউলেদা?

—কি পাচ্ছি রে?

—কেন, সুন্দরবনের গন্ধ পাচ্ছো না?

—ঠিকই বলেছিস, ঐ দ্যাখ খালের পাড়েই সুন্দরী গাছের বল্লার পাহাড়পানা। টিনের চালায় সব সার বেঁধে বসে সুন্দরী বাল্লার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। ঐ ছালে কি হয় জানিস? রঙ বানায়, চামড়া ট্যান করার রঙ। কতো কি দেখবি!! শুধু দেখবি কেন, কতো কি শুনবি—কলকাতার পাড়ার নাম শুনবি—বাঘ-বাজার, বাঘমারি, বাঘডোরা, বাঘপোতা, বাঘুইহাটি, হরিণবাড়ি—কলকাতা এক সময়ে যে সুন্দরবনই ছিল।

সুন্দরীগাছের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, আর বাঘ হরিণের নাম শুনতে সবুরের মনে হতে থাকে, সে সুন্দরবনের আওতাই যেন আছে। বনের ছেলের মনে বুঝি আত্মবিশ্বাস আসে,—না, সে কলকাতায় খেই হারিয়ে বসবে না।

অতো উঁচু ভেড়ি দেখে সবুরের মজাই লাগে। এক দৌড়ে উপরে এসে হাঁপাচ্ছে। হাঁপাবে কি, স্তম্ভিত হয়ে গেছে বেলগাছিয়ার পুলের উপর দিয়ে ট্রাম গড়গড় শব্দে ছুটে আসছে। বোধহয় রেললাইন! একটু ছুটে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করে, সত্যি রেললাইন আছে কিনা। দূর থেকে অবাক হয়ে দ্যাখে, সোজা কালো রাস্তায় ট্রামগাড়ি যাচ্ছে গড়গড় করে।

ছুটে যেতেই বাউলে ওকে তাড়া দিয়ে ওঠে,—ছুটবি না, খবরদার ছুটবি না। তোকে ধরে নিয়ে পালাবে!

—কে ধরবে আমাকে? বাঘ আছে নাকি?

—বাঘ কেন? মানুষই তোকে নিয়ে পালাবে!

—মানুষ!!

পদে পদে সবুরকে অবাক হতে হচ্ছে। মানুষের ভীড়, ছুটোছুটি কোলাহল, নানা ধরনের গাড়ির রকম-বেরকম হর্ন ওকে সমানেই আকৃষ্ট করছে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে আসতেই তো থ মেরে গেছে। মোড়ের মাথায় বলিষ্ঠ ও ছুটন্ত ঘোড়ার উপর নেতাজীর মূর্তি। নেতাজীর কথা ইতিপূর্বে শুনেছে, ইতিহাসের পাতায়ও পড়েছে। ওকে এখন আকৃষ্ট করেছে ঘোড়ার দৃঢ় পদক্ষেপগুলি। অন্য সব কিছু ফেলে সেদিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই।

বেশ কিছুটা সময় কেটে যাবার পর বাউলে সবুরের কাঁধে ঝাঁকা দিয়ে বলে,— চল, চল যাই বাঘবাজারের রাস্তা ধরি। বেশি দেরি করা ঠিক না।

একে ওকে জিজ্ঞাসা করে তো বাগবাজারের রাস্তায় পড়েছে। ভাবে, এবার কাকে ধরি। সবাই যেন হন্নে হয়ে ছুটেছে, কারও বুঝি অন্যের কথায় কান দেবার অবকাশ নেই। একজনের একটু ঢিলেপানা চলা দেখেই তাকে জিজ্ঞাসা করে,—আচ্ছা শুনবেন, বিলাসবাবুর কোন্ বাড়িটা হবে?

—আপনারা কোত্থেকে আসছেন? দেখেই মনে হচ্ছে, গ্রামদেশের লোক।

—আমরা? আমরা সুন্দরবনের লোক।

—তা, কোথায় এসেছেন?

—এসেছি বাঘবাজারে।

—সোঁদরবনের লোক বাঘের বাজারে !! —ফোঁড়ন কেটেই পাশ কাটায়।

হাঁটতে হাঁটতে বাগবাজার রাস্তার প্রায় শেষ মাথায় এসে গেছে। কতজনকে যে বিলাসবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কোনও হদিশ মেলে না। সহসা সবুর একবার বিরক্ত হয়েই বলে,—আচ্ছা বাউলেদা, তুমি না একদিন বলেছিলে বিলাসবাবুর কি যেন একটা আসল নাম ছিলো ?

—দাঁড়া, সবুর···তুই ঠিকই বলেছিস ! আসল নাম···আসল নাম···অবিনাশ সাহা !!

নতুন উৎসাহ নিয়ে একের পর এক অবিনাশ সাহার খোঁজ করতে থাকে। তবু কোনও হদিশ মেলে না। শেষমেশ এক গলির মুখে বাচ্চা কোলে নিয়ে রকে বসা বুড়ো গোছের একজনকে প্রশ্ন করতেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খোঁজ নিয়ে বলে,—অতো তো বলতে পারবুনি। তোমরা বরং হাতিবাগানে যাও। সেখানে কাপড়ের দোকান অনেক। কেউ না কেউ বলতে পারবে। একই ব্যবসা তো !

ইঙ্গিত পেয়েই ওরা হাতিবাগানের পথ ধরে। সবুর তো জায়গাটার নাম শুনতেই চমক খায়, হয়তো অনেক হাতি এবার দেখবো। মশগুল হয়ে আছে সেই প্রত্যাশায়। তাছাড়া আরেক ব্যাপারে এক মহা তৃপ্তি এনে দিয়েছে তার মনে। বাউলেদাকে মনে করিয়ে দিয়েছে অবিনাশ সাহার নামটা। বাউলেদা তো তখন হা-হা করে হেসে ওঠে—'শাবাশ্ সবুর ! ভাগ্যি, তোকে সঙ্গে এনেছিলাম। সবুর তখন তরতর করে এগিয়ে চলে, ভুলে যায় আশপাশের বাড়ি ও মানুষ দেখতে।

হাতিবাগানে সামান্য কিছু এ-ঘর ও-ঘর করতেই বড রাস্তার উপরই অবিনাশ সাহার গদি মিলে যায়। বাউলে তো কার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে তা ধরতেই পারে না—মায়ের প্রতি, না সবুরের প্রতি, না কলকাতার মানুষের প্রতি !

বিলাসবাবুকে সামনে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে বাউলে। বিলাসবাবুও উল্লাসে উৎফুল্ল। একটানা বলে চলেন,—তা বাউলে তুমি কোথায় উঠেছো ? আমি তো এখন গদি ছেড়ে যেতে পারবো না। এক মুহূর্ত নজর না রাখলে কি দিয়ে কি হয়ে যাবে। এ যে কলকাতা। তুমি অবশ্য রাত্রে আমার কাছ আসবে, এখানে নয়, আমার বাড়িতে। তখন সব কথা হবে, নিশ্চিত আসবে। এই নাও আমার ঠিকানা, বেশি দূরে নয়। ঐ যে দেখছো গলিটা সেটা ফুঁড়ে যাবে—এই যেমন বাদায় দোয়ানি খাল ফুঁড়ে এ নদী থেকে আরেক নদীতে পড়তে। দোয়ানির অন্য মাথায় আরেক বড় রাস্তা পড়বে। সামনেই একটা বাদার শিষের চেয়েও আরও সরু গলি। সেই গলির মুখেই আমার বাড়ি। এ নাও আমার ঠিকানা। কাগজটা হারিও না কিন্তু।

অতো সাবধানী হতে দেখে বাউলে নিজেও সাবধানী হয়ে ওঠে। বলে,—তা নয় হলো, আমরা আছি আমাদের ডিঙিতে, কেষ্টপুরের খালের মুখে ; সেখানে ফিরতেই হবে। ডিঙিটা যাতে খোওয়া না যায়।

দোকানে সন্ধ্যের খদ্দেরের ভিড়ে কোনমতে ওদের দুজনকে বিদেয় দিয়ে বিলাসবাবু বলেন,—তুমি আসবে, নিশ্চয়ই আসবে, অনেক কথাবার্তা আছে, আসবে।

রাতে ওরা ঠিকমতই এসেছিলো। তখন পাশে বসে অতিথি আপ্যায়ন করলেন নিতান্ত আপনজনের মতো। বড়দলের কতো পুরনো কথা উঠলো। সে-সব গল্প সবুর যেন গো-গ্রাসে গিলে মনের মধ্যে জমিয়ে রাখে। বাউলেদা সম্পর্কে দিদির কত প্রশ্নের জবাব পেয়ে যে কি পরিমাণ আহ্লাদিত হয়, তা বলার নয়। সারাক্ষণ তার মুখখানাকে ভেবাচেকা

করে রেখে সে কিন্তু মনের আহ্লাদকে চাপা দিয়ে রাখে।

সবশেষে বেদে বন্দুকের কথা পাড়ে। যে-কথা পাড়তে বাউলে এতো দূর ঠেঙিয়ে আর এতো আড়ম্বর করে এসেছে। আদ্যোপান্ত সবই সে বলে। বন্দুকের কথায় এলেই মায়ের কথা ওঠে।

—আচ্ছা বাউলে, বন্দুকের কথায় আসছি। আগে বলো মায়ের খবর কি ? ভালো আছেন তো ?

—মায়ের কথা কি আব বলবো। সে কি মা-র কান্না হিংগলগঞ্জে, কিছুতেই তার মন চায় না অন্য কোথাও যেতে। বিলাসবাবুব সঙ্গেই কলকাতায় আসবে।

—আচ্ছা বাউলে, সেদিন অমন নিরুদ্দেশ হলে কি করে ? হাসনাবাদ পৌঁছে দেখি, তোমার ডিঙি নেই। ভাবি, হয়তো কোথাও বাঘের পাল্লায় পড়েছে ? না হয়, গাঙের কুমির টেনে নিয়ে গেলো বা !

—না বিলাসবাবু। তেমন কিছু হয়নি। কেন জানি না, আমার যেন তখন ভূতে পাওয়া অবস্থা। বাদা ফেলে আসতে মন যেন কেমন করে উঠলো। কিছুটা অপেক্ষা করেই ভাটির টানেই ডিঙি ভাসিয়ে দিলাম বাদামুখো। বাদার কোলে আসতেও দেরি হয় না। মা তখন একটু কাৎ হতে গিয়ে বিছানা খুলতেই আপনার বন্দুকটা দেখামাত্র চিৎকার করে ওঠে,—'এ কি করিছিস বেদে ! এ কি করিছিস্ !' মা-কে কিছুতেই শান্ত করতে পারি না। কতোবার বললাম, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার মাথায় তখন পাগল-করা উদ্বেগ—কলকাতা আর বাদা নিয়ে। আমার ভুল হয়ে গেছে। মা কি তাতে শোনেন। শেষে বারবার কথা দেই, আমি নিজে কলকাতায় এসে অতি-অবশ্য বন্দুকটা দিয়ে যাবো। কথা দিলেও মা-র মন কি শোনে !

—না বেদে, তোমার শোনাতে হবে না। মা-কে বলো···

—না, না, তা হয় না। আমি বন্দুকটা সঙ্গে নিয়েই কলকাতা আসছিলাম ; কিন্তু ভেবে দেখলাম, বিপদ হতে পারে, লাইসেন্স তো আমার কাছে নেই। আপনার কলকাতা তো পুলিশের রাজত্ব। হাতে-নাতে ধরা পড়ে শেষে যদি হিতে-বিপরীত হয় ! তাই ঠিক করি—না, আপনাকেই গোসাবা নিয়ে যাবো। আপনিই পাশ সঙ্গে নিয়ে বন্দুকটা নিয়ে আসবেন। মা-ও খুব খুশি হবেন। তাই আপনাকে নিতে এসেছি।

—পাশ আমার কাছে এখনও আছে নাকি ! থাকলেও সে পাশ তো পাকিস্তান সরকারের। বড়দলের নদীপথে শুতোখালির কথা তো জানোই। রাতের গোনে ওখানে ডাকাতি হবেই হবে। সেই অজুহাতে আর আশাশুনি থানার দারোগার দয়ায় সদর খুলনা থেকে বন্দুকের এই পাশ পাই। সে-পাশ কি এখানে চলবে ? উল্টে ঝামেলায় পড়তে হবে। বন্দুকটা প্রথমেই জমা দিতে হবে। দিতে গেলেই এখানকার পুলিশ কতো কৈফিয়ৎ চাইবে তার ঠিক নেই ! কেন এতো দেরি হলো ? কে এতোদিন ব্যবহার করেছে, ইত্যাদি। জবাবদিহি করার অন্ত থাকবে না। এ তো আর আশাশুনির দারোগা নয়। কতো যে মুশকিলে পড়তে হবে—কতো যে টাকা-পয়সা লাগবে তারও হিসেব নেই। কাজেই···না, না। আমি বন্দুক চাই না। তাছাড়া কলকাতায় আমি বন্দুক দিয়ে করবোই বা কি ? না, না,···ও-বন্দুক তুমি তোমার করেই রেখে দাও, আমাকে ঝামেলায় ফেলো না। বুঝলে ! কলকাতায় কি বাদা আছে, বিপদে কোথায় গিয়ে রক্ষা পাবো ? না, না, তুমিই রেখে দাও।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বাউলে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে ঝুলন্ত আলোটার দিকে। সবুর পাশেই ছিলো ; সব কথা নিবিষ্ট মনে শুনছিলো আর বিক্ষিপ্ত হয়ে মনে মনে ছট্‌ফট্

করছিলো, কেন বাউলেদা রাজি হচ্ছে না, একবার যদি আমার দিকে তাকাতো......

বাউলে অবশেষে আস্তে আস্তে বলে,—তা আমি মা-কে কি বুঝ দেবো !...তাই-ই যদি চান তাহলে মা-কে একটা চিরকুট লিখে দিন। তাতে যদি মা-কে শান্ত করতে পারি।...তাই করুন।

সবুর আনন্দে মেতে ওঠে। সশব্দে উল্লাস করতে বাধে। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে বাউলেদার হাতখানা জোরে চেপে ধরেছে।

মা-কে লেখা বিলাসবাবুর একখানা চিরকুট নিয়ে সে-রাতে ভারি খুশিমনে দুজনে ডিঙিতে ফিরে আসে। পরদিন আর এতোটুকুও দেরি করতে চায় না। হাড়োয়া গাঙে যাতে ভাটির টানে পড়তে পারে দুপুরের মধ্যে রওনা হতে চায়। কেষ্টপুর খালে তেমন ভাটির টান তো মিলবে না। তাই সকাল সকাল ডিঙি ভাসান দিতে হবে।

যাবার আগে শ্যামবাজার থেকে এটা-ওটা কিনবার পর সবুর মিনতি করে,—তা বাউলেদা, দিদির জন্য একটা কিছু নেবে না ?

—ঠিক বলেছিস, সবুর ! নোড়া, দিদির জন্য তুই কি নিবি বল্ ?

—আমি কাল সারারাত ধরে ভেবেছি : দিদির জন্য লাল চক্চকে কিছু টিপ নিয়ে যাব। ভারি ভাল লাগবে দিদিকে। চওড়া কপাল তো, টিপ না হলে ওর মন খচ্খচ্ করে। তা যা হয় কেনা যাবে ; কিন্তু বাউলেদা, তুমি কিচ্ছু নেবে না ? একটা কিছু !

—আরে মা-র জন্য একখানা সাদা তবন,কিনতেই তফিল তো প্রায় শূন্য। কি কিনি বল তো ?

মুখটা চিন্তা ভারাক্রান্ত করে সবুর বলে,—আমি অনেক ভেবেছি, কিছুই ঠিক করতে পেরে উঠিনি। তা বাউলেদা, তুমি এক কাজ করো না ! তোমার কাছ অনেক গান দিদি তার গলায় ধরে নিয়েছে। মাঝে মধ্যে ফস্কাগজে তার দু-একটা লিখেও রাখে। তুমি এক কাজ করতে পারো, বেশ ভালো একখানা বাঁধাই খাতা ওর জন্য নিতে পারো। সে-খাতায় দিদি তোমার সব গান তুলে রাখবে। সব গান।

—ঠিক, ঠিক বলেছিস—এ কথাগুলো বলতেই বাউলের মুখেও যেন রক্তের আভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাঙলা দেশের সংসারে দশ-এগারো বছরের ভাইরা এক অসাধ্য সাধন করে চলেছে কতো যুগ-যুগ ধরে তা বলার নয়। হয়তো বা সর্বদেশেই, ধনী-গরিব বা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। ঘটক বৃত্তি অবশ্য এ দেশে খুব পুরোনো প্রথা। তারা আর কতোটা যুবক-যুবতী মিলনের পথ করে দিয়েছে ; যাও বা করেছে তাও পুঁথি, পঞ্জিকা আর ঠিকুজীর জোরে। কিন্তু এ দেশের দশ-এগারো বছরের ভাইরা কোনো পরিকল্পনা মতো যে এ-কাজ করে তা নয়। যেন তাদের হৃদয়ের তাড়নায় অতি সহজ ও সরল পথে দিদিদের মনের মতো মানুষকে কাছে টেনে নেয়। কোনও যুক্তি দিয়ে নয়, কোনও বিচার দিয়েও নয়—কেমন করে যেন ওরা বুঝে ফেলে কে কার মনের মতো মানুষ।

সাত

পাউরুটির সঙ্গে গুড় ও কলা মেখে কোনমতো গবগব্ খেয়ে নিয়ে ওরা এবার বাড়িমুখো। কলকাতায় এসেছিল আধুনিক জীবনের তীর্থ দেখতে, শহর-জীবনের চাঞ্চল্যময় লীলাক্ষেত্রের স্পর্শ পেতে। কতোটা কি দেখলো বা কতোটা কি বুঝলো—তা ভাবার এখন

সময় নেই। আপাতত বেলা গড়াবার আগেই হাড়োয়া গাঙের ভাটির টানে পড়তে হবে।

বাদার মানুষের চলাচল নদী ও খালের স্রোত ধরে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ওদের জীবন চালিত হয় না। হয় জোয়ার-ভাটার তালে তালে। সে তাল ওরা কেটে দিতে চায় না, কখনও না। আর পারেও না সে-তাল কেটে বেতালে চলতে।

আপ্রাণ বোঠের খোঁচায় ওরা এসে পড়ে প্রায় সময় মতো। এই টানেই ওরা পৌঁছে যাবে ন্যাজাটে। এবার ওদের বিশ্রাম—মাত্র হাল ধরে থাকলেই হবে। বাউলে সবুরকে বলে,—তুই শুধু এবার হালটা ধরে থাক। কোনও কিছু বাইতে হবে না। আমি এখন গোছল সেরে ভাতটা করে নেবো। দেখিস যদি কোনও মাছের ডিঙি ন্যাজাট-মুখো আসে তাহলে ভাল দেখে মাছ নিতে হবে।—আজ বাউলে দিলদার মনে। পেলে বেশ বড় দেখেই মাছ কিনে ফেলবে।

দুজনেই গোছল সেরে যা রান্নার তা রেঁধে ফেলেছে। কিন্তু এখন খেয়ে নিতে চায় না। ন্যাজাটে পৌঁছে তো ভাটির অপেক্ষা করতেই হবে। আজ ষষ্ঠি, আবার ভাটির টান ধরবে রাত ন'টা নাগাদ। সে-ভাটিতে যাবে না। রাতে অতোটা পথ ঠেঙিয়ে যেতে চায় না। গরিবের দেশ, কলকাতা থেকে মালপত্র নিয়ে আসছে মনে করে লুঠপাট করতে পারে। কি আর নেবে! তবুও ভুল করে চড়াও হতে পারে। তাই মনস্থ করেছে, ন্যাজাটেই রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে আর পরদিন সকালের ভাটি ধরবে। রাত্রে ন্যাজাটে কাটবে ভালো। চারিদিকে বড় বড় ফিসারির অপিস আর আলোয় আলো। অনেক রাত অবধি লোকে গম্‌গম্ করে। তাছাড়া আজ আবার ন্যাজাটের হাট।

বাউলে হরচি আর টিপালি নিয়ে আরামে জাল বুনতে বসলো। সুতোর জাল বুনবে কি! তার মনের জালও বুনে চলে। আনন্দে ভাবে, এবার বন্দুকটা তো আমার, বন্দুকটা দুনো কথা বলবে। কেমন করে বাঘে মানুষ খায় দেখে নেবে। আমাদের কারো গায়ে যদি নখের আঁচড় বসায়, তবে তার গায়ের চামড়া খুলে নেবো। না, তাই বলে হঠকারিতা করবো না। বনবিবির জীবের সঙ্গে কোনো হঠকারিতা করতে নেই। যে করেছে সে মরবেই।

সবুর চুপচাপ থাকতে পারে না বেশিক্ষণ। বাউলেদাকে গান গাইবার তাগিদ দেয়। বাউলেও পরপর কয়েকটা গান করে। সবুরও ছাড়ার পাত্র নয়। দুটি গান পরপর কয়েকবার গাইয়ে নিলো। কথাগুলি যেমন মুখস্থ করে নিতে চায়, তেমনি সুরটাও নিজের গলায় তুলে নিতে চায়। বাউলের গানের ব্যাপারে কোনও ঢিলেমি নেই।

সন্ধ্যার দিকে দূর থেকে ন্যাজাটের আলো দেখা যায়। পরপর কতকগুলি ফিসারির হ্যাজাক বাতিগুলো যেন আকাশ আলোকিত করে রেখেছে। কিছুটা নিকটে এলে হাটুরে দোকানিদের কেরোসিনের টেমিগুলি যেন দীপালীর আলোর সারি মনে হবে। আসা-যাওয়ার নৌকো, পানসি ও ডিঙির ভিড়ের মধ্যে ডাইনে-বায়ে ঠেলাঠেলি করে ভাটির চরে রাতের মতো বাউলে লগি পুঁতে দিলো। লগির বাঁধন বেশ ঢিলে করে রাখে। তা না হলে জোয়ারের জল ফুলতে থাকলে দড়ি আটকে ডিঙি জলের তলে যেতে পারে। জোয়ারের হিসেব করেও ঠিকমতো জায়গায় লগি পুঁততে হবে। কেননা, এটা ত্রিমোহানা। বিদ্যাধরী দিয়ে জোয়ারের জল এসে প্রবলভাবে দুদিকে ছুটবে। একটা ধারা যাবে পশ্চিমে কলকাতামুখো মালঞ্চ নদী ধরে। অন্যধারা যাবে পুবে হাসনাবাদমুখো বেতনী নদীর খাড়ি দিয়ে। জোয়ারের স্রোতের টান পুবে না পশ্চিমে সেই বুঝে ডিঙির লগি পুঁততে হবে,—বেশ শক্ত করেই পুঁততে হবে।

বেতনী নদীর খাড়িকে আজ হয়তো অনেকে উপেক্ষা করে, কিন্তু এই সেদিনও

বাঙলাদেশ ভাগ হবার আগে এই খাড়ি গম্‌গম্‌ করতো। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বরিশালের মালবোঝাই নৌকো এই খাড়ি পথেই কলকাতার সোজাপথ তখন ধরতো। সেদিন ন্যাজাট ত্রিমোহানার সোরগোল ছিলো রমরমা—দক্ষিণ থেকে বিদ্যাধরী এনে ঢেলে দিতো সুন্দরবনের সম্ভার, আর পুব থেকে বেতনী আনতো গোটা পূর্ববঙ্গের অঢেল সম্পদ।

এখন কিন্তু এই ত্রিমোহানার বড় আকর্ষণ হলো বড় বড় ফিসারিগুলি আর কিছু ধানচালের কারবার। আর তার চেয়েও বেশি আড়ম্বর দেখা দিয়েছে বোধহয় কলকাতার পণ্য সম্ভারে। কতো কিছু যে পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই। মনে হয় এদের আর কলকাতায় না গেলেও চলে।

পরদিন ভোরে উঠে দ্যাখে পিঠেমবাতাস দিয়েছে। কালবিলম্ব না করে শেষ জোয়ারের মরা টান উপেক্ষা করেই পাল তুলে যাত্রা করে। যাত্রা করে সোজা দক্ষিণে। সেই টানে-টানেই ভাটি শুরু হতে না হতে সন্দেশখালি। ডিঙি ভিড়িয়ে কোনমতে কিছু পান-তামাক আর চিড়ে-বাতাসা কিনে আবার ভাটির টানে পড়ে। সাই-সাই করে ওদের পানসী ছুটেছে। স্রোতের টান, পালের টান, ওদের বোঠের টান আর সেই সঙ্গে ওদের মনের টান। লঞ্চও বুঝি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবে না। ধামাখালি ছাড়িয়ে তুষখালির রামপুর হাট। নাম-করা হাট, আর তুষখালি অনেক ফিসারিও আছে। তারপব একে একে গাববেড়ে, চুনোখালি, ঝাউখালি, কচুখালি, বেলতলী—এতোগুলো হাট পেরিয়ে যায়। সারাপথ সবুর দিদির কথা ভাবে। ভাবে, কি খুশিই না জানি হবে লাল টিপ আর বাউলেদার দেওয়া গানের খাতা পেয়ে! মাঝে একবার মনে পড়ে নেতাজীর ছুটন্ত ঘোড়ার বলশালী পায়ের গোছাগুলি। ওরাও বুঝি অমনি দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে বোঠের খোঁচা মারে।

বাউলেও চুপচাপ। কোনোমতে হালের চাপে কাৎ হয়ে দুরন্ত পিঠেম বাতাসের হঠাৎ আসা ধাক্কার পর ধাক্কা সামলাচ্ছে। কিন্তু সব পরিশ্রমই ওর কাছে হালকা হয়ে আসে মায়ের কথা মনে করে। কি আহ্লাদিত হবে না যে মা।...বন্দুকটা আজ থেকে তারই! হ্যাঁ তারই। যক্ষের ধনের রক্ষক তো আছেই।...বাতাস বাদামে চাড় দিয়েছে, ওর হালও চড়চড় করে ওঠে। মাধুরীর কথাও মনে ঝিলিক দ্যায়। ...ভারি মিষ্টি মেয়েটি। কি গান না ও ভালবাসে! দূরে এসে গেছে রাঙাবেলিয়া। বাউলেও ক্লান্ত গলায় গানের পদ গেয়ে ওঠে,—'ও বিদেশী বন্ধু—'

সবুর আর থাকতে পারে না, হু হু বাতাসে চিৎকার করে ওঠে ;—বাউলেদা, ও বাউলেদা, চলো এবার সাতজেলিয়া হয়ে যাই। চলো না আমাদের বাড়ি হয়েই। একই ভাটির টানে গোমর নদী ঘুরে তুমি না হয় বাড়ি যেও।

বাউলের গান থেমে গেছে। বলে,—ধ্যুৎ, তাই হয় নাকি! আগে মায়ের কাছে যেতে হয়। তুই চল্‌ গোসাবায়। মা-র সঙ্গে দেখা করে তারপর তুই হাঁটাপথে সাতজেলিয়া যাস্‌। আমি না হয় তখন তোর সঙ্গে যাবো। বলেই গলায় খাঁকার দিয়ে আবার গানটা ধরে।

সবুর খানিকটা মন-মরা হয়ে বলে,—করো, যা ভালো বোঝো।

আট

বন্দুকের একটা নিষ্পত্তি হবাব পর থেকেই মায়েরও যেমন মনটা হালকা হয়ে উঠেছে, বাউলের মনটাও তেমনি উৎফুল্ল। এতো উৎফুল্ল যে বন্দুকটা একবার দেখে না আসা পর্যন্ত

স্থির হয়ে থাকতে পারে না। বন্দুকটা এতোদিন ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে যেন আপন সন্তানের প্রতি মমতা পেয়ে বসেছে। শুধুই কি নাড়াচাড়া করেছে? কতো আপদে-বিপদে, কতো দুর্ধর্ষ কাজে-অকাজে, কতো জীবন-মরণ সমস্যায়—এই বন্দুকই ওর ফেলে-আসা দিনগুলিতে হয়ে আছে এক পরম বিশ্বস্ত সাথী ও সহচর! বড়দলের দোকানে নদীর মৃদু হাওয়ার দোলায়িত বন্দুকের ছবি ভাবতে ভাবতে আনমনে এই মারণ অস্ত্রটির গায়ে অসীম মমতায় হাত বোলায়। তখন আর মারণ অস্ত্র নয়, মনে হবে বাউলের বুঝি জীবনসঙ্গিনী। তাই ইতিমধ্যে একবার বাদায় ছুটে গিয়ে তার যত্ন-আত্তি করে এসেছে। এই বন্দুক আজ তার নিজের, একান্তভাবে নিজের।

মনটা হালকা হয়ে ওঠার পর বাউলে এখন গান-বাজনায় মেতে উঠেছে। গোসাবা যেন কেমনভাবে লোকের মনকে আনন্দ ও উৎসবে মাতিয়ে তোলে। দুর্দান্ত হিংস্র বনের কোলে বড় বড় গাছের পাতার মর্মর শব্দ আর ছোটো-বড় নদীর কুলকুল ধ্বনি, সেই সঙ্গে নদীর স্রোতের ঢেউ ও বাতাসের দোলায়িত তরঙ্গ যেন আপনা থেকে মানুষের মনে সুরের ঝঙ্কার আনে। ঝঙ্কার আনে বলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পদধূলিতে এক সময়ে ধন্য হবার সুযোগ পেয়েছিলো এই গোসাবা। কবির আসা থেকে এই অঞ্চলে গোসাবা হয়ে উঠেছে যেন এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গান, বাজনা, নাটক, যাত্রা, কতোকথা, কবির তর্জা, মায় সিনেমাও—একটা না একটা লেগেই থাকে, বিশেষ করে পুজোর সময়। বর্তমান গোসাবার প্রাণস্বরূপ ডাক্তারবাবুর এ বিষয়ে উৎসাহের সীমা নেই।

ডাক্তারবাবু একদিন বেদে বাউলেকে ডেকে বললেন,—বুঝলে! এবার একটা নাটক মানে থিয়েটার করা যাক্। কি বলো, নাটক জমবে না?

মাথা চুলকিয়ে বাউলে বলে,—ভালো একটা দল আনলে না-জমার কি আছে? নিশ্চয় জমবে?

—আরে, সে কথা নয়। বাইরের দলটল নয়। এবার এসো আমরা নিজেরা, গোসাবার লোকজন নিজেরা একটা থিয়েটার করি। ধরো, তুমি থাকবে, আমি থাকবো, আর ভালভাবে বাছাই করে কিছু লোকজন নিয়ে!

—না, ডাক্তারবাবু, আমি পাট করতে পারবো না। বলেন তো কিছু গান-টান করতে পাবি। পাট আমি কিছু করতে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ও-কাজ আমার দ্বারা হবে না।

—আরে, কলকাতা থেকে মেক-আপ করার লোক আনবো। তারা এমন মেক-আপ করবে, তোমাকে কেউ চিনতেই পারবে না। জানো, কোন্ থিয়েটার করছি? এবার 'বর্গী এলো দেশে' পালা। তোমাকে করতে হবে ভাস্কর পণ্ডিতের পাট। তোমার ভালো গোঁফদাড়ি আছে—খুব ভালো মানাবে।

—ভালো গোঁফদাড়ি থাকলে কি হবে! বাঘের সামনে আমার হাঁটু কাঁপে না, কিন্তু পাটের কথা বলাতে আমার হাঁটু এখনই কাঁপছে। ডাক্তারবাবু! পাট ভুলেই যাবো। কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে, ডাক্তারবাবু! তখন কি বলতে গিয়ে কি বলে বসবো—না হয়, স্টেজ থেকে সরে পড়বো। না, অমন প্রস্তাব করবেন না, ডাক্তারবাবু!

—আরে, না, না! ও বিষয়ে তোমার ভাবতে হবে না। কলকাতা থেকে প্রম্পটার আনার ব্যবস্থা করছি। দেখবে, তুমি গড়গড় করে বলে যাবে। কাল সন্ধ্যের গোনে আসবে—সব আলোচনা হবে। আসবে কিন্তু।

সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। 'বর্গী এলো দেশে'-ই হবে। বাউলে যেন কেমন গম্ভীর হয়ে

গেছে। মনে মনে পার্ট মুখস্থ করে আর রাতদিন ভাবতে থাকে—কোনটা জোরে, কোনটা আস্তে বলবে ; অঙ্গভঙ্গি বা কেমন হবে। ভাবার অন্ত নেই, কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর—আমার হাত-পা না কেঁপে যায়, আমার গলা না শুকিয়ে যায় !

কলকাতা থেকে প্রম্পটার ও পেইন্টার এসেছে। তারা তো বাউলের কপালে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র লাঞ্ছন, প্রশস্ত বুকে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, তেজী গোঁফদাড়ি আর লম্বা বাবরি দেখে তো অবাক,—শুধু অবাক নয়, মোহিতও বটে। বলে,—হ্যাঁ, তোমাকেই মানাবে 'ভাস্কর পণ্ডিত'।

চুপিচুপি বাউলে ওদের বলে,—তা নয় হলো ! কিন্তু এখন থেকেই ভয়ে মরছি, আমার হাঁটু না কেঁপে যায়, পার্ট না ভুলে বসি !! কোনও দিন পার্ট-টার্ট করিনি তো।

ওরা দুজনেই হেসে ফেললো। সে হাসিতে বেদে ভাবে, না জানি সে কতখানি ছেলেমানষেমি করছে ! প্রম্পটার বললো,—বাউলে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তুমি তো এখন থেকে আর বেদে বাউলে নও, তুমি ভাস্কর পণ্ডিত। সেই দুর্দান্ত, সেই উন্মত্ত, দুঃসাহসী ভাস্কর। তোমার কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি সে-রকমই হবে। তোমার সামনে যে অসংখ্য লোক বসে থাকে—ওরা আর কেউ নয়, ওরা দেখতে চায় কতোটা দাপটি তুমি করতে পারো। কেন, তুমি না বাঘের শিকারী, বাঘের সামনে তুমি দাপটি করো না ? ভাস্কর পণ্ডিত বাঙলাদেশে এসে সেই দাপটি করে গেছে। পারবে না সেই দাপটি দেখাতে স্টেজের ওপর ? চলো বাউলে, তারই জন্য আমরা তৈরি হই ! তুমি এখন থেকে আর 'বেদে বাউলে' নও—তুমি ভাস্কর পণ্ডিত। চলো ভাস্কর পণ্ডিত, আমরা তৈরি হই।

এই দীর্ঘ উপদেশে বেদে বাউলে চমৎকৃত হয়ে যায়। সত্যই তো ওরা ঠিকই বলেছে। ওর মনে গান এসে যায়। না, গান চেপে গেল। হাঁটুর ওপর এক বলিষ্ঠ থাপ্পড় মেরে উঠে পড়ে চন্‌মন্‌ করে।

পরদিন সাজঘরে বাউলেকে পেইন্ট করাচ্ছে। সমস্ত দাড়িগোঁফটা কাচা-পাকা করে দিয়েছে। দীর্ঘ কপালে মারাঠি পণ্ডিতের রক্ততিলক এঁকে দিয়েছে। বাহুতে কঙ্কন। গলায় মেকি মুক্তোর মালা। ঠাসা রঙে ওকে সাদা ধবধবে করে দিয়েছে। মাথায় রক্ত রঙের ফেটা। বাবরি ও ভ্রূ-ও আধাপাকা। দাড়ি-ও দুভাগ করে টানা কান পর্যন্ত পাকিয়ে দিয়েছে। ভারিক্কি গলায় পার্ট বলার জন্য বারবার মহড়া দিয়েও নিয়েছে।

—দেখে নাও এবার, এই আয়নার সামনে। তুমি বেদে, না ভাস্কর পণ্ডিত ?—বলেই পেইন্টার একটু পাশ নিয়েছে !

বাউলে আয়নায় নিজেকে যেন নিজেই চিনতে পেরে ওঠে না ! আমি কি বেহুঁস্ হয়ে গেছি ? বনের গহনে গাছের ডালে বসে এমন অবস্থা হলে যা করে তাই করলো—নিজের গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখে নিলো সে ব্যথা পায় কি না, সে সত্যি বেদে কি না ! জিব বের করে সে নিশ্চিত হয়ে নিলো—আয়নার ছবিও জিব কেটেছে কি না ?

পাড়ার ছেলেপুলেরা সাজঘরের এক কোণ থেকে উঁকি মারছিলো। সেদিকটা আড়াল করে ঘুরে ভাস্কর পণ্ডিত বসে রইলো। ভাবতে থাকে, সামনেই মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা মাথায় রক্তাভ ফেটির পেখম উড়িয়ে ঝক্‌ঝকে বল্লম উঁচিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কিছু শব্দ হলেই ভাবে, এই শব্দ আর কিছু নয়, ঐ সৈন্যদলের ঘোড়ার খুরের দাপটির শব্দ। ঘাড় বেঁকিয়ে বড়বড় চোখে চাহনি দেয় যেন গোটা অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে। এদেরই তো আমার আদেশ দিতে হবে !!

একবার ওর মনে ঝিলিক আসে,—মাধুরীও ওকে আজ চিনতে পারবে না !

প্রথমেই রণবাদ্যের ব্যাণ্ড বাজনা। বাজনা থামতেই ছিল মাধুরীব একটা গান—'ঘুমপাড়ানি গান :

মনি 'ঘুমলো, পাড়া জুড়ালো,
বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেলো
খাজনা দেবো কিসে॥
ধান ফুরালো, পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি ?
আর কটাদিন দেরি করো
রসুন বুনেছি॥'

গান শেষ হতেই প্রম্পটারের ইঙ্গিত এলো ভাস্কর পণ্ডিতের অনুপ্রবেশের জন্য :

ভাস্কর এখন সবার সামনে। সবাই জানে, কানেকানে সবাই জানতো, বেদেই ভাস্কর পণ্ডিত হবে। তাহলেও সহসা কেউ চিনতে পারে না, ভাবে—হয়তো প্রম্পটারদের সঙ্গে কলকাতা থেকে কোনো ওস্তাদ এসে পাট করছে। কী তার বীরদর্পমণ্ডিত পদচারণ স্টেজের ওপর। এক-একটা ঝাঁকি মেরে যখন নাভিদেশ থেকে গুরুগম্ভীর আওয়াজে শব্দগুলি ছুঁড়ে মারে, তখন গোটা স্টেজটাই কেঁপে ওঠে : ভাস্কব পণ্ডিত তো বল্লমধারী দীর্ঘ মাবাঠী অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে কথা বলছে, তাদের সবাইকে তো উদ্বুদ্ধ করতে হবে !

সবাই তো একসময়ে চোখ বড়ো করে থ মেরে শুনছে— 'পেশোয়া বলেছেন মহারাষ্ট্র মারাঠাদেব জন্য...রাজস্থান রাজপুতদের জন্য...পাঞ্জাব পাঞ্জাবীদের জন্য...কিন্তু বাংলা সবার জন্য। এই মধুচক্রের সবটুকু আমি শোষণ করে নিয়ে যাবো পেশোয়ার জন্য। আজ নিয়ে যাবো চৌথ, আজ দাবী করবো রাজ্যের অর্ধাংশ।.. দেবে না আলিবর্দি খাঁ ??...তাহলে তাঁকে বাঙলার মসনদ থেকে টেনে এনে ভাগীরথীব জলে ডুবিয়ে মারবো ! আমি ভুলিনি সরফরাজ খাঁ র যুদ্ধে বন্ধু বিজয় সিংহের শোচনীয় মৃত্যু'

অপূর্ব ভঙ্গিমায় দৃঢ় বাক্য উচ্চারণে যখন দুবাহু তুলে কাল্পনিক উচ্চ সিংহাসন থেকে টেনে এনে দক্ষিণ দিকে ভাগীরথীর সাগর সঙ্গমের পানে সবলে ছুঁড়ে মারলো, তখন দর্শকেরা মোহিত হয়ে বসা থেকে হাঁটুর উপর উঁচু হয়ে পড়েছে আর ভাস্কর পণ্ডিতও যেন বাহুদ্বয়ের ঝুলে সাগর-সঙ্গমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে করতালি আর থামতে চায় না। জমাটি থিয়েটারে ডাক্তারবাবু আহ্লাদিত। বেদে এই ফাঁকে দর্শকের মধ্যে একবার কটাক্ষ করে দেখে নেয় মাধুরী ও সবুরকে। সামনেই বসেছিল ওরা—দুজনেই উদ্বেলিত ও মোহিত। হাততালির শব্দে চমক্ ভেঙে ওরাও প্রাণপণে হাততালি দিতে থাকে।

রীতিনীতি ভেঙে ডাক্তারবাবু তো স্টেজের উপর উঠে বেদের গলায় একটি রূপোর মেডেল পরিয়ে দেন। এই ব্যবস্থা তিনি কাউকে না জানিয়ে করে রাখেন। স্থির ছিলো, থিয়েটার শেষ হলে শ্রেষ্ঠ চরিত্রকে মেডেল দেওয়া হবে। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতের পাটে এমনই মুগ্ধ যে তিনি আর দেরি করতে পারেন না। মাঝপথে স্টেজে এসে সাদরে মেডেল পরিয়ে দিলেন ভাস্কর পণ্ডিতের কণ্ঠে।

থিয়েটার ভাঙতে বেশ দেরি হয়। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর পণ্ডিতকে সমাদর করতেই সবাই ভিড় করে আসতে থাকে। কিছু না ভেবেই ভাস্কর পণ্ডিতের সাজেই বেদে

স্টেজের নিচে নেমে আসে। মাধুরী ও সবুর তো কাছে ঘেঁষতে পাত্তাই পায় না। ওদের দেখতে পেয়ে বেদেই লোকজন ঠেলেঠুলে এগিয়ে আসে।

কাছে এলেই মাধুরী বলে,—না বাউলেদা তোমাকে আর 'বাউলেদা' বলবো না, তুমি 'ভাস্করদা' এখন থেকে।

সে-কথায় কান না দিয়ে বেদে মেডেলটা গলা নিচু করে ওদের দেখায়। দেখাতে দেখাতে বলে,—এত রাত্রে সাতজেলিয়া যাবে কি করে তোমরা?

—সে-ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। বাবা-মা দুজনেই এসেছেন।

—তাই নাকি? চলো, চলো, তাদের সঙ্গে একবার দেখা করি। বলেই ওদের দুজনকে দুহাতে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললো,—জানিস্ সবুর: পাট বলবো কি, তোর দিদির গান শুনতে শুনতে আমার ঘুম এসেই গিয়েছিলো। বলেই বাউলে তার ধরে যাওয়া গলায় গান গেয়ে উঠলো—'মনি ঘুমোলো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে...'

মাধুরী তখন বেদের হাতে ঝাঁকা মেরে শুধু বললো,—য্যাও !!

সে বছরে আনন্দ ও উৎসবের সমাপ্তিকে মধুরেণ সমাপয়েতের আয়োজন করেন ডাক্তারবাবু। সকল উদ্যোক্তাদের মিষ্টি খাওয়ালেন পরদিন। এই আমন্ত্রণে কেউই বাদ যায়নি। মায় মাধুরী ও সবুরও বাদ যায়নি।

গোসাবা যেন তার পুরনো সাংস্কৃতিক সত্তা ফিরে পায় এ-বছর। ফিরে পায় বটে, কিন্তু একটা সামান্য চিড় ধরা দেয় এই সামগ্রিক জীবনে।

প্রথম প্রথম এটা একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত বলে অনুমিত হলেও, কালভদ্রে এটা গোসাবার পরাভবের সূত্রপাত রূপে দেখা দেয়।

নয়

কিশোর যে কখন যুবক হয়ে ওঠে, বোঝা দায়। এই উত্তরণ তো দিনক্ষণ দেখে বা বয়স মেপে হয় না! অথচ এই সন্ধিক্ষণ আসবেই, এবং আসবে জলোচ্ছ্বাসের মতো উত্তাল হয়ে। সবুরের জীবনে সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। গভীব স্নেহ করেই বোলে বাউলের নজর তা এড়ায় না। বাউলে যেমন সুন্দরবন নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে সবুরকেও তেমনি সুন্দরবন-পাগলা করে তুলতে চায় তার জীবনের এই সন্ধিক্ষণ থেকেই। ডেকে বলে,—কী রে সবুর, নবমীর মাংস খেতে চাস্ না?

গোসাবায় অন্যবারেব মতো এবারও ধুমধাম করে দুর্গোৎসব চলেছে। আজ সপ্তমী। সন্ধ্যায় আজ জলসা। মৌজার লোকেরাই সবাই মিলে এই জলসার আয়োজন করেছে। বাউলে তার প্রধান উদ্যোক্তা, আর সঙ্গে আছে সবুর ও তার দিদি মাধুরী। কাজেই সপ্তমীর দিন মাঝ-রাত অবধি ওদের নড়চড় করার অবকাশ নেই। অষ্টমীর দিন যাত্রা। যাত্রা হলে তো সবুর পাগল, সারা রাত জেগে যাত্রা শুনবে। ফলে বাউলে নবমীর মাংস খাবার লোভ দেখালো।

মাংসটা ছুতো মাত্র। আসলে, সবুর এখন যুবক হয়ে উঠেছে তো, তাই তাকে সুন্দরবনের ব্যাপারে সড়গড় করে তুলতে চায় বাউলে। বাদার যুবক সুন্দরবনের সঙ্গে লড়াই করবে না, সুন্দরবনের আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে উঠবে না, তাও হয় নাকি?

বাউলে বলে,—বুঝলি সবুর, ভোরের সুজনে বাদায় যাব, আবার দুপুরের সুজনে ফিরে

আসতেই হবে। তা না হলে নবমীর মাংস খাবি কী করে? ভাটি ও জো'র টান ঠিকমতো পড়েছে। এমন সুযোগে ভাল যোগাযোগ না হয়ে যায় না।

একটু থেমে আবারও জানালো,—ভোররাত্রিতে আমার বন্দুকটা এনে ঠিকঠাক করে রাখবো। তুই ঠিকই আসবি কিন্তু।

দুজনে মিলে ছোট্ট একখানা ডিঙি করে এসে গেছে নবমীর ভোর সকালে পিরখালির বনে। বনের এই দ্বীপটি তেতুলবেড়ে খালের উত্তরে। কেউ কেউ এই চককে বলে 'বত্রিশ একর বন'। নাবি বন। নতুন ভেসে ওঠা দ্বীপে তৈরি হয়েছে এই বন।

গোটা সুন্দরবনটাই যেন দ্বীপময় এক আশ্চর্য জগৎ। নদীর মোহনায় বা তেমাথায়, বা চৌমাথায় পলি পড়ে পড়ে প্রথমে ছোট একটা দ্বীপ দেখা দেয়। গঙ্গার ভূমি-গঠন-ক্ষমতা অপরিসীম। পৃথিবীতে এমন পলি-বহনকারী নদী দুর্লভ। হিমালয়ের বা হিমালয়ের পাদদেশের পলিকণা বহন করে উজাড় করে ঢেলে দেয় অববাহিকা অঞ্চলে। যেন মাতৃস্নেহে প্রলেপের পর প্রলেপ দিয়ে পলিমাটির দ্বীপ সৃষ্টি করে চলেছে আবহমান কাল ধরে। দ্বীপ দেখা দিতেই আসে পাখির দল, তারপর আসে গাছপালা। গাছপালা বলিষ্ঠ হতে না হতে আসে সুন্দরবনের হিংস্র-অহিংস্র প্রাণীরা। আসে বানর, আসে হরিণ, আসে সাপ, আসে শুয়োর, আসে বাঘ। আর সর্বশেষে আসে মানুষ, নানা সুযোগের সন্ধানে। এমনিভাবেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সমস্ত হিংস্রতা ও মমতা নিয়েই এক-একটা দ্বীপ সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোজিত হয়।

এই 'বত্রিশ একর বনে'ই আজ এসেছে বেদে বাউলে। পরনে তার ধুতি, গোটো করে পরা, গায়ে ফতুয়া, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে হাল্কা কালো দাড়ি, বাবরি চুল, দীর্ঘ কপালে, বাহুতে ও বুকে রক্ত-রাঙা চন্দনের বড় বড় তিলক, আর হাতে তার বন্দুক। সঙ্গে একমাত্র সহচর সবুর। পরনে তার হাফ্-প্যান্ট, গায়ে কামিজ আর চোখে সুন্দরবনকে চিনবার উদগ্র বাসনা।

খবর এসেছিল, এই বনে কদিন হল অনেক হরিণের পাল দেখা গেছে। কাজেই নবমীর মাংসের জন্য বাউলের স্থান বেছে নিতে দেরি হয়নি। ওদের ডিঙি বড়নদী থেকে পাশ-খালে ঢোকে। বড়নদীর মুখেই মালে উঠবে না। তাহলে অনেকে দূর থেকেই ওদের ডিঙি দেখে ফেলবে। খালের তিন-চারটি ছোট ছোট বাঁক পেরিয়ে ডিঙি পোঁতে। ভাল করেই পোঁতে, যাতে জোয়ার এলে ভাসিয়ে না নিয়ে যায়। মালের গাছের গুঁড়িতে এদেশের লোক কখনও কাছি বাঁধে না।

সব ঠিকঠাক করে পাশ-খাল থেকে একটু দূরে একটা কেওড়া গাছে বসে ওরা। বাউলে বেশ একটু উঁচুতে এক তে-ডালায় সবুরকে বসিয়ে দিয়েছে। বলে,—তোর তো আর গামছা দিয়ে ডালের সঙ্গে নিজেকে বাঁধতে হবে না; তুই যা চালাক আর সাহসী, বলার নয়! আমি থাকতে তোর শঙ্কা পাবার কিছু নেই! না রে!

কিশোর-মনকে পিছনে ফেলে এসেছে সবুর। উত্তরে সে ফিস্ ফিস্ করে বলে,—বাঃ, তে-ডালায় বসে বসে কি সুন্দর দেখতে পাব সব ঝোপঝাড়।

বসতে-না-বসতেই বাউলে হরিণের নকল ডাক ডাকতে থাকে। মেয়ে-হরিণের ডাক দেয়; এতে মদ্দা শিঙেলই প্রলুব্ধ হয়। ডাকটা একই প্রায়, তবে মেয়ে হরিণের ডাকে মোলায়েম ভাব থাকে। নবমীর মাংসের জন্য এসেছে, বহুলোক আপ্যায়ন করতে হবে। মেয়ে-হরিণ মারতেও জাত-শিকারিদের মনে বাধা আছে। একটা বড় শিঙেলের মতো

শিঙেল চাই।

সময় কেটে যায়। বাউলে ভাবে, তাহলে কী হলো ! বেলাও গড়িয়ে গেছে অনেক। কার্তিকের শেষ। সকালের হিমেল ঝিরঝিরে বাতাস আছে ঠিকই, তবে সূর্যও উপরে উঠেছে অনেকখানি তীব্রতা নিয়ে। তা হলে ? হরিণের অতি প্রিয় ধানিঘাসও আছে বেশ খানিকটা, খুব কাছেই, পাশখালির চরে। কেওড়া গাছটার যে-ডাল ভেঙে ভেঙে সে নীচে ফেলেছে বানরের নকল ঝগড়ার কিচিরমিচির-শব্দে, তার পাতাগুলিও কচি ও লোভনীয়। তা হলে ? হরিণের কোনো পাত্তা নেই কেন এখনও ?

বাউলে কেমন যেন হতবাক হয়ে যায়।

এমন সময়ে সহসা এক চোটের আওয়াজ ! খুবই কাছে। বিস্মিত হয়ে বাউলে ভাবে, কিসের এই বন্দুকের চোট। তবে কি শিকারির পেছনে শিকারি ! আমাদেরই লক্ষ করে নয় তো ? আগে ঠাহর করতে হবে কাকে লক্ষ করে ? হঠাৎ আমাদের কিছুই করার নেই। শুধু আড়ালে চুপচাপ থাকা। তবে সবুরকে সাবধান করা দরকার।

আকারে ইঙ্গিতে দু-একটা অস্ফুট ফিস্‌ফিস শব্দে স্ববুরকে বলল,—যেখানে আছিস সেখানেই থাক্। ডালটা এমনি করে শক্ত করে ধরে রাখ্ : একদম নড়াচড়া করবি না, খবরদার না !

তখনও 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' হয়নি। লোকে বনে আসে, দু-একটা হরিণ মারে। সুন্দরবনে বাঘ মারতে আসা বলা বাতুলতা। বনকর অপিসের পেট্রোলবোট বা পিটেলবোট বন পাহারা দেয় বটে, কিন্তু চোরা শিকারীকে ধরে সদরে চালান দেওয়া তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ধরতে পারলে বা ধরার মতো অবস্থা বাগাতে পারলে, কিছু পয়সা, না হয় কিছু মাংসের ভাগ নেওয়া আর কিছু নকল শাসানি ও ধমকানির পালা। কাজ দেখানোর জন্য মাঝে-মধ্যে দু-একজনকে সদরে চালান দিতে হয় অবশ্য।

বাউলের অজানিতে অনেক দূর থেকে, বড় নদীর দূরের বাঁকের মুখ থেকেই পিটেলবোটের বাবু ওদের ডিঙিকে পাশখালিতে ঢুকতে দ্যাখে। পাশখালিকে নজরে রেখে রেখে পিটেলবোট শেষ পর্যন্ত পাশখালির মুখে হাজির। আসতে বেশ সময় লাগে। এখনকার মতো সুন্দরবনে ভট্‌ভটি বা লঞ্চের তখন আমদানি ছিল না। দাঁড় বেয়েই এক বাঁক জল ঠেলতে হয়েছে।

সাদা ধবধবে পিটেলবোট। সুন্দরবনের মানুষরা যেমন, তেমনি বাঘ-বাঘিনীও এদের ঠিক চিনে নেয়। আর এদের পিছু নিতে হলে যে খুব সাবধানী হতে হবে, বাঘেরা তাও জানে। বারবার দেখে বুঝে নিয়েছে, এই সাদা বোটে বন্দুক থাকেই। আর বন্দুক ওরা এমন চেনে যে বলার নয় : সামান্য কাকপাখিরও যেমন হাতের ঢিলকে চিনতে এতটুকু দেরি হয় না, তেমনি মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ী বন্দুকের নলকে চিনতেও বাঘকে বেশি বুদ্ধি খাটাতে হয় না।

কাজেই, নদীর কূল ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে বাঘ অতি সাবধানে পিটেলবোটের পিছু নিয়েছে। বোটের বেশ পিছনে। মাঝে-মাঝে উঁকি মারে, আবার ঘাড়-পিঠ নিচু করে গুটিগুটি এগোয়। পাশখালের মুখে আসতেই বোট প্রায় থেমে গেছে। বাঘও এবার সচকিত।

পাশখালের মুখে পিটেলবাবু দোমনা। ভাবনা, শেষ পর্যন্ত এই সরু খাঁড়িতে বোট আটকে না পড়ে। বোটের গলুই খালের মধ্যে। বোধহয় ঘুরে বড় নদীতে পড়তে চায়। গলুই যে ঘুরতে চায় না। বাবুর আদেশমতো বড় লগি নিয়ে ওদের এক যুবক গলুইতে খোঁচা মারতে গেছে।

সুন্দরবনের বাঘ চলতি নৌকোয় সহসা আক্রমণ করতে চায় না। বাঘের ধোঁকা লাগে, হয়তো গলুই থেমে গেছে। যুবকটি লগির গোড়া কোমরজলে ফেলে খোঁচের চাড় দিয়েছে। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত ; কারও হাত আজোড় নেই। বাঘও এমন সুযোগ হেলায় বা দ্বিধায় হারাতে চায় না। তীর থেকে যুবককে লক্ষ করে চকিতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো ভেবেছিলো, গলুইতে দু-পায়ে ভর দিতে পারবে। কিন্তু অঘটন ঘটে গেছে। লগির খোঁচাতে হয়তো গলুই একটু পাশ নিয়েছে। বাঘ গলুই ছাড়িয়ে নীচে জলে পড়তে চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের টাল সামলাতে তার থাবা যুবকের বাহুতে বিদ্ধ করেছে। হিংস্র ও উদ্যত বক্র নখ পেশীতে সমূলে প্রোথিত। যুবকেরও টাল সামলানো দায়। লগির ঠেলায় কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরে যায়। কিন্তু বিদ্যুৎগতি লাফ আর বিশাল দেহের গুরুভার যাবে কোথায়! সোজা গিয়ে ওপাশে জলে পড়লো বাঘ, আর সেই সঙ্গে তার থাবার বক্র নখ যুবকের বাহুর পেশী ছিন্নভিন্ন করে ছিঁড়ে নিয়ে গেলো।

বোটের লোক সব মারমার করে ততক্ষণে গলুইতে। পিটেলবাবুও টোটাভরা বন্দুক হাতে বোটের কামরা থেকে হন্তদন্ত হয়ে গলুইতে ছুটে এসেছেন।

সকলে দল বেঁধে বেরিয়ে আসার আগেই বাঘ জল-কাদামাটি অগ্রাহ্য করে আবার চটাং করে লাফ দিয়ে মালে উধাও। সুন্দরবনের বাঘের এ এক অদ্ভুত প্রকৃতি। একবার আক্রমণ বিফল হলে, তখন-তখন সে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে না।

দেখতে না-পেলেও বাঘ সরে পড়ার পথ লক্ষ করে বাবু গুলি চালান। কতকটা ভয়ে, কতকটা আসর সরগরম করার জন্য। যুবক ওদিকে গলুইতে এলিয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়। তার বাহু থেকে সমানে রক্ত ঝরছে।

পিটেলবাবুর নির্দেশে ওদের বোট এবার ছুটল হেল্‌থ সেণ্টারে। যদি যুবকটিকে প্রাণে বাঁচানো যায়। ছোট চাম্‌টার খাল ধরতে ওরা এবার দ্রুত ধাবিত।

বাঘের আক্রমণ, হুঙ্কার, বোটের মানুষের হৈ-হল্লা, আর সর্বোপরি চোটের আওয়াজে সবুর যেন প্রাণ হাতে করে তে-ডালার দুটো ডাল নিঃসাড়ে সাপ্‌টে ধরে আছে। বাউলে ভাবে, নবমীর মাংস জোটাতে এসে এ কী ফাঁদে পড়লাম!

এতক্ষণে সব চুপচাপ। যেন শান্ত এই বন। যে শান্ত বন দূর থেকে মানুষকে হাতছানি দিয়ে মোহগ্রস্ত করে। তবু বাউলে বিন্দুমাত্র নড়চড় করে না, উসখুসও করে না। কোনোভাবে কোনো প্রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না এখন। হরিণ পাবার আর কোনো আশা নেই। বন যদি কোনো কারণে একবার তোলপাড় হয়, তবে সে-মুখো হবে না এই নিরীহ জীব। অন্তত সে-দিনের মতো তো নয়ই।

তবুও বাউলে অতি সাবধানীর মতো আরও অপেক্ষা করতে চায়! অপেক্ষা করতে হয় না। সামনের সামান্য ফাঁকা জায়গায় কাদা-জলে ভেজা মূর্তিমান। একেবারে চারহাতপায়ে ঘোড়ার মতো টান্‌টান্ দাঁড়িয়ে। এমন দাঁড়ানো বাঘকে দেখা সুন্দরবনে অতি দুর্লভ ব্যাপার। এ-জীব তো হঠাৎ আক্রমণে চমক লাগাতেই অভ্যস্ত, শত্রুর সামান্যতম ইঙ্গিতে পিঠ ও মাথা নিচু করে পাতা ও আগাছার আড়ালে গুটি মেরে চলাই তো এ-জীবের রণকৌশল। তা না, এ তো ঘোড়ার মতো টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তাও আবার বন্দুকের আওতায়! একবার প্রবল ইচ্ছা হয়, ইঙ্গিতে সবুরকে এ-দৃশ্য দেখে নিতে বলে। না, তৎক্ষণাৎই তা থেকে নিরস্ত হয়। বাউলে বুঝি আর স্থির থাকতে পারে না। অতি সন্তর্পণে বন্দুকের নল ধীরে, অতি ধীরে, ইঞ্চি-ইঞ্চি করে যথাস্থানে এনেছে। কিন্তু এত সাবধানতায়ও শেষরক্ষা হয় না। বাঘের সঙ্গে বাউলের হঠাৎ চোখাচোখি।

আর চোখ ফেরাবার উপায় নেই। কট্‌মট্‌ করে আগুনের মতো দৃষ্টিতে সে-চোখের পরে চোখ রাখতেই হবে। একবার চোখ সরেছে কি রক্ষা নেই। মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে।

হঠাৎ বাউলের টনক নড়ে। নলে তো 'বাক্‌শট', হরিণ মারতেই এতক্ষণ তৈরি ছিল। ফতুয়ার ডান পকেটে এল জি গুলি। বনে উঠলেই এল জি গুলি ও সঙ্গে নেবেই নেবে। বুলেট বাউলের পছন্দ নয়। ধীরে, অতি ধীরে, ডান হাতখানা সে পকেটে দিয়েছে। যতটা সম্ভব আড়ালে-আড়ালে। বন্দুকের নল আর চোখের চাহনি এতটুকু সরায়নি।

এল জি ছাড়া অন্য টোটাও পকেটে ছিল। একবার চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চায়। 'যা থাকে বরাতে' ভেবে, ঘাড় না নামিয়ে, অপাঙ্গে দেখে নিয়েই গুলি ভরে ফেলেছে। পলকের সময় মাত্র। চেয়ে দেখে, বাঘ সেখানে নেই!

নেই, বাঘকে কোথাও সে দেখতে পায় না। সবুরকে ডেকে বলে,—মরদ! আমরা গাছে বলেই ও ব্যাটা আক্রমণ করেনি। কিন্তু ও আছে, ধারেকাছেই আছে। ভাল করে নজর দে।

তবুও ওরা কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না। হঠাৎ বাউলে অনুমান করে, এ জাত বড় চতুর জাত···ও নিশ্চয় কোনো ফাঁকে আমাদের ডিঙি দেখে ফেলেছে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—আরে মরদ! ডিঙির দিকটা দ্যাখ! বলেই সে নিজেও ধীর স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকায়। ভাবে, নিশ্চয় মতলব করেছে, গাছ থেকে নেমে যখন আমরা ডিঙিতে উঠতে যাব, তখনই কাজ সারবে!

তন্নতন্ন করে দেখতে দেখতে হঠাৎ নজরে আসে একটা ছোট কানের মতো। গরান গাছের গুঁড়ির ছাল নয় তো! না, আর দেখতে পায় না। চোখটা একটু মুছে নিয়েও দেখতে পায় না। কয়েক লহমা পরেই আবার গুঁড়িটার ওপাশে ডান দিকে যেন একটা কানের মতো। বাউলের আর অনুমান করতে হয় না। ব্যাটা! গুঁড়ির আড়ালে একবার এ-পাশে, আরেকবার ও-পাশে এক চোখে উঁকি মারছে। গোটা মুখটা কোনো দিকেই বের করছে না।

বাউলে বন্দুকের তাক্‌ সূক্ষ্মভাবে করে আছে। কিন্তু কিছুতেই মাথা বের করছে না। গুলি করলেও করা যায়। লাগলে হয়তো বাঘের মাথার তেল্‌সা পিচ্ছিল হাড়ে আঁচড় লেগে বেরিয়ে যাবে। কোন পথ না পেয়ে বন্দুকের নিরিখ আরও তীক্ষ্ণ করে নিজের জিভ টাকরায় লাগিয়ে জোরে একটা 'ট' শব্দ করে। নিঝুম বনে সেই শব্দও প্রতিধ্বনিত হয়। কী ব্যাপার তা সঠিক বুঝবার জন্য বাঘ এবার পুরো মাথাটা হেলিয়ে দু'চোখ দিয়ে দেখতে গেছে। দেখতে আর হয় না—সঙ্গে সঙ্গে বেদে বাউলের বন্দুকে গুড়ুম আওয়াজ।

বাঘ লুটিয়ে পড়ে না। কাত হয়ে পড়েই আবার উঠে ঝোপ-ঝাড় হুড়মুড় করে ভেঙে টলতে-টলতে সেই ফাঁকা চত্বরটার উপর টালমাটাল ভাবে আড়ালে চলে যায়।

বাউলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বেশ জোরেই বলে,—চল মরদ, এবার আমরা চলি, তুরন্ত নেমে চল ডিঙিতে। এখন ওর পেছনে আর নয়। পরে দেখা যাবে। চল্‌!

জো' এসে গেছে। ডিঙি সুজনে ভাসিয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত বাউলে আদরের সুরে বলে,—কী দেখলি, কী বুঝলি নতুন মরদ?

উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকে বেদে বাউলে বলে,—জানিস,···আর দেখলিও তো, আমাদের বাদায় কে শিকার আর কে শিকারী তা বোঝাই দায়!

দশ

ঘটনাস্রোতের টানে এক অঘটন এনে দিলো জীবনে। গোসাবার জীবনে এ এমন কিছুই নয়। পাশের গাঁয়ের একটি মেয়ে গোসাবার হেমিল্টন স্কুলে পড়ে। ছেলেবেলা থেকে

গান-বাজনা তার প্রিয়। সেই সূত্রে গোসাবার বেদে বাউলের প্রতি আকর্ষণ। একই সূত্রে বেদে বাউলেও তার প্রতি আকৃষ্ট। এমন গান-পাগলা ও তার কণ্ঠসুরের এমন ভক্ত যে কোনও মেয়ে হতে পারে তা বাউলেরও ধারণা ছিলো না।

গোসাবার আনন্দময়তার সঙ্গে যে একবার জড়িত হয়েছে সে জীবনে ভুলতে পারবে না হেমিল্টনের কীর্তিকলাপ, ভুলতে পারবে না এক দুর্ধর্ষ বনের সংলগ্ন গোসাবার মতো এমন সুষমা-মণ্ডিত পরিবেশকে ও তার অধিবাসীদের।

সেই পরাধীনতা আমলের কথা। বিলাতের রাজবংশের নীল রক্ত গায়ে নিয়ে জন্মেছিলেন ডেনিয়াল হেমিল্টন সাহেব। অগাধ সম্পত্তির মালিক যেমন, তেমনি বৃটিশ শাসকযন্ত্রের উপর আধিপত্যও অগাধ। আসলে তাঁর মনোভাব ছিল প্রজাবৎসল জমিদারের। এই ধরনের প্রজাবৎসল অনেক জমিদার আমরা দেখেছি এই বঙ্গদেশেও। যাদের জন্য নুব্জেপড়া বহু চাষীরাও সহসা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি বৃটিশ আমলে। হেমিল্টন সাহেব নানাভাবে বৃটিশ শাসকদের বোঝান, ভারতের চাষীরা আজ শোষণের শেষ সীমায়, এরজন্য তাদের মধ্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে না তুললে কখন যে আগুন জ্বলে উঠবে তার ঠিক নেই। সমবায় আন্দোলন গড়ে দেখাতে হবে যে তারা একত্রিত হয়ে মাজা খাড়া করে নিজের অন্ন ও বস্ত্র জোটাতে পারে।

হেমিল্টন তখন ভারতে আসেন 'পি-এণ্ড-ও' জাহাজ কোম্পানির সর্বময় কর্তা হয়ে। বেরিয়ে পড়লেন জলযানে। সন্ধান চললো, কোথায় তাঁর সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত করবেন, কোথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবেন। পরিক্রমা চলে চব্বিশ পরগনার গোটা সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরেঘুরে পুবে রায়মঙ্গল নদী থেকে পশ্চিমে মেদিনীপুর এলাকা পর্যন্ত। শেষমেষ গোসাবা অঞ্চলই হয় তার মনঃপূত। সরকারের কাছ থেকে বনের তিনটি পাশাপাশি দ্বীপ—গোসাবা, সাতজেলিয়া ও রাঙাবেলিয়া বন্দোবস্ত করে নিয়ে কাজে নামেন ১৯০৮ সালে। বাদার এই তিনটি দ্বীপকে প্রথমে আবাদে পরিণত করলেন; মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও উড়িষ্যার আদিবাসীদের আমন্ত্রণ করে ও তাদের বসতি বানিয়ে দিয়ে।

গোসাবায় গড়ে উঠতে লাগলো একের পর এক সমবায়গুলি —সমবায় ব্যাঙ্ক, সমবায় চালকল, সমবায় বিপণি, সমবায় মৎস্যজীবি ও আরও কতো নতুন ধারার সমবায়। পরীক্ষা চলতে থাকে —কীভাবে নোনাজলের দাপটকে উপেক্ষা করে ধান ফলানো যায়, কীভাবে ও কি সারের সাহায্যে খেজুর গাছের রস নোনতা না হয়ে উঠতে পারে, কীভাবে জমিকে এক-ফসলার জায়গায় তে-ফসলা করা যায়, কীভাবে আপৎকালীন ধর্মগোলা সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে তোলা যায়, গভীর ও ভয়ঙ্কর শ্বাপদ সঙ্কুল সুন্দরবনে মাছ ও মধু আহরণের অভিযানগুলি কি করে নিরাপদ করে তোলা যায়। এমনি ধরনের অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার আবেগের যেন অবধি ছিলো না। গোসাবায় সে এক রমরমা অবস্থা।

গোসাবার মানুষের মধ্যেও উৎসাহ ও কাজের যেন জোয়ার আসে। হেমিল্টন সাহেব দেখলেন—এতো সব তো হলো, কিন্তু চাষীরা সবার আড়ালে মারা পড়ছে মহাজনী ঋণের দায়ে। যাকিছু চাষীরা আয় করে তার বাড়তি অংশটাই প্রতি সনে ঋণের সুদ মেটাতে মহাজনের ঘরে রেখে আসতে হয়। তিনি তখন প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে নিজে এক টাকার কাগুজে নোট ছাপিয়ে চালু করার অনুমতি আনেন। এই কাগুজে নোট গোসাবার গোটা সমবায় সংস্থাগুলিতেই মাত্র গ্রাহ্য ছিল। কাজেই কাজের মরসুমে নিজেদের সংসার চালাতে চাষীদের আর মহাজনের কাছে হাত পাততে হতো না।

সবই হলো। মায় রবীন্দ্রনাথও শ্রীনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমবায় হোতা হেমিল্টনের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ করেন না, গোসাবায় এসে কদিন কাটিয়েও যান। গোসাবা এই পর্বে প্রায় সমবায় রাজ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আশপাশের সমাজ ও গোটা দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা না বদলালে কেমন করে একটা দ্বীপ সমবায়-রাজ্য হয়ে টিকে থাকে। হেমিল্টন সাহেব মারা যান ১৯৩৯ সালে। তারপর থেকেই বাইরে থেকে ও ভিতর থেকে ধনী-মানুষেরা লোভের বাসনা মেটাতে কুরেকুরে ঘুণ ধরিয়ে দেয় সমবায়-রাজ্যে অসমবায়ের বিষে। এ-বিষয়ে কীভাবে নিজের কোলে ঝোল টানার কাজে এগুতে হয় তা ধনী মানুষদের করায়ত্ত। তাহলে কি হবে, সমবায় রাজ্য ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু এ অঞ্চলে সাধারণ গরীব কৃষকদের মনে মনে এক গভীর টান রয়ে গেছে সমবায় প্রথায় দশে মিলে কাজ করার।

ফল্গুনদীর ধারার মতো মনের তলে এই টান ছিলো বলেই সাধারণ চাষীরা গোসাবার অতি সন্নিকটে রাঙাবেলিয়ায় আবার নড়েচড়ে উঠেছে ত্রিশ বছর কাটতে না কাটতে। শুধু উঠেছে না, সাতজেলিয়ায় মাধুরী ও সবুরকেও নাড়া দিয়েছে।

সূত্রপাত অতি সহজ ও সরলভাবে এসে পড়ে। পূর্বতন এক বিপ্লবী কর্মী গ্রামের আকর্ষণে রাঙাবেলিয়ায় হেমিল্টন উচ্চ শিক্ষালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন। তাঁকে ডাকে সব ছাত্রছাত্রী এবং পাড়ার লোকও 'মাষ্টারদা' বলে। একদিন নিচের ক্লাসের একটি ছেলে তাঁর কাছে সকাল-সকাল ছুটি চাইতে আসে। ছেলেটি পড়াশুনায় ভারি ভালো ছিলো।

ছেলেটি আবেদন করে, —আমাকে আজ একটু আগে যেতে দিন মাষ্টারদা।

মাষ্টারদা হাতের বইয়ের দিকে মুখ রেখেই বলেন, —কেন রে, কি বল্ খেলতে যাবি ? তাই কি হয় !

—না, মাষ্টারদা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, পেট দুমড়ে উঠছে। বাড়িতে গিয়ে খেতে হবে।

—কেন, খেয়ে আসিস নি ?

—না, মাষ্টারদা আজ তিনদিন কিছু খাইনি। বাড়িতে খাবার কিছু ছিলো না। ভাতও বাড়ন্ত।

তাঁর নিজের ছেলের বয়সী ছাত্রটির দিকে বড় বড় চোখ করে বললেন, —কি বল্লি. তিনদিন খাস্নি !!

মাষ্টারদা তো হতবাক্। কি করা যায়, কি করা যায়—ভাবতে ভাবতে তো কিছুক্ষণ থমকে থাকেন।

সহসা আদেশ দিলেন, —যাও, সব ক্লাসে গিয়ে খবর দাও। যারা যারা তোমার মতো অভুক্ত আছে, তাদের সবাইকে আমার সঙ্গে এখনই দেখা করতে। আমার এই ঘরেই।

মুহূর্ত মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি কচি কচি ছেলেমেয়েরা মাষ্টারদার ঘরে হাজির।

মাষ্টারদা এবার শুধু হতবাক্ নয়, হতভম্বও বটে। মনে মনে ভাবেন, এ কেমন করে হয়! কেমন করে আমি এদের অভুক্ত রেখে পড়াই !! না, তা হয় না।

প্রথম ধাক্কায় ভেবে বসেন, এদের স্কুলেই খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য সব মাষ্টারদের ডেকে তাদের মতামত নিয়ে ঠিক করে ফেলেন, স্কুলেই এদের খাবার খাওয়াতে হবে। সব মাষ্টাররা মিলে চাঁদা তুলে খিচুড়ি বানিয়ে খাওয়াতে হবে। হলোও তাই।

হলো বটে, অন্তত শিশুদের খালি পেটে পড়া মুখস্থ করতে হচ্ছে না। কিন্তু মাষ্টারদার মন আবারও বিচলিত হয়ে ওঠে—খয়রাতির অন্ন খাইয়ে চাষী পরিবারদের যে ভিক্ষুক বানাতে বসেছি। না, এ হয় না! না, এভাবে হয় না! হওয়া উচিত নয়।

এক একজন মানুষ থাকে, তারা পথ খুঁজে না পেলে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। মাষ্টারদাও তেমনি একজন লোক। পথ খুঁজে না পেতে, পুরোনো ছাত্রদের জড় করে বললেন,—তোমরা এক কাজ করবে ? গ্রামের এবং তোমাদের নিজেদের ঘরগুলির কার কি অবস্থা তা খুঁজে পেতে জোগাড় করে আনবে ? তোমাদের সংসারে একটা কিছু বাড়তি আয় যে কোনও ভাবে আনতেই হবে ; তারই জন্য এই কাজে নামতে হচ্ছে।

আমাদের সকলের বাড়তি আয়—এই আওয়াজ হেমিল্টনের আমল থেকেই বেশ চাউর ছিলো এই গের্দে। কাজেই এতে যে খুব একটা উৎসাহের জোয়ার এলো তা নয়। এবং উল্টো সুরে নানা লোকে নানা কথা পাড়ছে। বেশি জমির মালিকেরা তো সন্দেহবাতিক হয়ে উঠেছে—কি জানি, এ আবার কি নতুন মতলব !

কিন্তু ধীরে ধীরে কাজের পদ্ধতিটাই চাষীদের আকৃষ্ট করে তোলে। পাড়া কমিটি তৈরি হয়েছে। মাষ্টারদাকে অনেকে চুপেচুপে. কখনও বা সকলের সামনে প্রশ্ন করে,—কে কে এই পাড়া কমিটিতে কাজ করবে ?

মাষ্টারদা কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে বলেন,—কেন ? সবাই কাজ করবে, পাড়ার সবাই।

—তা না হয় হলো, খবরাখবর নেবার পর কি করা হবে ?

মাষ্টারদা তড়িৎ উত্তর দেন,—সে আমি জানি না। কেন, পাড়া কমিটিই সবই ঠিক করবে। কোনটা করলে তোমাদের ভালো হয় তা তো তোমরাই ভাল বুঝবে। তাই না ?

এই পাড়া কমিটি এক অভিনব জিনিস গড়ে উঠেছে রাঙাবেলিয়ায়। পাড়া কমিটির সভায় চত্বরভর্তি চাষীরা এসে বসে। সবাইকে এই সভায় মুখ খুলতে হয়। আলোচনা, তর্কাতর্কি অগোছালো ভাবে চলে সন্ধ্যা থেকে রাত দুটো-আড়াইটা অবধি। সবাই মিলে পথ খুঁজে বের করতে হবে। আর সে পথকে কাজে রূপ দিতে হবে সবাইকেই—যে যেমন ভাবে পারে।

দু বছরের মাথায় এই পাড়া কমিটি ঠিক করে— আমরা এবার ফসল তোলার পর যে-ছ সাত মাস জমি পড়ে থাকে তাতে লঙ্কার চাষ করে পরখ করতে চাই কিছু করা যায় কিনা।

চেষ্টাও হলো অনাবিল ভাবে। তেমনি মরসুমে লঙ্কাও দেখা দিল অপরিমিত ভাবে। যে মাঠ লঙ্কার সাদা সাদা ফুলে চিত্রিত হয়েছিলো, তা এখন ছেয়ে গেছে সবুজ আর লাল রঙের আভায়। ক্যানিং, বাসন্তী প্রভৃতি গঞ্জ থেকে ফড়েরা এসে কখনও লোভ, কখনও ভয়, কখনও বা গোমর দেখিয়ে দাম নামমাত্র পড়তায় আনার চেষ্টা করে। বসলো পাড়া কমিটি। সবাই মিলে ঠিক করলো—না, আমরাই নিয়ে গিয়ে কলকাতার পোস্ত-বাজারের আড়তে বেচবো। হলোও তাই। কিন্তু এখন মোক্ষম সমস্যা—টাকা কীভাবে বাঁটা হবে চাষীদের। আবার সেই পাড়া কমিটি। জমির পরিমাণ ও শ্রমের নিবিড়তা অনুযায়ী ভাগাভাগীটা নির্দিষ্ট হলো। বাকি টাকা পাড়া কমিটির নামে গচ্ছিত রইলো আগামী সনের কাজকারবারের জন্য। এই মীমাংসা করতে পাড়া কমিটিকে তিনদিন রাতভোর সভা করতে হয়েছে।

সর্বসম্মত মিটমাট হলো বটে, কিন্তু কোনো তিক্ততা যে আসেনি তা নয়। রেষারেষি, রাগারাগি ও বড়জোতের মালিকদের নষ্টামি যে হয়নি তা বলা যায় না। তবে সবকিছু মিলিয়ে এই লঙ্কাচাষের অভিজ্ঞতা এনেছে রাঙাবেলিয়ায় এক নতুন প্লাবন—উৎসাহের জোয়ার, আনন্দের তুফান, আর সর্বোপরি মানুষের মনের আত্মবিশ্বাসের পদচারণ। বনের বাঘ যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুন্দরবনে বিচরণ করে—রাঙাবেলিয়ার মানুষের পদক্ষেপে যেন সেই আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে।

দেখতে দেখতে কতো দিকেই না এই অঞ্চলের মানুষেরা সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নতুন ধরনের চাষ, তুলোর চাষ, আখের চাষ, দুধের কারবার, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, শুয়োর-হাঁস-মুরগী পালন, মাদুর বোনা মায় কলের নাঙল চাষ আর তার মেরামতির কারখানা—এমনি ধারা অগণিত কাজে ও কারবারে রাঙাবেলিয়ার মানুষ পাড়া কমিটির অধীনে আর সমবায় কাজের পথে নতুন জীবন গড়ে তুলছে। এই নবতম জীবনের প্লাবন যে উপচে গোসাবা ও সাতজেলিয়ায় এসে পড়বে কোন্ পথে তা ভাবা যায়নি।

এগারো

ভাবা যায়নি বটে, কিন্তু রাঙাবেলিয়ার সে-প্লাবনের ঢেউ প্রথমেই এসে পড়েছে দুই ভাই-বোনের জীবনে এক বিচিত্র পথে।

সাতজেলিয়া আর গোসাবার সীমানা রাঙাবেলিয়া খালের খাদ। বর্ষাকালে এই খাল পার হতে হয় খেয়ায়। কিন্তু শীত ও গরমে এই খাল মাধুরী তার শাড়ি হাঁটু অবধি তুলেই পার হয়ে যায় গোসাবার হেমিল্টন স্কুলে। সঙ্গে অবশ্য তার ভাই সবুরও থাকে। আজও ছিল। খাদের কিনারা থেকে দিদিমণির ডাক। শুনতে পায় কি না পায় তাই হাতছানি দিয়েও দিদিমণি মাধুরীকে ডাকেন।

দূর থেকে দেখেই বুঝেছে—রাঙাবেলিয়ার দিদিমণি না হয়ে যায় না। ছুটে এসেছে খাদের পলিমাটির আস্তরণের উপর দিয়ে হরিণীর মতো। সঙ্গে সবুরও ছুটে আসে।

দুজনেই দিদিমণিকে প্রণাম করে . মাধুরী তো প্রায় ঢিপ করে পলিমাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পায়ের ধুলো নেয়।

—এসো মা! —বলেই দিদিমণি মাধুরীকে বুকে জড়িয়ে প্রশ্ন করেন, —তা মা এতো দেরি কেন?

—গোসাবার স্কুল কি এখানে! খেয়া-ঘাটে আসতে কি কম ঘুরতে হয়। তা দিদিমণি, আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

—চিনলাম কি করে। তা তোমাকে রাঙাবেলের কে না চেনে! সেই সেবার যে তুমি গাইলে থিয়েটারে, অভিনয় শুরু হলো তোমার গান দিয়ে—'মণি ঘুমলো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে।' ছত্রটি সুর করে গেয়ে দিদিমণি মাধুরীর আরক্তিম কর্ণমূলে কোমল হাতে স্পন্দন তুললেন, যেন মরা স্রোতের কূলেই তখন-তখুনি ঘুম পাড়াতে চান মাধুরীকে।

মাধুরী বিগলিত,—মা! সেদিন তুমি সেখানে ছিলে?

—শুধু থাকিনি, সেদিন থেকেই ভেবে রেখেছি তোমাকে আমি আমার কাছে আনবো। জানো মা-মাধুরী, আমরা একটা সাংস্কৃতিক ক্লাব খুলেছি।

মাধুরী আর বলতে দিতে চায় না, আকুল আবেদন করে,—মা, বলবে আমার বাবাকে আমাদের রাঙাবেলে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে?

সবুরের কান খাড়া হয়ে ওঠে উৎকণ্ঠায়। এতোক্ষণ খাদের শুকনো ঢালে বড় একটা কচুরিপানার ঝোপের ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলো। এবার গলা বাড়িয়ে দিদিমণির কপোল-দেশের ওপর চোখের পাতা মেলে ধরেছে।

দিদিমণি বলেন,—সে কথা পরে হবে। চলো মা, আমরা এবার এগুই। স্কুল থেকে এসেছ, এখন কিছু খেতে হবে তো! কিন্তু তোমার বাউলেদা, তোমার গানের গুরু তোমাকে গোসাবা ছাড়তে দেবে তো?

—না মা, তুমি বাউলেদাকে চেনো না তো। অমোন দিলখোলা মানুষ হয় না, কোনো দ্বেষ-বিদ্বেষ কারো প্রতি নেই। সে শুধু বাঘ-পাগলা আর গান-পাগলা। বাউলেদা খুশিই হবে। খুশি বলে খুশি! আমিই তাকে রাঙাবেলের গানের আসরে নিয়ে আসবোই।...বাউলেদার কথা উঠলে মাধুরী যেন থামতে চায় না। সবুরও বুঝি কাছে এসে দিদির হাত ধরে ঝুকেছে কিছু বলার জন্য ওদের বাউলেদার বিষয়ে।

দিদিমণি আবারও ব্যস্ত হয়ে বললেন,—চলো মা, সব হবে, সব হবে। চলো এবার এগুই।

কোমল 'মা' ডাক মায়ের জাতের মনের তারে আপনা থেকে ঝঙ্কার ওঠে। এই বনবাদাড়ের দেশেও তার ব্যতিক্রম নেই।

দিদিমণি ও মাধুরী এবার কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। দিদিমণির হাত মাধুরীর বাহুতে মমতা-ঝরা আঙুলে আঁকড়ে ধরা। আরেকজন বোধহয় ধরার মধ্যে নয়; সে চলেছে বেশ কয়েক পা পিছে পিছে। ধর্তব্য নয় বটে, কিন্তু এমন ভাই-বোন পাওয়া বোধহয় সংসারে দুর্লভ। আমাদের মহাকাব্যদ্বয়ে ভাই-ভাইয়ে মিল-মিশের কথা আছে, আছে রামলক্ষ্মণের কথা। কিন্তু ভাই-বোনের কথা মেলা দায়। ইতিহাসে আছে অবশ্য হর্ষবর্ধন ও রাজশ্রীর কথা। সে তো জানা আছে একমাত্র লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদের মধ্যে। তবে এই বাদা-বনে অবশ্য বনবিবি ও সা-জাঙ্গুলির কথা যেন সহসাই এদের মনে ভেসে ওঠে। মাধুরী ও সবুর যেন একাত্মা। একে অপরকে সর্বক্ষণ আগল দেয়। তাই বলে সবুর দিদির ন্যাওটা নয়। দরকার হলে দিদির কাজে বাধা দেয়, মান-অভিমান করে।

ওরা অনেক দূর এগিয়েছে। দুটি পাড়া পার হয়ে গেছে। কোথাও বাড়িগুলি ঘিঞ্জি, কোথাও বা ক্ষেতি জমি ফারাক, তবে ডাকের মাথায়। আবাদ অঞ্চল, বিপদের সীমা নেই। তাই কেউই অন্য বাড়ির ডাকের মাথার বাইরে থাকতে চায় না। আর কিছুটা দূর এগুলেই দিদিমণি ও মাধুরীদের দুদিকে যেতে হবে। বাঁ দিকে রাঙাবেলের পথে দিদিমণিকে, আর ডান দিকে সাতজেলের গোমর নদীর তীর অবধি যেতে হবে মাধুরীদের।

এমন সময় পাশের এক বাড়িতে ভীষণ চিৎকার—বাচ্চা একটি ছেলের তীব্র কান্নার চিৎকার আর সেই সঙ্গে বাঁশের বাখারির চটাং চটাং শব্দ। তাড়াতাড়ি ওরা এগিয়ে দ্যাখে, কানাই মণ্ডল ছোটো একটি ছেলেকে বেদম প্রহারে মত্ত। কানাই মণ্ডল সাতজেলের এক সম্পন্ন চাষী। কিছু ধান তার কাছে সব সময়ই থাকে, তবে গোলাজাত করার মতো নয়। মণ্ডল চিৎকার করছে,—করবি আর! বসে বসে সময় নষ্ট করবি! গরুটা জাব্‌না না খেয়ে মরে গেলে তোর শাস্তি! ধান নেবার সময় মনে ছিলো না! এক একটা কথা বলে আর গিরো-রাখা চটা বা বাখারির চটাং চটাং কষাঘাতে ছেলেটির পিঠ ও হাত রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। মণ্ডল উত্তপ্ত।

সবুরকে ডেকে দিদিমণি জানতে চান ব্যাপারটা। সবুরের কাছাকাছি বয়স ছেলেটির। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। ওর মা মণ্ডলের কাছ থেকে গত সনে দুবস্তা ধান হাওলাত নেয। সর্ত ছিলো, যতোদিন শোধ না হয় ততোদিন ছেলেটা মণ্ডলের বাড়িতে থাকবে ও খাটাখাটি করবে। ছেলেটার বাড়ি আরও কিছুটা এগিয়ে একটা ছিলে-ভেড়ির গায়ে।

বৃত্তান্ত শুনে দিদিমণির চোখে জল এসে যাবার মতো। বলেন, —চলো, আমরা সবাই ছেলেটির মা-র কাছে একবার যাই।

ছেলেটির বাবা বেশ কয়েক বছর আগে বনে মাছ মারতে গিয়ে বাঘের কামড়ে মারা

যায়। বাড়িতে বিধবা মা ও ছেলে। এদেশে তেমন রেওয়াজ থাকলেও মা আর বিয়ে করতে চায়নি। কাজেই এ বাড়িতে আর কোনও মরদ নেই।

ছেলেটির কান্নার চিৎকার ওদের বাড়ি থেকেও শোনা যায়। ওর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলো সেই আর্তনাদ আর নিজের মনেই বিড়বিড় করছিলো। এদের তিনজনকে খিড়কিতে দেখেও এতোটুকু নড়চড় নেই। যেমন বিড়বিড় করে শাপান্ত করছিলো, তেমনি ভাবেই করতে থাকে,—মারছে, বেশ করছে !! পেটপুরে ভাত খাবার সময় মনে থাকে না ; মনে থাকে না !! এক সানুক ভাত না নিলে পেটই পোরে না ওনার ! তরকারি নেই, তব শুকনো ভাত গোগ্রাসে গিলতে হবে ভর্তি এক সানুক ! মার খাচ্ছিস ? খা···খা···খা, ···ভাল করে বুঝে নে, বুঝে নে কতো ধানে কতো চাল ! —বিড়বিড় করেই চলে।

দিদিমণি মাষ্টারদার গিন্নি। নিজেও দু-ছেলের মা ! আগে ছিলেন কলকাতার এক স্কুলের মাষ্টারনি আর সেই সঙ্গে করতেন 'মহিলা সমিতি'। রাঙাবেলিয়ায় এসে 'মহিলা সমিতি' করার চেষ্টা করছেন। জানা আছে কলকাতার চাকুরিজীবী মেয়েদের, বস্তির মেয়েদের নিয়ে কি করে সমিতি গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু বাদাবনে চাষী মেয়েদের কেমন করেই বা জমায়েত করা যায়, এই তাঁর ভাবনা। ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে এখন খানিকটা দুরস্ত হয়ে উঠেছেন।

ছেলেটির মা যেমন বিড়বিড় করছে তেমনিভাবেই বিড়বিড় করতে দিলেন, আর মাধুরী ও সবুরকে সঙ্গে নিয়ে সোজা খুপরির সবে গোবর লেপা হাতনেটার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা ছেঁড়া মাদুর মেলে পা তুলে লেপটে বসে পড়লেন তার ওপর। ওদেরও টেনে বসালেন।

মাধুরীকে আস্তে আস্তে বললেন,—দেখেছো মাধুরী, অভাবের যন্ত্রণায় এরা মায়ের মনও হারাতে বসেছে ! কোনও পথ না পেয়ে, মা হয়েও ছেলের বাপান্ত সমানে কেমন করে চলেছে। খালি পেটে যেমন লেখা-পড়া হয় না, তেমনি পেটের জ্বালানিতে পড়লে মা আর মা-ও থাকে না ; কি করি বলো তো ?

—ও ছেলের মা—বেশ জোরেই ডাক দিলেন দিদিমণি। 'এসো না এদিকে'—বলতেই পাগলের মতো গোটা উঠোনটা এক ঘুরপাক খেয়ে আস্তে আস্তে কাছে এলো। তখনও মুখে গালির অন্ত নেই। দিদিমণি আর কিছু না বলে, হাতে বোনা পাশ-থলি থেকে এক খিলি পান ছেলের মা-র দিকে এগিয়ে দিলেন। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে এসে দিদিমণির এই পান খাওয়া অভ্যাস। পান মুখে দিলে কথা নেই, গ্রামের মেয়েরা তাদের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে মাটি লেপটে বসে যায়। কাঁচা সুপুরি, আস্ত পান, যাঁতি আর চুন থাকলে তো রক্ষা নেই ! তাই এ সবকিছু নিয়েও দিদিমণি এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘোরেন।

সত্যি সত্যি পান দেখে ছেলের-মা ডোয়াতে লেপটে বসে গেলো। শান্ত হয়েও এলো যেন। তখন দিদিমণি হঠাৎ বলেই বসলেন,—ধান তো ধার নিয়েছ বছর খানেক আগে, এবার শোধ দেবার ফিকির খুঁজতে হবে, তাই না ?

একটু ভাবনায় মাথা নিচু করে বলে,—দিদিমণি, আমার মাথায় তো কোনও ফিকির আসছে না। মাথায় আসবে কি, আমি তো পাগল হয়ে গেছি ?

—কেন, তুমি কোনও কাজ-টাজ জানো না ? ধরো, সুইফোঁড় জানো তো ? —আচ্ছা তোমাকে কিছুটা নতুন কাপড় এনে দিচ্ছি, তুমি সায়া কয়েকটা বানিয়ে ফেলো না। ···বিক্রীর কথা বলবে তো ?

এবার একটু থেমেই বললেন, —বেশ, এই আমার মা-মাধুরী রইলো। ও গিয়ে এ-বাড়ি

ও-বাড়ি থেকে আগাম অর্ডার নিয়ে আসবে। তারপর সায়া পৌঁছে দিয়ে দামটাও নিয়ে এনে তোমাকে দেবে।

ছেলের মা এবার চিন্তিত। ভাবে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো।

দিদিমণি আবারও বলেন, —তোমার ভাবতে কিচ্ছু হবে না। তবে সেই টাকাটা সবটা খেয়ে ফেলো না। বেশ কিছুটা রেখে দেবে। নতুন অর্ডারের জন্য আবার নতুন কাপড় এনে তোমাকে দিতে হবে তো। তাছাড়া, তোমার কর্জ-ধানটাও তো শোধ দিতেই হবে তো।

দিদিমণি এবার পানের খিলি নয়, পানের বাটাও মেলে ধরেছেন। যাঁতি ও সুপুরি ছেলের-মার হাতে দিয়ে বললেন, —কাটো, খুব মিহি করে কেটো কিন্তু।

সবুরের তো ছোট্ট যাঁতিখানা দেখে হাসি পেয়ে গেছে। সুপুরি কাটতে কাটতে সেই হাসির দিকে তাকিয়ে ছেলের মা-ও হেসে ফেলেছে। কিন্তু হাসবে কি, তার নিজের ছেলের কান্নার সুরটা যে তখনও বুকে বিঁধে আছে। তবুও সে হাসে।

হাসে। দিশেহারা হয়েই হাসে। দিদিমণি এমন তড়িঘড়ি সব প্রস্তাব এনে ফেলেছে যে হাসি দিয়ে সবই মেনে নেওয়ার কথা যেন তাঁকে জানিয়ে দিলো।

ধীরে সুস্থে পানের বাটা গুছিয়ে নিয়ে ওরা তিনজনে আবার পথ ধরলো। ছেলের মা-ও নিজের খাটো তবনখানা টেনেটুনে সভ্য-ভব্য হয়ে খিড়কি অবধি এসে বিদায় দিতে কসুর করে না।

দিদিমণিকে এবার রাঙাবেলের পশ্চিমমুখো পথটা ধরতে হবে। মাধুরীকে আবার কাছে টেনে পিঠে হাত রেখে বললেন, —মা-মাধুরী, এবার তো তুমি আমাদেরই হয়ে গেলে। কাজে লেগে যাও। ঠিকমতো দুদিনের মধ্যে কয়েকটা সায়ার অর্ডার এনে ফেলো। আর কি? তোমার স্কুল বদলাবার কথা বলবে তো? দুদিনের মধ্যে তোমার বাড়িতে এসে তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলবো। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

সবুর একবার দিদির দিকে তাকায়, আরেকবার দিদিমণির দিকে।

সবুরের গায়ে হাত দিয়ে দিদিমণি বলেন, —আবে বুঝেছি, তোকে ভাবতে হবে না। তোকে তো টেনে নিয়ে চলে আসবো। এমন দিদি আর ভাইকে কি আলাদা করা যায়। তোদের বাড়ি তো সাতজেলে, তোদের নিয়ে আসতে গোসাবার স্কুল কখনই আপত্তি করবে না। রাঙাবেলে তো বলতে গেলে সাতজেলের মধ্যে।

সবুরের সে-ভাবনা নয়। সবুরের ভাবনা বাউলেদাকে নিয়ে। তার কাছ থেকে ওদের ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায়। দিদিমণি বুঝতে না পারলেও মাধুরী ঠিকই ধরে ফেলে বলে, —আরে যা, তোর ও কথা ভাবতে হবে না।

মাধুরীর শাসনের তোড় দেখে দিদিমণিরও বুঝতে আর বাকি রইলো না, —আরে, সে কথা তো তখনই বলেছি। বাউলেদাকে তো বলতেই হবে। অমন গুরুর কাছ থেকে কি অমন শিষ্যাকে বিনা অনুমতিতে ছিনিয়ে আনা যায়। ...আরে তা কেনো, আমি তো ভাবছি, বাউলেদাকে আমাদের গানের ক্লাবে নিয়ে আসবো। ঠিকই নিয়ে আসবো। ...মাধুরী, তোমাকে কিন্তু একদিন সেই গানটা আমাকে শোনাতে হবে।

—কোন্ গানটা দিদিমণি?

—আরে, সেই যে গানটা, —সুর টেনে বলেন, —'মণি ঘুমলো, পাড়া জুড়ালো...'

তিনজনে এবার একসাথেই হো-হো করে হেসে উঠলো। দিদিমণি সেই হাসির ঝোঁকেই রাঙাবেলের পথ ধরেছেন আর মায়ের গলার মিষ্টি সুরে সেই গানের লহরী দূর থেকে ভাই-বোনের দিকে ভাসিয়ে দেন।

দুই ভাই-বোনে বাড়ির পথ ধরেছে। হাঁটি-হাঁটি করে ধীর পায়ে এগুচ্ছে। দুজনেরই অধরে হাসির রেশটা লেগেই আছে। মাথা হেলিয়ে কান খাড়া করে দিদিমণির সুরের শেষ টানটাও বুঝি শুনতে চায়। বেশ কিছু সময় দুজনারই কোনো কথা নেই। হঠাৎ সবুর উদ্বেলিত হয়ে বলে, —দিদি—দিদিমণি যেন একেবারে মিঠেপানি! তাই না!

দিদি নিরুত্তর। নোনাপানির দেশে মিঠে পানির আকর্ষণ অমোঘ। দিদিমণির প্রতি এই টানের এক মস্ত কারণ হলো—দিদিমণিও যে আরেক গানের পাগল। শুধু সুরের পাগল নয়, গানের পদরচযিতাও। এ দেশের চাষী, জেলে, তাঁতি ও আদিবাসীদের জীবনের ছন্দ তাঁর পদচারণায় তুলে ধরে তাতে সুর যোজনা করেন। সে সুরগুলিও এই নোনাদেশের হাওয়ায় যেন মিশে আছে—ভাটিয়ালি, বাউল, ঝুমুর বা টুসুগানের সুর। এই সব সুরের মেশাল দেওয়া দিদিমণির রচিত একটি গান এরই মধ্যে অনেকেরই পছন্দ :

রক্তে ভেজা মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি,
দিনে রাতে খাটি করছি পরিপাটি।
জান দেবো তবু ধান দেবো না,
মাটির দাবি ছাড়বো না।
বাঘের সাথে লড়াই করে হটিনি
মোরা হটবো না।

এমন ধরনের দিদিমণি এই দুই ভাই-বোনকে এতো সহজেই যে নিজের কোলে টেনে নেবেন, তা মোটেই বিচিত্র নয়। শুধু কথায় নয়, কদিনের মধ্যেই দিদিমণি ওদের বাবা ও মা-র সঙ্গে দেখা করে তাদের রাজি করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাউলেদাকেও পাকড়াও করেছেন। মাধুরী ও সবুর রাঙাবেলে তো আসবেই, বাউলেদাকেও রাঙাবেলে গানের ক্লাবে আসতে হবে গান শেখাতে। মাধুরী রাঙাবেলে যাচ্ছে শুনে বেদে বাউলের প্রথমে ওখানে যাবার লোভ হলেও, আপত্তি জানালো।

বিনীতভাবে বলে —আমি গিয়ে কী করবো! আমি তো কালোয়াতি গান জানি না, সুরের সূক্ষ্মভাঁজও জানি না। আমি ক্লাবে কেমন করে গান শেখাবো?

দিদিমণি তক্ষুণি বলেন, —আমি কি তাই বলছি! তোমার কাছ থেকে কি সূক্ষ্ম কালোয়াতি গান শিখতে চাইছি! সাদামাঠা গান, ধরো নদীর গান, বনের গান, চাষের গান, মাঝির গান, বনবিবি পুজোর গান, টুসু গান—এমনি ধরনের গান শেখাতে হবে। পারবে না?

—মোটেই পারবো না বলি কি করে? মাধুরী তো অনেকগুলিই শিখে ফেলেছে। তিনবারের বেশি চারবার ওকে শোনাতে হয় না গানটা। তবে পদগুলি মুখস্থ করতে যা একটু দেরি হয়। ভারি লক্ষ্মী মাধুরী।

—তোমার মুখে আর মাধুরীর খ্যাতি শুনতে হবে না!!

বাউলে উৎসাহিত হয়ে বললো, —দিদিমণি একটা গান শুনবে?

উত্তরের অপেক্ষা না করে বাউলে গলা খাঁকার দিয়ে মোটা গলায় গান ধরলো :

'মাগো, রেশমী চুড়ি আর পরো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্মসাক্ষী,
জগৎজুড়ে আছে জানা।
মাগো, রেশমী চুড়ি আর পরো না

—আরে, এ গান তুমি শিখলে কোত্থেকে ? এ স্বদেশী গান তো মুকুন্দদাসের !

দিদিমণির হাতে চারগাছা রেশমী চুড়ি ছিল, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বাউলে বললো,—আমার আদিবাড়ি তো তুমি জানো না দিদিমণি ! আমার আদিবাড়ি বাড়ুলি কাটপাড়া, খুলনা জেলায় । সেখানে ছেলেবেলায় মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা গান শুনে আমি পাগল হয়ে যেতাম । বাবরি চুলে গেরুয়া ফেটা আর আলখেল্লা পরে গলায় সোনার মেডেলের মালা ঝুলিয়ে দরাজ গলায় সে কি গান তোমাকে বলবো ! মেয়েরা শুনে তো পাগল হয়ে যেতো, চিকের এপার থেকে শোনা যেতো, ঝম্‌ঝম্ করে সবাই হাতের রেশমী চুড়ি ভেঙে ফেলছে !!

দিদিমণি বাউলেদাকে উৎসাহ দেবে আর কি, নিজেই এখন উৎসাহিত ! বলেন, চলো বাউলেদা, চলো আমাদের আড্ডাতেই তোমার স্থান, চলো ।

বারো

শেষ পর্যন্ত যে যার সঠিক স্থানেই চলে এসেছে যেন । তবে গানবাজনা তো একটা মাধ্যম মাত্র । টাগোর সোসাইটির বুঝি প্রধান কাজ, মানুষের কোমরে বল এনে দেওয়া । যাতে কিনা তারা মাজা খাড়া করে দাঁড়াতে পারে সমবেত কাজের মধ্য দিয়ে । সে-কাজে মাধুরীই বা কম কি ! রাঙাবেলে থেকে মাধুরীকে হাতে খড়ির কাজ দিয়েছে—সাতজেলের বিধবাপল্লীর সমবায়গুলি পাড়া কমিটির মাধ্যমে সজীব করে তোলা । কতোটা সে নেত্রী হয়ে উঠবে, সে তো ভবিষ্যতের কথা । তবে সংগঠনকে সজীব করে তুলতে আপাতত আবশ্যক ঘোরাফেরা করা, পাড়ায় পাড়ায় প্রতি বাড়ি-বাড়ি যাতায়াত করা । এ-কাজে তো মাধুরীর নেশা অঢেল । সে-নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে সবুরের জন্য —সে তো দিদির পিছু-পিছু ফেউ-এর মতো সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে আছে ।

বিধবাপল্লী, এ এক অভিনব নাম । কোনও বসতির এমন নাম অন্য কোথাও মেলা দায় । নামের মধ্যে যেন একটা চাপা বেদনার ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে । না, সেটাই শুধু নয় । সুন্দরবনের জীবন যুদ্ধে লড়াকু মানুষের বিক্রমও প্রতিষ্ঠিত এই নাম-করণে । সুন্দরবনে সবচেয়ে সাহসী শ্রেণী বোধহয় জেলেরা । ডিঙি ও জাল নিয়ে ওরা যায় সুন্দরবনের নদী, খাল, পাশ-খাল ও শিষের মুখে, রাতে ও দিনে । শুধু শিষের মুখে নয়, এরা যায় সাগরের মুখেও ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে । এরা একমনে নিজের শিকারের প্রতি বোধহয় অর্জুনের মতো স্থির, অপলক ও একাগ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়া ভুলে থাকে । আর সেই সুযোগে বনের হিংস্রতম জীবও আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের লক্ষ্য করে । চলে হাতাহাতি । কারণ, এদের তো বন্দুক নেই । থাকলেও বন্দুক উঁচিয়ে রেখে, আর যাই হোক মাছ মারা দায় । এই হাতাহাতির ফলে কখনও বাঘ পালায়, কখনও বা জেলেদের প্রাণের মূল্য দিতে হয় । তাই বিধবার মতো অঘটন প্রায়ই লেগে থাকে জেলেদের সমাজে । সংসার ভাঙার মতো এমন 'সব্বনেশে' অবস্থাকে জেলে-বধূরাও বীরের মতো লড়ে যায় । কখনও নিজেরাই খেটে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে, কখনও বা বিধবা-বিবাহ মেনে নিয়ে নতুন করে সংসার গড়ে ।

নদীর চরা জমি বরাবর এদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই ! আর কিছু না হোক এদের প্রতি সংসারে একখানা জেলে-ডিঙি ও জাল আছে । জাল শুকোবার ও ডিঙি মেরামতির কাজে এরা নদীর গায়ে চরা জমি বেছে নেয় । কোনও বিপদকে এরা বিপদের মধ্যে ধরে না —ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, বন্যা, খরা, বাঘ, কুমির, সাপ—না কিছুই না । ডিঙিই এদের কাছে

সর্ববিপত্তারিণী। যেমন খুশি, যেদিক ইচ্ছে চলে যাবে গোটা সংসারটা নিয়ে, আবার ফিরে আসবে পয়লা সুযোগেই। সকল বিপদ-আপদে একমাত্র কামনা—নদীতে মাছের আকাল যেন না হয়!

সাতজেলে প্রথম বিধবাপল্লী সৃষ্টি করেন হেমিল্টন সাহেব। নানা সুযোগ সুবিধে দিয়ে জেলে-বিধবাদের প্রতি মঙ্গল কামনায় এই বিধবাপল্লীর অবতারণা। সমবায়ে কাজকর্ম করা এদের যেন সহজতর প্রবণতা। সে সমদ্দুরের মোহানাই হোক, আর বনের নদীর ত্রিমোহানাই হোক—বিস্তৃত জাল চাই আর দলবদ্ধ মানুষ চাই মাছের লাটকে ডাঙায় তুলতে। কাজেই হেমিল্টন সাহেবেরও এদের প্রতি টান ছিলো। সহজে এদের নিয়েই বুঝি সমবায় পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে।

সাতজেলের পুবে নদীর ছড়াছড়ি—গোমর নদী, গাড়াল নদী, কর্জরা নদী, কচুখালি নদী, মেলমেলে নদী। এই সব নদীর মুখে ও চরে সাতজেলের বিধবাপল্লী। এই নদীগুলি এতো কাছাকাছি যে সাতজেলের বিধবাপল্লীর তীরে দাঁড়ালে প্রায় সবগুলি নদীর হাওয়া এসে মাধুরীর বুকে ও আঁচলে মৃদু ঢেউ তোলে। মজাই লাগে মাধুরীর, আর সেই ফাঁকে সবুরও ছোট্ট একখানি ডিঙি বেছে নিয়ে যে-কোনও একটা মোহনার দিকে ভাসিয়ে দেয়। মাধুরী ভয়ে ভয়ে এক-নজরে তাকিয়ে থাকে ডিঙিখানির দিকে— পাছে সবুর ভুল করে গাড়াল নদী ছেড়ে অন্য কোনও গাঙে ঢুকে পড়ে। ঢুকলে মাধুরীর কিছু করার নেই। তবু ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে,—হয়তো দূর থেকে ওকে দেখে দিশেহারা হবে না ওর ভাই। মমতা জাগে ভাই-এর প্রতি অপরিসীম। আর সেই সঙ্গে মমতা উৎসারিত হয় ওর বুকে—বিধবাপল্লীর মানুষদের প্রতি, মমতা জাগে দিদিমণির প্রতি, মমতা জাগে বাউলেদার প্রতি। মাধুরী তখন গান গেয়ে ওঠে আনমনে।

অনেকদিন হলো মাধুরী বিধবাপল্লীর কাজে মেতে উঠেছে। এদের মূল সমস্যা খাতকের। যখনই দল বেঁধে এরা মাছ ধরতে যায়, তখনই এরা মহাজনের খপ্পরে পড়ে। মহাজনেরা যেন কতো কৃতার্থ হয়ে এদের টাকা ধার দেয়, মোটা টাকাই দেয়। জেলেরা তখন নিজের হাত-খরচা বাবদ সামান্য একটা অংশ রেখে বাকিটা বউদের হাতে সংসার খরচ বাবদ দিয়ে যায়। তাহলে কি হবে! ডিঙি ভর্তি মাছ ধরে আর বাড়ি ফিরতে হয় না ওদের। মহাজনেরা সুদে-আসল দেখিয়ে মাঝপথেই সব মাছই নিয়ে যায়। দুটো মাছও খাওয়ার বাবদ এরা আনতে পায় না বাড়িতে। এদিকে সুদের হিসেব বড় কড়া; ডবল সুদ দিয়েও এদের হাত থেকে বাঁচা দায়।

মহাজনের খপ্পর থেকে বাঁচনই জেলে-পল্লীর প্রধান সমস্যা। সমবায় পথে কীভাবে এগুনো যায় তারই প্রচেষ্টা বিধবাপল্লীর সমবায়গুলির। হেমিল্টন সাহেবও মাছের সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি এখন মহাজনদের এবং চক্‌দারদের খপ্পরে পড়েছে। নিজেদের স্বার্থে কি করে সরকারী সমবায়-ঋণ আদায় করা যায় তা মহাজনদের ভালই জানা আছে। মরতে-মরণ খোদ জেলেদের। এরই হাত থেকে ত্রাণ পেতে পাড়া-কমিটি সব এখন গড়ে উঠছে। মাধুরীও যেন মনের মতো কাজ পেয়ে এখন রাত নেই দিন নেই তাতেই ব্যস্ত।

বাউলের কিন্তু এই সব কাজ নিয়ে মাধুরীর এতো মাতামাতি পছন্দ নয়। সত্যই তো গানের বৈঠকও কমে এসেছে। অবশ্য গানের আসর বসলেই মাধুরীর আসার ঘাটতি নেই। আর কিছু না হোক, বাউলেদার সঙ্গে তো দেখা হবে। আর দেখা হতেই মাধুরী অতি উৎসাহ

য়ে তাকে বিধবাপল্লীর কাজের ফিরিস্তি দেবে, খুঁটিনাটি ঘটনার কথা সব বলবে। কতো ধা এই কাজে, আর সে সব বাধাকে কীভাবে কাটিয়ে উঠতে চায় সে। হয়তো বলে, —জানো বাউলেদা, পদি-পিসী কেমন হতাশ হয়ে গেছে। পদি-পিসীকে তুমি চিনলে না? দি-পিসী মঙ্গলা গাইনের বউ। মঙ্গলা গাইনকে বাঘের পেটে যেতে হয়েছে। নাকি সেদিন স অনেক কানমাছ পেয়েছিলো, তাই মহাজন আবাদে ফিরে এসে আর ঋণের টাকার কথা লে বিরক্ত করেনি পদি-পিসীকে। তাই মহাজনের উপর কিছুতেই ওর রাগ ওঠে না। নেক করে পিসীকে পাড়া-কমিটিতে এনেছি। দেখি, এখন কি করা যায়।

বাউলে চুপ করেই শোনে। হয়ত একটা গানের কথা মাধুরীর এক একটা কাহিনী শেষ তেই তুলবার চেষ্টা করে। তখনই মাধুরী হয়ত বলে ওঠে,—পারবে না, পারবে না উলেদা ঐ বাঘটাকে তুমি শেষ করতে? বলেই বাউলেদার মুখের ও কপালের রেখাগুলি ঝবার চেষ্টা করে নিজের চোখ একবার এপাশ একবার ওপাশ নাড়িয়ে নাড়িয়ে।

দুরন্ত শিকারী বেদে বাউলেও যেমন করে গভীর বনের বাঘের আক্রমণের মতলবকে ঝবার চেষ্টা করে নিঃসাড়ে, এখানেও মাধুরীর কোন কথার উত্তর না দিয়ে একমনে নিস্তব্ধে চাখের উপর চোখ মেলে ধরে বুঝবার চেষ্টা করে মাধুরীকে—কেমন করে সে র্ঙ-মানুষকে আগল দেবার চেষ্টা করছে বাঘের দাপটের বিরুদ্ধে।

তেরো

ক ভেবেছিলো, সেই বাঘের দাপটের কবলে পড়তে হবে মাধুরীকেও। তবে সুন্দরবনের ঘ নয়। মানুষ-বাঘ বলা যেতে পারে। বিপ্লবী নক্সালদের কবলে। খাল-পাড়ের সর্দার ড়ির কয়েকটি ছেলে কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়ে। তাদের একজন পড়াশুনায় বেশ লো, সুযোগও পেয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার। সেটাই হলো কাল। এই লেজেই তখন নক্সাল বিপ্লবীদের এক প্রধানতম আড্ডা। অল্পদিনের মধ্যে সে দলের কজন সাক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠে। বয়স আর কতো হবে, একুশ-বাইশ।

ইংরেজ আমলে স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবীরা যেমন দেখতে ছিলো, এরাও তেমনি। যন আগুনের টুকরো। কথা বিশেষ বলে না, কিন্তু চোখে-মুখে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে াকে। আর চলনে-ফেরনে অদম্য কর্মচঞ্চলতা যেন ফেটে পড়তে থাকে। এ জিনিস ঘটে রের কাঠামোর দরুন নয়; ঘটে, মনের এক অতুলনীয় আত্মবিশ্বাস এবং আদর্শের প্রতি ঢ় আনুগত্যের জন্য। জীবন-মৃত্যু যেন এদের পায়ের ভৃত্য। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যন এরা বলতে পারে—'নিঃশেষে যে প্রাণ করিবেক দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' ন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে সৃষ্টি করেছে এদেশের প্রকৃতি, এ দেশের মাটি; তমনি যুগে যুগে এই জাতের বিপ্লবীদেরও সৃষ্টি করেছে—বাঙলাদেশের প্রকৃতি ও মাটি।

সে সময়ে নক্সালদের নীতি ও দায়িত্ব ছিলো শত্রুর এক একটাকে প্রথম সুযোগেই য-কোনোভাবে খতম করা। শত্রু হলেই তার বাঁচবার কোন অধিকার নেই। সমাজের গাটা শত্রুদলকে যখন একই সঙ্গে নিধন করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন একটা একটা করেই ারো। কৃষকদের প্রধান শত্রু কে? জোতদার ও মহাজন। সত্যিই তো, এরাই না কৃষকদের জোঁকের মতো রক্ত শুষে শুষে আধমরা করে ফেলছে। অতএব, খুবই সরল নীতি—এই ব শত্রুকে মারো, একটা একটা করে শেষ করে দাও, আর তাদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নাও। সর্দার বাড়ির ছেলেটিও এই অমোঘ মন্ত্রে দীক্ষিত। সঙ্গীদের বললো,—তোরা

কলকাতার শত্রু খুঁজে পাচ্ছিস না, চল্ আমার গ্রামে। দেখবি সেখানে কতো মহাজন আ
চক্‌দার পাবি। চল্।

এই সূত্রেই তিনজন নক্সাল এই অঞ্চলে আসে। এসেই পথ কিছুটা চিনে এক মহাজনকে খুন করে। ওরা জানতেও পায় না যে এই খুনের মধ্যে কোনও শরিকী বিবাদ জড়িত আছে কিনা। তার চেয়েও বড়ো কথা—ঠিকই মহাজনেরা চাষীর রক্ত শুষে খায়; কিন্তু এটাও ঠিক, গরীব চাষীরা কাজের সুযোগ পেতে কার কাছে টাকার জন্য হাত পাতবে? তারা বো বোঝে তাদেরই নিঙড়ে মহাজনেরা স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে, তবু তারা ভাবে, আর কি না হোক দিনে একবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য এই মহাজনেরা তাদের সুযোগ করে দিচ্ছে, আর কেউ তো এটুকুও করে না।

কাজেই এই খুনীদের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে এই তিনজন নক্সালকে তারা পিটিয়ে তাড়ায় তাদেরই যারা মুক্তি দিতে এসেছিল তাদের নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করা হলো।

ফলে বেশ কিছুদিন নক্সালী অনুপ্রবেশ এখানে বন্ধ হয়ে যায়। আবার তারা এসেছে এসেছে তাদের ধৈর্যের জোরে, এসেছে সুন্দরবনের টানে। বনবাদাড়ের রাজ্য, অসংখ্য নদী-নালার জাল এবং সবার ওপরে অসংখ্য গরীব চাষীর লড়াকু মানুষ সব। এদের সার জীবনটাই লড়াই করে চলে। জীবন-মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, বাঘের ও কুমিরের মুখোমুখি হয়ে, ঝড়-জলের দাপটকে অগ্রাহ্য করে, তেষ্টার জলের দুর্ভিক্ষকে অবহেলা করে লোনা জলের মধ্যে দাপাদাপি করে এরা জীবন-যুদ্ধ চালায়। কাজেই এমন সুফলা মাটি আর কোথায় পাবে এই বিপ্লবীরা!

এবার মাধুরীর কর্মচাঞ্চল্য ও উৎসাহ দেখে নক্সালেরাই আগে বেড়ে যোগাযোগ করেছে। নক্সাল দলে যোগ না দিলেও, এদের প্রতি প্রথম থেকেই মাধুরীর অসীম শ্রদ্ধা জাগে।

নক্সালরা তাদের দলের মধ্যে অলীক নাম রেখে পরস্পরকে ডাকে। কেউ কারো আসল নাম জানে না। নাম জানলেও কোনোকালেই তা উচ্চারণ করা কড়া নিষেধ। একবার কিছুদিনের জন্য এ অঞ্চলে এক নেতা আসেন। তাঁর অলীক নাম ছিলো—কর্ণ। মাধুরীকে ডেকে এক ডিঙিতে ছইয়ের আড়ালে বসে বলেন, —জানো মাধুরী, আমাদের দলে কিরকমভাবে চাষী মেয়েরা এগিয়ে এসেছে?...

কথা শেষ করতে না দিয়েই মাধুরী বলে,—পুরুষের মতো মারপিট করতে পারে নিশ্চয়? তাই তো?

—না, মারপিট নয়, তারা শত্রুকেও নিজের হাতে খতম করতেও দ্বিধা করেনি। জানো গোপীবল্লভপুরে আমাদের এক চাষীর মেয়ে যে-সাহস দেখিয়েছে তা ভাবতেই পারবে না। ছোটো ধারাল অস্ত্রে সে এক পুলিশের গলার নালি পলকের মধ্যে ছিন্ন করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার রাইফেলটাও ছিনিয়ে নিয়ে আসে। এতো সাহস ছেলেরাও দেখাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

মাধুরী ডিঙির পাটাতনের ওপর কিছুক্ষণ চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে রইলো। তারপর মাথা উঁচু করে গোমর নদীর ওপারে সজনেখালি বনটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দ্যাখে। এক রাশ সাদা-কালো পাখায় দূর চক্রবালে ভাসন্ত কাকপাখির মালার দিকে দৃষ্টি ফেলে তন্ময় হয়ে যায়। বন দেখলেই ওর জীবনের বনমালির ছবি ভেসে ওঠে ওর মনে। পারবে সে? পারবে ওর জীবনে অমন সাহসী কৃষক-রমণী হতে?

চমকে ওঠে মাধুরী কর্ণের প্রস্তাব শুনে। ধাতস্থ হবার কিছুটা সময় দিয়ে কর্ণ সোজাসুজি

মোহগ্রস্ত কৃষক-যুবতীকে প্রস্তাব দিলেন,—পারবে ? পারবে তুমি ? আমরা শুনেছি বেদে বাউলের কাছে একটা বন্দুক আছে। সেটা তোমার আদায় করে দিতে হবে—যে-কোনও ভাবে আদায় করতে হবে। পারবে না ? শুনেছি তুমি তার খুব ঘনিষ্ঠ। পারবে না তুমি ?

মাধুরী চুপ করেই থাকে…

—আর যদি কোনও ভাবে না পারো, তাহলেও বন্দুকটা আমাদের চাই-ই। সোজা পথে না হলে আমরা ভিন্নপথ……

বাকি কথাটা মাধুরী যেন কিছুতেই শুনতে চায় না। সটান ছইয়ের বাইরে পা বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললো,—দেখি, দেখি কি করতে পারি।

বলেই সরু ডিঙিখানির দুপাশের ডান ও বাঁয়ের শুরোর ওপর ডান ও বাঁ পা ফেলে ফেলে মাধুরী দ্রুত নেমে আসতে চায়। চলার ধরনে ও ছন্দে গোটা ডিঙিও দুলে দুলে ওঠে। সেই দোলনে ও ছন্দে আপন দেহ দুলিয়ে মাধুরীও তার দোলায়িত মনকে যেন প্রকাশিত করলো। সাতজেলের মাটি স্পর্শ করতেই মাধুরী এবার স্থিতধী। স্থির করে ফেললো, এবার সে বাউলেদাকে একবার বলবে, তারপর যা করা তা তো বাউলেদাই করবে।

স্থির করলো বটে, সে-দিন ও সে-রাতেও মাধুরীর মনের অস্থিরতা চলে—কেমন করে সে বলবে বাউলেদাকে তার অস্ত্র দিয়ে দিতে ! বাউলেদাকে সে যেন নিরস্ত্র করতে চায় না। বনে সে যায়নি। বন্দুকের গল্প বাউলেদা কখনও তার সামনে করেনি। তাহলেও সে তো জানে—বনের যে কোনও বিপদে সবাই বাউলেদাকে ডাকে। আর সে কিনা সেই বাউলেদাকে নিরস্ত্র হবার কথা বলবে। কেমন করে সে এতখানি বেইমানির কাজ করতে যাবে…ভেবে ভেবে কূল পায় না মাধুরী। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে রাঙাবেলে যাবার আগে গোসাবার পথ ধরেছে। সবুরকেও সঙ্গে নিয়েছে। দুজনেই হনহন্ করে চলেছে। দিদির মনটা বে-মনা দেখে সবুরও কোনও কথা পাড়েনি গোটা রাস্তাটায়।

জায়গামত এসে ছিলে-ভেড়ির ওপর সবুরকে দাঁড় করিয়ে বাউলেদার বাড়ি একাই ঢুকতে চাইলো। সামনে দুদিকেই খানিকটা ধানী ক্ষেত। ধানের শীষ মাথা উঁচু করে ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলছে। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে একটা ছিলে ভেড়ি। ছিলে ভেড়িটা সোজা চলে গেছে বাউলেদার বাড়ি।

ছিলে পথে একটু এগুতেই বাউলে দেখতে পেয়ে প্রায় ছুটে এসেছে। সবে চান্ করে রুদ্রাক্ষ মালা পরে কপালে, বাহুতে ও প্রশস্ত বুকে কাপালিক সন্ন্যাসীর মতো ডগডগে লাল চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রলাঞ্ছন কাটা হয়ে গেছে। হন্তদন্ত হয়ে ছিলে-ভেড়ির মাঝখানে হাজির হয়ে বললো,—কি ব্যাপার মাধুরী, এমন সময়ে তোমার আবির্ভাব !

—না, এমনি এলাম। আচ্ছা বাউলেদা, তোমার তো একটা বন্দুক আছে ?

—আছেই তো, কিন্তু সে বন্দুক আমার কি করে হলো তা কি জানো ?……

সে-কথা শুনতে আসেনি আজ মাধুরী। বাউলেদাকে থামিয়ে দিলো বটে, কিন্তু নিজেও থেমে গেছে। বলতে গিয়েও বুঝি বলতে পারে না।

বাউলে প্রায় দাবড়ি দিয়ে বলে,—বলো ! কি বলতে চাও।

—জানো, গতকাল এক নক্সাল নেতা, খুব বড় নেতা, আমার সঙ্গে অনেক গল্প করে শেষমেশ বলেন, ঐ বন্দুকটা তোমার দিয়ে দিতে হবে ওদের। আর নাকি আমাকেই আদায় করতে হবে তোমার কাছ থেকে।

—কেন, বন্দুক নিয়ে ওরা বনে উঠবে ? বাঘ মারবে ?

—না, না, বাঘ মারতে নয়।

—তবে কি মানুষ মারবে!—বাউলের কণ্ঠস্বর এবার দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

মানুষ মারার কথা যে মাধুরীর মনে এর আগে উঁকিঝুঁকি মারেনি তা নয়। কিন্তু এমন সোজাসুজি প্রশ্ন তোলাতে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। বাউলের গলার স্বরেও আরও বেশি করে ঘাবড়ে যায়।

বাউলের দৃঢ় কণ্ঠে যেন আদেশের সুর,—চলো এখানে নয়, বাড়িতে এসো।

বাউলে আগে আগে। পায়ে কাঠের খড়ম। বাড়িতে বাউলে কাঠের খড়মই পরে। বনে অবশ্য খালি-পা। খড়মে চটাং চটাং শব্দ। এ-তো গানের তালের শব্দ নয়। এ এক দৃঢ় পদক্ষেপের দাপটি। মাধুরী যেন বুঝে নেয়—হবে না, কিছুতেই কোনও আবেদন খাটবে না। বাউলের পিছু পিছু চলতে চলতে আরও ভাবে, বন্দুক না দিলে কি বিপদ হতে পারে সেটাও বাউলেদাকে আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত হবে নিশ্চয়।

উঠোনে এসে বাউলে ডেকে বললো, —মা, দ্যাখো কে এসেছে! দ্যাখো!

অতি বৃদ্ধা মা কোনমতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন হাতনেতে। তারপর কম্পমান হাত বুলিয়ে মাদুরের ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বললেন, —বসো মা, বসো মা লক্ষ্মী।

ওরা দুজনে উঠোনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা পাড়ে।

—দ্যাখো বাউলেদা। তুমি তো সবই জানো নক্সালদের কাণ্ডকারখানা।

এবার বাউলে রীতিমতো গর্জে ওঠে,—সবই জানি। তোমরা ভাবছো বন্দুক আমার বাড়িতেই থাকে। কক্ষনো রাখি না বাড়িতে। সে-বন্দুক যেখানে আছে, আর যার জেম্মায় আছে, পারে তো সেখান থেকেই নিয়ে আসে যেন ওরা। বুঝবো ওদের হিম্মত! সে-বন্দুক আছে গভীর সুন্দরবনে। পথটাও বলে দিতে পারি। তোমাকেও বলে দিচ্ছি, শুনে নাও ভাল করে শুনে নাও—প্রথমে গোমর নদী দিয়ে পঞ্চমুখানি খাল সবটাই ফুঁড়তে হবে, তারপর পাবে বড় চামটার খাল, সেটাকে ডাইনে রেখে ছোট চামটা খালে ঢুকতে হবে, তারপর এই খালের পাঁচ বাঁক ভাটিতে গিয়ে দেখবে একটা পাশ-খাল, সেই পাশখালের তিন বাঁকের মাথায় মালোতে উঠতে হবে, সেখান থেকে উত্তরমুখো একটা শিষে ডিঙিয়ে দুশো কদম এগিয়ে দেখবে কয়েকটা বান গাছ, সেই বান গাছের চতুর্থ গাছটায় একটা খোঁড়ল আছে। এই ঘেরে কিন্তু দেখে-শুনে এগোয় যেন। বাঘের বড্ড আনাগোনা, জায়গাটার নাম পীরখালির বন।

বাউলে আরও বলে,—কিন্তু বন্দুকটা কার জেম্মায় আছে জানো? আছে এক কালনাগিনীর জেম্মায়। এক কালকেউটে তার বাচ্চা-টাচ্চা নিয়ে আমার বন্দুকের খোঁড়লে বাস করে। ওরা গেলে যেন সাবধানে যায়।

মাধুরী এতোক্ষণ থ মেরে হাঁ করে শুনছিলো। সুন্দরবনের উপকূলবাসীদের সাতজেলের মেয়ের কাছেও বুঝি বনের অলিগলি নদী-পথকে গোলকধাঁধার মতো লাগে। বুঝেই বাউলে বলে,—তা না হয় আমিই পথটা এগিয়ে দিয়ে আসবো, কিন্তু বাঘের ও সাপের আক্রোশ থেকে তাই বলে ওদের রক্ষা করতে পারবো না। সেই বুঝে আমাকে ডাকে যেন।

বড়বড় চোখে বাউলে মাধুরীর চোখের উপর দৃষ্টি হেনে আছে। দম নিয়েছে বাউলে। এবার ফুলে ফুলে বলে,—আর যদি আমাকে মারতে চায়, আসে যেন পরখ করতে সুন্দরবনের বাঘের বাউলের কি তেজ! ভাবছো, ওদের পিস্তল আছে, তবে আর কি!! জানো মাধুরী, তোমাকে কোনওদিন বলা হয়নি, আমার মিলিটারি ট্রেনিং নেওয়া আছে। পিস্তলের নিরীখ কি করে গোলমাল করে দিতে হয়, তা আমার জানা। আসে যেন আমাকে

মারতে !!

উত্তেজনায় থরথর করে হাত কাঁপছে, বিস্ফারিত চোখের চাহনিতে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরোয়। দাঁত কড়মড় করে আবারও বলে,—আসে যেন আমাকে মারতে !!

বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনায় গুম্ মেরে থাকে। কয়েক লহমা কেটে যাবার পর শান্তভাবে ক্ষোভের সুরে বাউলে বলে,—মাধুরী ওরা ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ। দু-চারজন জোতদার আর মহাজন মেরে কি সমাজে পরিবর্তন আনা যায়। তাই যদি হতো তাহলে আমাদের সুন্দরবনের বাঘগুলিকে একবার মহাজনদের চিনিয়ে দিতে পারলেই তো কাম হতে হয়ে যেতো। আসলে সব মানুষ মিলেঝুলে একটা কিছু করতে হবে। তা না হলে হয় না, হবেও না।

এদিকে বৃদ্ধা মা এসেছেন এক হাতে খুঁচিতে দুটো খই-মোয়া আরেক হাতে এক ফেরো জল। ফেরোটা কাঁপছে। অস্থির জল দেখে মাধুরী তাড়াতাড়ি নিজের হাতে ফেরোটি নিয়ে উঠোনেতে রাখলো। আর একটা মোয়া দাঁতে কামড়ে ধরে অন্য হাতে আরেকটা নিয়ে নিলো। নিয়েই বললো,—বাউলেদা, আর বলতে হবে না। যা বুঝবার বুঝে নিয়েছি। আমি এবার চলি। আসছে সপ্তাহে গানের আসরে দেখা হবে, তখন অন্য সব কথা হবে, আজ চলি।

বলেই একটা মোয়া বাঁ-হাতে নিয়ে অন্যটা খেতে খেতে হনহন্ করে ছিলে-পথ ধরলো।

বৃদ্ধা মা দূর থেকে থোবলা গালে বললেন,—ভারি লক্ষ্মী মেয়েটা। সেদিন সেই গানটা কি মিষ্টি করে গেয়েছিলো !

—জানো মা, সে গানটা কে শিখিয়েছিলো ওকে ?

—জানি, জানি, তুই ছাড়া আর কে শেখাবে ? তো তুই শুধু গান শিখিয়েই গেলি, তুই একটা অপদার্থ !!

আবার গানের আসরে ঠিকই ওদের দেখা হয়। দেখা হলেও আসরে কোনও কথাই হয় না বন্দুক নিয়ে। শুধু বাউলের চোখাচোখি হলে মাধুরী মুচকি হাসে। আসর থেকে বেরিয়ে খালজেলের রাস্তায় পড়লে মাধুরী কথাটা পাড়ে। কথা পাড়বে কি, হেসেই খুন। হো-হো করে শুধু হাসে।

বাউলে ভাবে, মাধুরী কি পাগল হয়ে গেল ! বলে,—বলোই না কি হলো ?

—কি আর বলবো !—আবার হো-হো হাসি। এবার বুকে হাত দিয়ে দম নিয়ে বললো,—জানো বাউলেদা, আমি সব বললাম, তুমি যা যা বলেছিলে সব বললাম বর্ণদাকে। কালনাগিনীর কথাটাই ওদের মনে লেগেছে। ওরা তো বাদার বাঘকে দ্যাখেনি এখনও। বারবার কালনাগিনীর কথাটাই জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্ন করলো—আচ্ছা, বাউলে তো মিছে ভয় দেখায়নি ? আমি বললাম,—না, না, বাউলেদা আর যা করুক, মিথ্যে কথা বলে না ; মিথ্যে বললে যে বাউলেগিরি করা যায় না। বন নিয়ে যারা মিথ্যে কথা বলে, তাদের বনে নিস্তার পেতে হয় না। বনবিবি কখ্‌খনো তাদের ক্ষমা করে না। কেন, বাউলেদা তো তোমাদের সঙ্গে করে জায়গাটায় পৌঁছে দেবেন বলেছেন, কিন্তু বাঘ ও সাপের হাত থেকে বাঁচবার তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। বলো, তোমরা যাবে কি না ?

মাধুরীর কথোপকথনের কাহিনী শুনতে শুনতে বাউলে কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেছে। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলো এক তেমাথায়। বাউলে দূর আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন একটা ছবি দেখছে। ছবি ভেসে ওঠে ওর মনেও—সেই বিগতদিনের ছবি, বিলাসবাবুর

দোকানে টাঙানো সন্দুকটির মৃদু দোলানি ; আবাদি নদীর দমকা হাওয়ার দোলানি।
মাথায় ছোট্ট ঝাঁকানি দিয়ে বাউলে তার মন থেকে ছবিটি সরিয়ে দেয়। বলে,—বলো, তোমাকে শেষে তোমার কর্ণদা কি বললো ?
—কর্ণদা চিন্তিত হয়ে বললো, ভেবে দেখে তোমাকে পরে জানাবো।

এরপর বেশ কিছুদিন সব চুপচাপ। নক্সালদের আর কোনও হদিশ মেলে না। আরও কয়েক মাস পরে শোনা যায় পুলিশ দলে-দলে এসে সাতজেলে ও আশপাশে যতোগুলি জেলে-পাড়া ছিলো—বাণীপুর, তারানগর ও মোল্লাখালিতে তারা তন্ন-তন্ন করে খোঁজে নক্সালদের সর্বময় এক নেতাকে। কিন্তু কিছুই পায়নি, কাউকেও পায়নি।
নক্সালরা তাদের আদর্শে না হলেও চরিত্রবলে অনেকের মন জয় করেছিলো। কলকাতার মতো বিশালকায় শহরের সংলগ্ন না হলেও অন্তত সহজ নদীপথে সন্নিকটে বলে সেই শহরের একটা ছন্নছাড়া ঢেউ আছড়ে পড়েছিলো এই বন-বাদাড়ের দেশেও।

চৌদ্দ

নক্সালেরা উধাও হবার পর মাধুরী যেন অধিকতর উৎসাহ নিয়ে সাতজেলের সমবায় কাজে, বিশেষ করে বিধবাপল্লীর পাড়াকমিটির কাজে মেতে ওঠে। বাউলেও গানের আসরে সময় পেলেই আসা-যাওয়া করে। আর বাউলে এলেই মাধুরী বাড়ি যাবার পথে সারাক্ষণ বাউলেদার সঙ্গে বক্‌বক্ করতে করতে যায়। অবশ্য বেশিদূর নয়। কেননা, গোসাবার পথটা খানিকটা এগিয়েই ডান দিকে চলে গেছে। সে-মোড় এলে বাউলে একটা হাসিঠাট্টার কথা তুলে গোসাবার পথ বেয়ে চলে যায় দ্রুত। এই দ্রুততা তার মনের কোন আবেগকে অবরুদ্ধ করার মানসে মনে হয়।
সাতজেলের বিধবাপল্লীর কথা উঠলেই মাধুরীর বকবকানির সামনে বাউলে চুপচাপ থাকে। কি যেন এইসব কাহিনী থেকে খুঁজে পেতে চায় নিজের অজানিতেই। শেষ পর্যন্ত কয়েক বছর পরে এবার বুঝি বাউলের ওপর মাধুরীর প্রভাব পড়বার পালা। মনে মনে ভাবে,—কেন, আমিও তো গোসাবায় একটা বিধবাপল্লী গড়ে তুলতে পারি। এটা তো হেমিল্টনেরই মনোবাঞ্ছা ছিলো নিশ্চয়। নিশ্চয় ছিলো। ওর গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে। গভীর বনে গাছের ডালে বসে বাঘের সন্ধান মিলতেই যেমন করে ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। একই শিহরণ সে এখন অনুভব করে যেন।
গোসাবার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বাউলের আস্তানা। কয়েক পা এগিয়ে গেলেই উঁচু ভেড়ি দিয়ে ঘেরা দুগ্যোদোয়ানী নদী। অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমে আরও কিছুটা এগুলে প্রশস্ত গোসাবা নদী। তার ওপারেই বাদা শুরু। দূর থেকে দেখাই যায় হেঁতাল গাছের ঘন ঝাড়ের সবুজ-হলুদ মেশানো আবছায়া রেখা। এখানে এসেই বিস্তীর্ণ ও খরতর জলস্রোত ডাইনে বাঁক নিয়েছে। ফলে বাঁয়ে এপারে গোসাবাকে ঘিরে বহুদিন থেকে একটু একটু করে দীর্ঘ চর দেখা দিচ্ছিলো। এবছর শুধু পলিমাটিই জাগে নি, ধানীঘাসও চরের ওপর মাথা তুলেছে। নতুন বসতি করার কথাও উঠেছে। শুধু মাধুরীর প্রভাব বললে হয়তো ভুল হবে, বাদার নদীর এই অবদানেরও প্রভাব কম নয় বাউলের বিধবাপল্লী গড়ে তোলার কামনা ও বাসনার পেছনে।
কিন্তু গোসাবার গায়ে নতুন জমি তৈরি হলে হেমিল্টন এস্টেটের স্বাভাবিক মালিকানা

ার্তায়। কোনও দেরি নয়, বাউলে বিধবাপল্লীর নামে এস্টেটের কাছ থেকে জেলেদের বিধবা সংসারগুলির মধ্যে খণ্ডে-খণ্ডে বন্দোবস্ত করার কাজ শুরু করলো। এই জমি বন্দোবস্ত করাতে গিয়ে ধনী-চাষী ও মহাজনদের বেনামে কিছুখণ্ড দখলের যে প্রলোভন ও কূটচালের চক্রান্তে বাউলে পড়ে তাতে তার পক্ষে দ্রুত পাড়া-কমিটি গড়ে তোলা ছাড়া পথ থাকে না। এ বিষয়ে মাধুরীর সাহায্য ভিক্ষাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অনিবার্যের কথা বাউলের মনের গভীরে প্রথম থেকেই সুপ্ত ছিলো কিনা কে বলতে পারে! তা না হলে বিধবাপল্লী গড়ার স্বপ্ন মনে জাগতেই তার দেহ ও মনে অমন শিহরণ জাগবে কেন সেদিন!

দেখতে দেখতে গোসাবার বিধবাপল্লী গড়ে উঠেছে। বিধবাপল্লী মানে শুধু বিধবাদেরই নয়; তাদের ভাই-ব্রাদারও সব সঙ্গে আছে, হয়তো বা তাদের কারো কারো নতুন মিনসেরাও সঙ্গে আছে। প্রথমেই ওরা দীর্ঘ রিঙ-ভেড়ি দিয়ে লম্বা একফালি জমি চর থেকেই কেড়ে নিলো। চরের মাটি দিয়েই চরকে যেন ঘিরে ফেললো। জমি একটু শুকনো হতেই ছোট ও বটে দোচালা খুপরির আস্তানা উঠতে থাকে। আসে উঠোন, আসে তুলসীতলা, আসে এ-একটা দেশী ফুলের গাছও। দেখা যায় লম্বা লম্বা বাঁশের আড়—ওদের ছোট-বড়ো জাল শুকুবার ব্যবস্থা। চরে শক্ত খুঁটিও পোতা হয়ে গেছে—ওদের ডিঙি নিশ্চিন্তে বেঁধে রাখতে। নানা চর নাতি দীর্ঘ জায়গা জুড়ে সরগরম হয়ে উঠতে বেশিদিন লাগে না।

কিছুদিন কাটবার পর হঠাৎ এক সকালে মাধুরী এসেও হাজির। বিধবাপল্লীতে যাবার একটা পথ বাউলের উঠানের ওপর দিয়েই ছিলো। মাধুরী বাউলেদাকে সঙ্গে নিয়ে পল্লীতে যাবে বলেই এই পথ বেয়েই এসেছে।

আসতেই বাউলে স্মিতহাস্যে আর ত্রস্তপায়ে এসে বলে,—দ্যাখো মা, আমাদের বাড়িতে কে এসেছে!

মা রান্নার হাঁড়ি নামিয়ে দরজার ঝাঁপ ঠেলে মুখ বাড়িয়ে বললেন,—ও-মা, মাধুরী! ও তো আমাদের বাড়িতে আসেনি। আমি বুঝেছি, ও এসেছে পল্লীতে। তা এসো, এসো।

মায়ের খোঁটার জবাব এড়িয়ে মাধুরী বলে,—তা বাউলেদা, চলো আগে তোমার বিধবাপল্লী ঘুরে আসি। এতো লোক এসেছে তোমার আশ্রয়ে! তা সেদিন ওরা-মাসি কি বলছিলো জানো! আমি শুধেছিলাম, তা এতো লোক ভিড় করেছে কেন গোসাবার বিধবাপল্লীতে? তা ওরা কি বলে জানো! বল্‌না সবুর বাউলেদাকে···

সঙ্গী সবুরকে বলার অবকাশ না দিয়ে মাধুরী বকে যায়,—জানো, বলছিলো, বেদে বাউলের ভরসায় আমরা এসেছি; আর বেদে বাউলে আমাদের এপারের মহাজনদের ঠেকাতে না পারুক, ওপারের বাদার মহাজনকে তো ঠেকাতে পারবে। সেই বা কম কি!

বেদে সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটে,—তা এপারের মহাজনকে ঠেকাতে তো তুমি আছো। তুমিই ঠেকিও।

—বাঃ, বোঝাটা আমার ঘাড়েই দিয়ে বসলে, বাউলেদা! তা চলো, এবার পল্লীতে যাই।—আর মাচার উপর লিক্‌লিকে পুঁই ডগার ঝাড় দেখতে দেখতে মা-কে ডেকে বললো,—মা, আমরা ঘুরে আসি, ঘুরে এসে তোমার হাতে চচ্চড়িটা খেয়ে যাবো। শুনেছি তোমার হাতে পুঁই-চচ্চড়ি নাকি অপূর্ব। বেশি ঝাল দিওনা কিন্তু···

বলতে বলতে বাউলেদাকে এক রকম টেনে নিয়েই চললো পল্লীমুখো!

বিধবাপল্লীতে গিয়ে ওরা তখন কি কাজ করবে সে-কথা বাউলেও যেমন জানে না, মাধুরীও তেমনি জানে না। দুজনেরই ইচ্ছা একটা পাড়া-কমিটি করতে হবে—এই মাত্র।

মাধুরী এসে শুধু বাড়ি-বাড়ি ঘোরে। খোঁজ নেয় কজন মানুষ আছে এক-একটা সংসারে,

কজন সামর্থ পুরুষ বা কজন কর্মক্ষম মেয়েরা আছে। কার কিরকম সঙ্গতি আছে তাও আন্দাজে ও চাল-চলনে সমীক্ষা করে নেয়। ঘুরতে ঘুরতে বেলা গড়িয়ে গেছে। সবাই প্রশ্ন করে—দিদিমণি এখন কি করতে হবে?

উত্তরে মাধুরী বলে,—তা আমি জানি না, কি করতে হবে তা তোমরাই ঠিক করবে। সেজন্যই তো সভা ডাকা হয়েছে পরের সপ্তাহে বুধবারে। সেদিন যেন সবাই হাজির থাকে। সভা হবে ভজহরির বাড়িতে, দেখলাম বেশ গোবর দেওয়া বড়ো উঠোন আছে ওদের।

—শুনলাম, পাড়া-কমিটি করবে।—অনেকে জানায়।

সবাইকে মাধুরী একই উত্তর দেয়,—সে করবে তো তোমরাই, তোমরা যদি সবাই চাও তো হবে। আর সে পাড়া-কমিটি কি করবে, তাও তো তোমরাই ঠিক করবে। আমি কিচ্ছু জানি না। সত্যি বলছি কিচ্ছু জানি না।

আবারও তারা প্রশ্ন করে,—সে পাড়া-কমিটিতে কারা থাকবে?

—তাও আমি জানি না। তাতো তোমরা সবাই ঠিক করবে। আমরা তো এই নিয়মেই সাতজেলে চলি। জানো, রাতভোর বসে-বসে তারা সব কিছু একমত হয়ে তবে কাজ করে।

—তা বাউলেদা তো আছে, সেই সব কিছু ঠিক করে দিতে পারবে।

—না, তা হয় না। বাউলেদা মোটেই কিছু করবে না। যা কিছু করার তা তোমরাই করবে—বেশ জোর দিয়েই মাধুরী বলে।

—এইভাবে কি কিছু করা যায়?—গুঞ্জনে প্রায় সবাই প্রকাশ করে।

মাধুরী যেন ঝলসে ওঠে। ঝাঁঝালো ঝঙ্কারে গুঞ্জনের প্রত্যুত্তর দেয়—যায়! নিশ্চয় যায়!!

পনেরো

বাদার বসন্ত। বসন্তে সবারই মন আনচান করে। গাছ-গাছড়া কচি সবুজে ভরে ওঠে। জীবজন্তুও একে অপরকে কাছে পেতে চায়। পাখিকূলের কাকলী যেন আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে। মৌমাছিও মধু আহরণে ও মনোহারি গুঞ্জনে অধিকতর ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মানুষও স্থির থাকতে পেরে ওঠে না। বিধবাপল্লীর মানুষেরাও চঞ্চল হয়ে ওঠে শিকারের সন্ধানে, মধু আহরণে আর সুন্দরবনের অঢেল সম্পদের টানে।

বেশ কিছুদিন ওরা এটা-ওটার সমস্যা মেটাতে পাড়া-কমিটি প্রয়াস করে যাচ্ছে। এমন সময়ে চৈৎ মাস এসে হাজির। এই মাসে জমির কাজ যেমন কমে আসে, তেমনি মাছ-ধরার হুল্লোড়ও খানিকটা নিস্তেজ হয়ে আসে। এই সময়ে থাকে অবশ্য ভেড়ি মেরামতির হিড়িক। তা ওদের আর কতটুকুই বা ভেড়ি। কাজেই হালকা মনে ওরা এই সময়ে মধু ভাঙতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মধু দিয়ে এরা বৎসরান্তে মিষ্টিমুখ করতে অভ্যস্ত।

এই তোড়জোড়ে যুবক ভজহরিই সবথেকে বেশি উৎসাহী। ভজহরি এক অদ্ভুত যুবক। দেখতে কালো মিশমিশে। গোঁফদাড়ি উঠতে না উঠতেই চেহারা যেমন লম্বা-চওড়া হয়ে উঠেছে, তেমনি দেখলেই মনে হবে অসীম শক্তিধর। মুখে কথা কম। নেহাৎ দরকার না হলে কথাই বলে না যেন। তবে বিনয়ের অবতার। শক্তিধর অথচ বিনয়ী—ধরে নেওয়া যেতে পারে এমন যুবক সাহসী না হয়ে যায় না। তাতেই বিধবা মায়ের চিন্তার অন্ত ছিলো

না, কখন কি জানি কি করে বসে!

বাউলেদার বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভজহরি তাকে রাজি করিয়েছে ওদের মউলিদলের বাওয়ালি হতে। তারই হাতে গড়া বিধবাপল্লীর ছেলে-ছোকরার দল, রাজি না হয়ে কি উপায় থাকে। সবই তো হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত মা-র কাছে কথাটি পাড়েনি। কিন্তু মা-র শুভেচ্ছা না নিয়ে বিপদসঙ্কুল কাজে যায় বা কি করে।

—মা, দাওনা আমাকে যেতে। তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই। কতো মানুষ আজ বনে উঠবে জানো! প্রায় জনা বিশেক আমরা। বাউলে-দাদা, বেদে বাউলেও সঙ্গে থাকবে।

—না, তা হয় না। তোর যা গোঁ, কি দিয়ে যে কি করে বসবি তার কি ঠিক আছে। বনবিবির গোঁসা হলে কি আর রক্ষে আছে।...বলেই মা হঠাৎ থেমে গেলেন। ভজহরি যে মায়ের বায়নাক্কার কাছে আজ এক মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছে।

—কি বললি? বেদেও সঙ্গে যাবে?... যা, যা ইচ্ছে করগে!...বেদেকে বলবি, আমিই বলেছি একথা বলে বলবি, সাঁজের শাঁখ বাজার আগেই যেন সবাই ফিরে আসে।

—মা, তুমি দেখি কিচ্ছু জানো না! বনে সন্ধ্যের অনেক আগেই আঁধার ঘনিয়ে আসে, তাও জানো না।

—না জানি, না জানি! তুই বাউলেকে বলবি, আমি বলেছি একথা।

এমন সময়ে বেদে বাউলে নিজেই এসে হাজির। এসেই ভজহরির মা-র পাশে বসতে বসতে বললো,—মা, জানো, 'রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে?'—বাদায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে কেষ্ট মানে কিন্তু বনবিবি। বনবিবির দয়া হলে কেউই মারতে পারবে না। ভজহরির কাছে এটা প্রায় বীজমন্ত্র। সেকথা স্মরণ করেই বাউলে এই নির্ভয়বাণী মা-র কাছে বসে উচ্চারণ করলো।

এ এক অতি সাধারণ প্রবাদ বাক্য সারা বাংলায়। সুন্দরবনের আবহাওয়ায় এসে এই আপ্তবাক্য যেন সংগ্রামী বীজমন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। মনে হতে পারে, এই ধ্বনি তো অনিবার্যরূপে মানুষের মনকে নির্বীর্য করে দেয়—দৈবের ওপর ধীরে ধীরে তাকে একান্ত নির্ভরশীল করে তোলে, মানুষের উদ্যোগ নেবার ক্ষমতা বুঝি বা স্তিমিত করে আনে।

হয়তো তাই। কিন্তু সুন্দরবনের কোলে বসবাসকারী মানুষকে সংগ্রামী না হয়ে তো কোন উপায় নেই। খরস্রোতা নদী, গভীর বনাঞ্চল, জোয়ারের প্লাবনকারী উত্তুঙ্গ ঢেউ, প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার দাপট, বিধ্বংসী ঝড়-ঝাপটা, আর সর্বোপরি ডাঙার ও জলের হিংস্রতম জীবের মুখোমুখি না হয়ে তো জীবিকা অর্জন করাই শুধু দায় নয়, বেঁচে থাকাও দায়।

ফলে এই ধ্বনিকে, এই মন্ত্রকে আশ্রয় করে কোনও বিপদ-আপদের মুখে বুক ফুলিয়ে এরা এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায়ও সুন্দরবনের এই যুবক ভজহরি মিস্ত্রী।

ভজহরি বেদে বাউলের অন্যতম প্রিয় পাত্র। শুধু ভজহরি নয়, সুন্দরবনের জেলে অধিবাসীমাত্রকেই বেদে ভারি শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। গোসাবার নবাগত পলিমাটির চরে জেলে বিধবাদের উপনিবেশ সৃষ্টির পেছনে বাউলের শুধু মাধুরী-প্রীতি ছিলো না, মাধুরীর সমকক্ষ হয়ে ওঠার প্রবল বাসনাই ছিলো না; জেলেদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাও তাকে এ কাজে কম টেনে নামায়নি। নদীর কূলে কূলে বলতে গেলে চরের ওপর ভেড়ির কোলে কোলে ছোটো ছোটো ঘরগুলিতে শুয়ে শুয়ে যখন পূর্ণিমা ও অমাবস্যার গোনে মাথা-ভাঙা ঢেউগুলির কুল-কুল ধ্বনি জেলেরা শোনে, তখন যেন তারা পাগল হয়ে ওঠে। সেই পাগল-মন নিয়ে ওরা চরের জালি ডিঙিগুলি সড়সড় করে ঠেলে ভাসিয়ে দেয় সুন্দরবনের ভয়াল অসংখ্য নদী-নালায় মাছের সন্ধানে। আর সেই সুযোগ বনের বাঘ আর নোনাজলের

কুমির-কামোটের কাছে এক মহা সুযোগ। তাই এই সব জেলেদের কাছে এসে বসলে কতো যে বীরত্ব-গাথা, কতো যে জীবন-মৃত্যুর কাহিনী শোনা যাবে তার শেষ নেই।

সবাই বেশ খোশ মেজাজে আছে। এবার মাছের তল্লাসে নয়, ফুলের গন্ধে আমোদিত মিষ্টি মৌ-এর লোভে বনে চলেছে মৌলির দল। পঁচিশ জন মরদ। বেদে বাউলে ডিঙির হাল ধরেছে যেমন, তেমনি এই অভিযানের নেতাও সে।

ভজহরি প্রশ্ন করে,—বাউলেদা, আজ কোন বনে যাচ্ছি আমরা ?

—আরে সেটা নির্ভর করে কোন্ ধরনের মৌ খেতে চাও তোমরা। তোরা সবাই জানিস্ কিনা জানি না ; বাদায় তিন রকমের মৌ পাওয়া যায়—ফুলপট্টি মধু, বালিহার মধু, আর লাল মধু। কোনটা চাও তোমরা ?

—জানান দাও কোনটা কেমন সোয়াদের ?

—শোনো তবে, ফুলপট্টি মধু হলো গিয়ে খল্‌সিলতার ফুল আর হেঁতাল বা বোগড়া গাছের ফুলের মধু ; গন্ধ ভুরভুর করে ; দেখতে সাদা ও গাঢ়। বালিহার মধু হলো গিয়ে বাইন ও কেওড়া গাছের ফুলের মধু ; দেখতে সাদা ও হালকা। আর লাল মধু গরান বা গর্জন গাছের ফুলের মধু ; দেখতে লালচে ; সোয়াদ মোটেই টনক না।

—তুমিই তো বলে দিলে কোন্‌টা চাই, ফুলপট্টি মধুই চাই।

—চলো যে-বনে যে-গাছের ঝাড় বেশি সেখানেই সে-ধরনের মধু মিলবে। চলো তবে চামটার বনে। ফুলপট্টির সোয়াদ পেতে হলে চামটা-বনেই যেতে হবে। চামটা বনটা কিন্তু বড্ড গরম। সাবধানে সে বাদায় উঠতে হয়, চলো তবে।

—বাউলেদা, তুমি আছো, তোমার বন্দুকও নিয়েছো, আমরা জনা পঁচিশেক, আর বনবিবি তো আছেন। কুচ্ পরোয়া নেই !—জোয়ানরা বাদার জেলের ছেলের মতো উত্তর দেয়।

দলে ভারি হলে কি হবে। বনে উঠেই দলের সব ভাগ-ভাগ হয়ে গোটা বনের চাতারে ছড়িয়ে পড়বে। এক-এক ভাগে তিনজন করে। তিনজন না হলে মৌ-ভাঙা যায় না। একজনে লম্বা লাঠির মাথায় হেঁতালের কচি ও শুকনো পাতা মেশানো মোড়ায় বা পোলেনে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সাহায্যে চাক থেকে মৌমাছি তাড়াবে ; দ্বিতীয় জনে মন্তর পড়ে মানে, বনবিবিকে স্মরণ করে ছালা দিয়ে মাথা ও দেহ ঢেকে গাছে উঠে কাস্তের সাহায্যে চাক কাটবে ; আর তৃতীয় জনে নিচে ধামা পেতে চাকের খণ্ডগুলি ধরবে। তিনজনের এই নির্দিষ্ট কাজ বাঁধা।

কিন্তু তার আগে সবাইকে লাইন ধরে গাছের ডালে ডালে বা ঝোপের আড়ালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় চাক আছে। তিনজনেরই কাছাকাছি থাকারই কথা এবং সে চেষ্টাও তারা করে। কিন্তু বনের চাতাল, তাও আবার সুন্দরবনের চাতাল—কোথাও সিক্ত কাদামাটি, কোথাও পিচ্ছিল পলিমাটির প্রলেপ, কোথাও বা ঝোপঝাড়, আর সর্বত্র শূলো।

কাজেই চেষ্টা করলে কি হবে। তিনজনকে কিছুটা ছাড়াছাড়ি হয়ে চলতেই হয়। তাই চব্বিশ জনের আটটি ভাগে যেন চামটা বনের এই গেঁদকে বহুদূর ব্যেপে বেড় দিয়ে এগিয়ে চলেছে লবণাক্ত দেশের মিষ্টিমধু নিঙড়ে নিতে।

লাইনটা সোজা উত্তরমুখেই এগুচ্ছিলো। বাউলের কড়া নির্দেশ ছিল, কেউই ডাইনে-বাঁয়ে হেলবে না, মোটামুটি বাউলের পেছন বরাবর সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাউলেই সবার আগে। এতোগুলি সঙ্গী, তাতে আবার হাতে বন্দুক। সহজে বেপরোয়া হয়ে উঠতে কতক্ষণ! মৌ-মাছির টানে আর বিধবাপল্লীর এতগুলি মানুষকে ফুলপট্টি মধু খাওয়াবার লোভে বাউলে অজানিতে নিজেই ডাইনে খানিকটা হেলে পড়েছে। বনে দিক ঠিক রাখা বড়ই দুরূহ।

ফলে এই দীর্ঘ লাইন এগুতে এগুতে কাস্তের আকার নিয়েছে। এখন অবধি ওরা কেউই মনের মতো মৌ-চাকের সন্ধান পায়নি। কোথাও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায় না। সবাই প্রায় নিঃশব্দে চলতে চায়। বনে চলাফেরার আইন সহসা কেউ ভাঙতে চায় না। বলা যায় না—সোরগোলে মৌ-মাছিরাও সচকিত হয়ে উঠতে পারে। শত্রুর একবার হদিস পেলে মৌমাছিরাও মারমুখো হয়ে ওঠে। শতশত হুলে তখন বিধ্বস্ত করবে তাদের শত্রুকে! শতেক সহস্রের জমায়েতে ক্ষুদে মৌমাছিরাও বিশ্বাসী।

নিঃশব্দে চলার আইন বলীশ্রেষ্ঠ হিংস্রতম মানুষখেকোর জন্যও। এ জীবের বুদ্ধির ও সচকিততার তুলনা নেই। হঠাৎ দেখা দিয়ে হকচকিত করে পলকের মধ্যে তার খাদ্যকে নিয়ে কোথায় উধাও হবে, তার দিশাই মিলবে না। তার জন্যও নিঃসাড়ে বনে বিচরণ করার ওদেরও কড়া আইন।

যতই কেন তুমি ক ড়া আইন মেনে চলো, সে-জীব আড়ালে আড়ালে সব যেন নখদর্পণে বুঝে নিয়েছে। লাইনের দক্ষিণ প্রান্তে জোয়ান ভজহরিকেই সে তাক্ করেছে। কিন্তু ওর চিন্তা আর ভয় দীর্ঘ চক্রাকার লাইনটিকে। বেশি লোভ করতে গিয়ে চক্রের বেড়ে না পড়ে। চক্রের ব্যূহের মধ্যে ঘেরাও হয়ে পড়তে চায় না বনের কোনো জীবই, তা সে যতই শক্তিশালী হোক। তেমন বেড়ে পড়লে সে মরিয়া হয়ে ওঠে, নির্মম ও হিংস্রতম হয়ে ওঠে।

এই বেড়ে পড়ার ভয়ে নরখাদক এবার চঞ্চল—না, আর দেরি নয়, যা করা তা এখনই সারতে হবে।

সহসা এমনভাবে আবির্ভাব হয়েছে যে সে এবার ভজহরির মুখোমুখি, চোখাচোখি।

প্রথম চমকেই শক্তিধর ভজহরি বজ্রাঘাতে আহতের মত কাঠ হয়ে যায়নি। বনবিবির কথা মনের তলে ঝলক্ মারতেই প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে,—মা! মা! মা!

রাখে মা, মারে কে?—এতো কথা বলার অবস্থা নেই। বাঘও হুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য লেজের মাথা দ্রুতলয়ে মোচড় দিয়েছে।

মুহূর্ত দেরি করার অবসর নেই। সুন্দরবনের নরখাদক কখনই ভাল করে সুলুক-সন্ধান না নিয়ে, পরিস্থিতিটা বেশ করে বুঝে না নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে এগোয় না। সে-শিকার জীব যদি মানুষ হয়, তাহলে তো কথাই নেই। মানুষের প্রতি ওদের বিশ্বাস নেই—কখন যে কি অঘটন ঘটিয়ে বসে তা বোঝাই দায়।

দীর্ঘ লাইনের যে-মাথায় ও এখন তাক্ করেছে, এতক্ষণে তার অন্য মাথাটা বেশ খানিকটা দূরে আর বেশ কিছুটা বেঁকে এগুচ্ছিল। যেন বেড় দেবার মতো। নরখাদক এবার মরিয়া—দ্রুত ছোঁ মেরে মুখে তুলে তাকে সরে পড়তে হবে। অতি দ্রুত।

ভজহরির 'মা—মা—মা' ডাক যেন গোটা লাইনে বিদ্যুতের শকের মতো কাজ করে। দ্রুত পরপর 'ভয় নেই' 'ভয় নেই' চিৎকার গোটা দীর্ঘ লাইন থেকে। বেদে বাউলে তো হরিণের বেগে বন্দুক উঁচিয়ে 'রোখ্, রোখ্, রুখে দাঁড়া' চিৎকারে ছুটে এসেছে। শুলো আর ঝোপঝাড় যেন মিছেই চেষ্টা করছে সেগতিকে স্তব্ধ করতে।

নরখাদক আর পলকেরও সময় দেবে না। ভীষণতর হাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ভজহরি! পিঠের দিকে কোমরে গোঁজা কাস্তেখানা টেনে উঁচিয়ে ধরার অবকাশও

হয় না। হাতে একখানা ছোটো মোটা—বেশ মোটা লাঠি ছিলো, সেটাও উদ্যত করার সুযোগ ছিলো হয়তো। কিন্তু ভজহরি করাল মৃত্যুর সামনে আত্মরক্ষার তাগিদে ঝমাৎ করে ঠিক পেছনের গেঁয়ো গাছটার গুড়ি সাপ্‌টে ধরেছে দুবাহুতে এবং আপ্রাণ শক্তিতে। এ-হাত ও-হাতের কব্‌জি জড়িয়ে বাহু-বন্ধন যেন সিল করে দিয়েছে—না কিছুতেই ওকে টেনে নিয়ে যেতে দেবে না...না, কিছুতেই না !!

নরখাদক উল্লম্ফনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গেঁয়ো গাছটার গোড়ায় ছিলো হাতদুই উই-এর ঢিবি, তারই উপর দাঁড়িয়ে ভজহরি গুড়ি জাপটে ধরেছিলো। বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝুলেই আবারও লাফ দিয়ে তার কাঁধ ও গর্দান কামড়ে ধরে টেনে নিতে চায়। প্রথমে এক থাবা পিঠে মেরে আমূল নখবিদ্ধ করেছে। আরেক থাবা ভজহরির ডান বাহুর উপর।

ভজহরি যেমন 'মা-মা-মা' করছে, তেমনি তার শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিষ্ঠ হাত দুটোকে কিছুতেই মুক্ত হতে দেবে না, মরে গেলেও না—এই তার পণ।

নরখাদক তার গলা এগিয়ে এবার ভজহরির ঘাড়কে করাল গ্রাসের মধ্যে আনতে চায়। কিন্তু আনবে কি ! পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়েই তো গলা বাড়াতে হবে। উই-এর ঢিবির মাটি ওর সুঁচোলো বক্র নখের চাপে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নরখাদকও ঝুলে পড়ে।

ভজহরির পিঠে আমূল বসানো থাবার নখগুলি বাঘের ওজন ও দাপটির টান সামলাতে পারে না। বক্রনখবিদ্ধ মাংস টেনে ছিঁড়ে নিয়ে হিংস্র বাঘ গড়িয়ে পড়ে নিচের মাটিতে প্রায় চিৎ হয়ে।

ভজহরি এবার উন্মত্ত। হিংস্রতম আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী দেখে তার উদ্দম ও প্রতিহিংসা ফেটে পড়ে। দুই উরুতের মধ্যে চাপা লাঠিখানা ঝমাৎ করে টেনে আপ্রাণে আঘাত করে বাঘের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা গোটা লাইনের চিৎকার ঘনীভূত হয়ে আছড়ে পড়ে সারা বনাঞ্চলে।

দলবদ্ধ মানুষের হুঙ্কার আর বলিষ্ঠ হাতের লাঠির আঘাতে থতমত খেয়ে যায় নরখাদক। সুড়সুড় করে কেটে পড়ে শত্রুর বেড়ে পড়ার আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার তাগিদে।

বেদে বাউলে সবার আগে ছুটে এসে দ্যাখে, ভজহরি তখনও লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার পিঠ দিয়ে জলধারার মতো রক্ত ঝরে পড়ছে। 'শাবাশ্‌ শাবাশ্‌' বলতে বলতে বাউলে বাঘের গতিপথ একটা চোট্‌ করে যেন ত্রাস এনে দিতে চাইলো ! ছুটে এগিয়ে ভজহরির বাহুতে হাত দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সে এলিয়ে পড়লো মাটিতে।

মুহূর্তে সবাই জড় হয়েছে। বাউলে চিৎকার করে ওঠে,—করছিস কি ! যা তুরণ তড়পা শালার সামনে, যা শীগ্‌গির যা, যা-হাতে আছে তাই নিয়ে তড়পা ! গালি দে, ঝোপঝাড় লাঠিপেটা কর্‌ ! শালা ধারে কাছেই আছে !

বলেই সে নিজে ছুটে বিদ্যাধরীর পলিমাটি এনে ক্ষতস্থানে চেপে লেপটে দিলো। যতটা পারে গামছা দিয়ে এঁটে বেঁধে দিলো। রক্তধারা স্তব্ধ না হলেও একটু বুঝি স্তিমিত হয়েছে।

বাইচের ডিঙির মতো সবাই মিলে প্রাণপণে তালে তালে বেয়ে ক্যানিং হাসপাতালে এসেছে। চার ঘণ্টার পথ দু-ঘণ্টায় বেয়ে এসেছে। বাউলে তার বিধবাপল্লীর ছেলেকে বাঁচাতে চায় যে-কোনও ভাবে। তা না হলে কী কৈফিয়েত দেবে ওর মা-কে !

ভজহরি যন্ত্রণায় কাতর হলেও কখনও কিন্তু চেতনা হারায়নি। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু প্রাথমিক যা করার তা করে এসে বাউলেকে বললেন,—বলতে পারি না বাঁচাতে পারবো

কিনা, ক্ষত বড় গভীর।

বাউলে চমকে উঠে বলে, —না ডাক্তারবাবু, যে ভাবেই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে। যা টাকা লাগে, যা ওষুধ লাগে তার ব্যবস্থা করবো। আপনি বাঁচাতে পারবেন না?

বাউলের আকুল আবেদন শুধু বিধবাপল্লীর ছেলে বলে নয়, শুধু আপনজন বলে নয়! ওর বিবেক ওকে আঘাত করছে। সে-ই নিশ্চয় ফুলপাত্রি মধুর লোভে নিজেই বুঝি লাইনকে বেঁকিয়ে দিয়েছিলো বাদায়। তাতেই ওর মানসিক আক্ষেপ। তা না হলে কি বাঘে অমন মরিয়া হয়ে ওঠে। কেন সে বাঘকে আগে দেখতে পেলো না! মনে মনে তার আপশোষেরও অন্ত নেই।

অন্য সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে বাউলে ক্যানিং-এ থেকে গেলো। দুদিন পরে ভজহরির নিদারুণ যন্ত্রণা বেড়ে যায়। ডাক্তারবাবু অনুমান করলেন, নিশ্চয় ক্ষত বিষাক্ত হয়ে গেছে।

যন্ত্রণায় কাতর ভজহরি তবু বলে,—না, আমি বাঁচবই। বনবিবি আমাকে বাঁচাবে।

ডাক্তারবাবু তো রুগীর দৃঢ়তা দেখে অবাক। পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু এলেই ভজহরি বলে,—দেখুন ডাক্তারবাবু কি হয়েছে! আমি বলিনি আমি বাঁচবই! আমার গোটা পিঠ ও বিছানা পুঁজে ভর্তি।

ডাক্তারবাবু আনন্দে আত্মহারা। তিনমাস শুশ্রূষা করে ভজহরিকে ভাল করে তুললেন।

বাউলেরও আনন্দের পরিসীমা নেই। সে এখন বিধবাপল্লীতে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবে। মুখ দেখাতে পারবে মাধুরীর কাছেও। পাল্লা দিয়ে বিধবাপল্লী গড়তে গিয়েছিলো। মাধুরী বুঝবে কি, ও তো তৈরি করা এক বিধবাপল্লীকে নতুন করে গড়ে তুলেছে। আর আমাকে শুরু করতে হয়েছে ভিতের থেকে। দুর্ধর্ষ জেলেদের তো একত্র করে রাখতে হবে আমাকে। আমার দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি...অনেক বেশি!

বাউলেও জানে না, এই দায়-দায়িত্বের পরিমাপ করা কি পরিমাণে দায়। আগামী দিনে এমন এক ঝামেলা আসছে যা মোকাবেলা করতে বাউলেকে শেষ পর্যন্ত মাধুরীকেও হয়ত হারাতে বসতে হবে।

ষোলো

নতুন এক ঝামেলা দেখা দিয়েছে রায়মঙ্গলের পশ্চিমে। এই রায়মঙ্গল বরাবরই দেশ ভাগ হয়েছে। ওপার পূর্ব-বাঙলা, এপার পশ্চিম বাঙলা। ভাগ হয়েছে সুন্দরবনও এই নদী বরাবর। ওপারে তখনও পূর্ব-পাকিস্তান, এপার পশ্চিমবঙ্গ। সীমানা নির্ধারিত হয়েছে কাল্পনিক রেখায় মাঝ-নদী বরাবর।

মগ-ফিরিঙ্গিদের আমল থেকেই সুন্দরবনের ডাকাতির 'সুনাম' আছে। সে-আমলে তো শুধু ডাকাতি ও লুঠপাট নয়, যাকে পায় তাকেই ধরে নিয়ে যেতো, মেয়েদের পেলে তো কথাই ছিল না! নিয়ে গিয়ে গরু ভেড়ার মতো তাদের বেচা-কেনা করতো মগ-ফিরিঙ্গিরা দেশ-বিদেশে। দাস-ব্যবসার অভিশাপ এমনি করেই নেমে আসে গোটা বাদা অঞ্চলে। বন্দীদের হাতের তেলো ফুটো করে বেত চালিয়ে হালি বানাতো। এইভাবে বেঁধে জাহাজের খোলে গাদি মেরে রেখে দিতো বন্দরে বন্দরে দাস বিক্রীর জন্য। সুন্দরবন তখন 'মগের-মুল্লুক' হয়ে ওঠে। সেই অতীতকালে রাজা প্রতাপাদিত্যের দৌলতে এবং পরবর্তীকালে শায়েস্তা খাঁর কঠোর শায়েস্তাতে সুন্দরবনের মানুষ দাস-ব্যবসা আর লুঠপাটের অভিশাপ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

অধুনা দেশ বিভাগের পর কয়েক বছর ধরে তো এপার-ওপার ছিন্নমূল মানুষের আনাগোনার হিড়িকে গোটা সীমানা ধরে সোরগোল চলে। মায় বাদা অঞ্চলও বাদ যায়নি। হিড়িক থিতিয়ে এলে নতুন আপদ দেখা দেয়। যদিও একে 'মগের মুল্লুক' বলা ঠিক নয়, তবুও ডাকাতি ও লুঠপাটেতে তা কম কিসে!

রায়মঙ্গলের এপারেও সুন্দরবন। দুই বনের সম্পত্তি অঢেল। আহরণ করাই যা একটা কষ্টসাধ্য। সেটাই বা করি কেন? কাজেই এপারের মানুষ জীবন বিপন্ন করে যে-সম্পত্তি আহরণ করে তারই উপর হামলা শুরু হয়। এই দুর্দিন পুরোদমে শুরু হয় বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রক্কালে। পূর্বপাকিস্তান তখন ভারতের সীমান্ত বরাবর খান-সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছে। খাস বাদা অঞ্চলেও খান-সৈন্যরা কিছুদূর অন্তর অন্তর ফাঁড়ি গেড়ে বসে যায়। আর তাদেরই আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে ওপারের ডাকাতের দল এপারে হামেশা লুঠপাট চালাতে কসুর করে না।

তেমনি এক লুঠের ঝামেলায় পড়ে এপার গোসাবার বিধবাপল্লীর জেলেরা। ওরা জনা ছয়েক মিলে যায় পুবে রায়মঙ্গলের কাছাকাছি খালে মাছ ধরতে। এই খালটিকে বোধহয় মাছের আড়ৎ বলা যায়, বিশেষ করে কই-ভোলা মাছের। পারসে ও পাতাড়ি মাছ ফাও হিসাবে তো আছেই। ওদের সঙ্গে দুখানা ডিঙি ও জাল। জোয়ার পুরতে ওরা খালের মুখে সবে জাল বাঁধছিলো। তখনও পর্যন্ত কোনও মাছ ধরেনি।

এমন সময়ে দশ-বারোজন ওপারের ডাকাত বন্দুক ও ধারাল সব অস্ত্র নিয়ে চোটপাট করে এসে পড়ে। মাছ লুঠ করে নেবে। মাছ না দেখে ডাকাতেরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বন্দুকের একটা আওয়াজ করে আর মারধোর করে বলে,—দে শালারা, দে তোদের কি আছে। দে বলছি!

জেলেরা বলে,—থাকার মধ্যে আছে এক হাঁড়ি চিড়ে আর এক শিশি মধু। নিতে চান তো নিয়ে যান।

—কেন শালারা, জালটা তো আছে। তোল্ জাল, তুলে দে ডিঙিতে, শিগগীর তোল্!

জাল তোলা হলে ডিঙি আর জাল নিয়ে ওরা বললো,—এই একখানা ডিঙি নিয়ে গেলাম। আজ মঙ্গলবার, তোরা শনিবার আসবি পাঁচশ' টাকা নিয়ে। কোথায় আসবি জানিস? ঐ ওপার রায়মঙ্গলের ওপার, ১৭৯নং লাটে, কেওড়া গাছটার ঘাটে। টাকা দিলে তবে ডিঙি ফেরৎ পাবি। মনে থাকবে? শনিবার, এই দুপুর গড়াবার আগেই। খান-সেনাদের দেখলি ভয় পাবি না, বলবি—নিধু সর্দারকে চাই, ব্যস্।

এই আদব-কায়দাটা ওরা সড়গড় করে তুলেছে। টাকাটা কমই বলে, তা না হলে টাকা দিতে লোকই আসবে না এমুখো। টাকা নিয়ে হাজির হলে ঠিকই ওরা ডিঙি ফেরৎ দেয়—কেননা লুঠের টাকা আদায়ের এটাই অতি সহজ পথ হিসাবে দেখা দিয়েছে। যদি জোর করে কেউ ডিঙি ছিনিয়ে নিতে চায় তো খান-সেনারাও মারমুখো হয়ে ছুটে আসবে—ওদেরও যে বখরা আছে এই ধরনের ডাকাতিতে।

ঘটনাটি শুনে বাউলে বলে,—তোরা কি করলি বল্‌তো! হাজার টাকার ডিঙিখানা খুইয়ে এলি। এখন উপায়? টাকা, অতো টাকা ঝমাৎ করে কোত্থেকে পাবি? তা হয় না।

সবাই বলে,—তা হয় না তো কি হয়?

—দাঁড়া, ভেবে দেখা যাক্ কি করা।

—তোমার ঐ ভেবে দেখা। ভেবে দেখা মানে তো তোমার পাড়া-কমিটি বসানো আর মাধুরীদির সঙ্গে সলাপরামর্শ করা।

—না, না, তোরা দাঁড়া। আমাকে একটু ভাবতে দে!......

বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করে বলে,—এক কাজ কর্ বুঝলি,...তোরা জনাছয়েক এক লম্বাপানা ডিঙি নিয়ে আমার সঙ্গে চল!

তারপর হাতের কর গুণে গুণে বলে চলে,—শনিবার হলো গিয়ে দ্বিতীয়া তিথি, প্রথম জো আসবে সকাল আটটায়। তখন ১৭৯নং লাটের এক বাঁক নিচে আমাকে নামিয়ে দিবি। ঘন্টা তিনেকের মধ্যে আমি খান-সেনাদের ফাঁড়িতে পৌঁছে ওদের গল্পে গল্পে মশগুল করে রাখবো। সেই সময় তোরা ওখানে কূল দিয়ে নিঃসাড়ে পৌঁছে ঘাটে তোদের বাঁধা ডিঙিখানা খুলে তুরণ বেগে কোন মতে রায়মঙ্গল পার হয়ে খাল ধরে ধরে চলে আসবি।

ওরা প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলে,—কিন্তু যদি ধরা পড়ি!!

—তা তো হতেই পারে। তাইতে তো বলছি, সঙ্গে একশো টাকা নিবি; ধরা পড়লে টাকাটা ওদের হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নাকাটি করে ডিঙিটা চাইবি। পেলি ভালো, না পেলে চলে আসবি। তোদের তো ভয় করার কিছু নেই। দেখি ওদের গল্পে মাৎ করতে পারি কিনা। তারপর যে-করে হোক আমি ফিরে আসবো।...তা অতো ভাবছিস কি?

—ভাবছি...

—না, ভাবতে হবে না, আমি আপাততঃ তোদের একশো টাকা জোগাড় করে দিচ্ছি। পরে পাড়া-কমিটি সব শুনে যা বলে তাই করতে হবে! কিন্তু তার আগে তোরা কাউকে কিচ্ছু বলবি না। মায় মাধুরীকেও না। ঠিক তো?

যা করণীয় তা সবই করা হয়েছে। বাউলেও পায়ে হেঁটে খান-সেনাদের ডেরায় হাজির। আজ সে পুরো সেজে এসেছে যেন কাপালিক সন্ন্যাসী। বড়-বড় ত্রি-পুন্ড্র-লাঞ্ছন কপালে, হাতে ও বুকে। বড় রুদ্রাক্ষের মালা যেমন ওর গলায় থাকে তেমনি তো আছেই, আজ আবার দুবাহুতেও রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেছে। বাবরি চুলের উপর লাল কাপড়ের ফেটা বাঁধা। ওর ঝোলায় নিয়েছে একখানা আতশী কাঁচ আর আজ-বাজে গাছের কিছু শিকড়।

এসেই দরাজ গলায় বলে,—আল্লা হো আক্‌বর! আল্লা হো আক্‌বর!

ছুটে এসে প্রধান খান-সেনা তো দেখেই অবাক্। হিন্দু সাধু আদমী, আল্লার নাম নিচ্ছে কি করে? ভেবেই প্রশ্ন করলো,— তোমি তো হিন্দু সাধু আদমী, খোদাতাল্লাকো নাম ক্যায়সে নাড়া দেতে?

—আরে ভাইয়া যো ভী আল্লা সো ভী ভগবান! আভি তো হাম আ রহে টাঙ্গা মসজিদসে। টাঙ্গা মসজিদ কাঁহা আপকো মালুম হ্যায়?

—নেহি তো

—তব্ তোম ক্যায়সে মুসলমান হো। টাঙ্গা মসজিদসে আল্লাকো দয়া মাঙ্‌কে নূরনগর কৃষ্ণজীকা মন্দির হো কর্ সিধা আপকো পাস্ আয়া হ্যায়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কৃষ্ণজীকা মন্দির, মৈনে শুনা হ্যায়।

—তো খান্‌সাহেব আপকো বিবি আভী ক্যায়সী হ্যায়?

—ক্যোও! হামারা বিবিকো বাৎ ক্যায়সে মালুম হো গিয়া তোম্‌কো?

—ক্যায়েসে, ইধর্ দেখো হামরা নখ, বুঢ়া আঙলিকা নখ্। যো নখ হ্যায় উস্‌মে আপ্‌কো বিবিকো তস্‌বির্ লে আনতে সকে। লেকিন আপকো আখো মে নেহি আয়গা। সিরিফ্ হাম্ একেলা দেখ্ সকে।

বলেই বাউলে নিজের নখকে কাপড়ে পরিষ্কার করে পদ্মাসনে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। একটু পরেই বললো,—হ্যাঁ আ গিয়া। আপকো বিবিকা নাক্ বড়া উঁচা হ্যায়;

ক্যাযা ঠিক বাৎ বলা কি নেহী ?

—হ্যাঁ ঠিক, হ্যাঁ ঠিক্।

—তো উনকি একঠো লেড়কা দেখ্‌তে হ্যায় !

—নেহি, নেহি, লেড়কী হোগী।

—ঠিক্ ঠিক্ খানসাহেব ! উনকী গলামে একঠো পাত্থরকা মালা হ্যায়।

—এ তোমকো ক্যায়সে মালুম হো গিয়া ! দ্যেখাও, দ্যেখাও, হামকো ভী দ্যেখাও।

—নেহী, হামকো ছোড়কে কই দোস্‌রা আদমী নেহী দ্যেখ্ সক্‌তে।

দুজনে ভাঙা বাঙলা আর ভাঙা উর্দুতে মেতে উঠেছে। সেই সঙ্গে ধারে-কাছে অন্য সবাই এসে জড়ো হয়েছে।

হঠাৎ বাউলে বেশ জোরেই বললো,—দ্যেখো খান-সাহেব, আপ্ বহুৎ মহব্বৎ আদমী হ্যায়।

বলেই বাউলে আঙুল দিয়ে খান-সাহেবের ভ্রূ-যুগল দেখিয়ে বললো,—হ্যাম তো ভ্রূকা হিন্দী ভুল গিয়া···হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ আপকো জোড়-ভৌঁও হ্যায়, উসকো মানে ক্যায়া আপ্ জানতা ? মানে হ্যায়, কই দুস্‌মন আপকো গর্দান আউর শিরপর গোলি লাগানেকো সকেগা নেহি, কভি নেহি !

খান-সাহেব এবার বিগলিত ! কিন্তু দুপুর গড়িয়ে এসেছে, অন্য সবাইকেও মাতিয়ে রাখা আবশ্যক। তাই বাউলে কথার মোড় ঘোরালো। অন্যসবার দিকে তাকিয়ে বললো,—জানো তোমরা, আমি থাকি কোথায় ? আমি থাকি এই সোঁদরবনে, বাঘের রাজ্যে। ভাবছো বাঘের রাজ্যে থাকি কি করে ?

প্রশ্ন তুলেই কয়েক লহমা চুপ করে থাকে। তারপর নিজের গোঁফদাড়িতে হাত বুলিয়ে আর খান-সাহেবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,— তোমরা যদি আমাদের দুজনের মতো বড় মোচ আর দাড়ি রাখতে পারো তাহলে কোনও ভয় নেই। বাঘ এমন দাড়ি-গোঁফ দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। বাঘের যেন কেমন বিতৃষ্ণা আসে।

—আর যদি সাপের কথা বলো—বলেই বাউলে ঝোলা থেকে শিকড়গুলো বের করে বললো,—এই শিকড়ের যদি সামান্য অংশও তোমাদের কাছে থাকে তার গন্ধে সাপ কোনওদিন ধারে কাছে আসবে না।

সবাই উল্লসিত হলো শিকড়ের একটু ভাগ নিতে। খান-সাহেবও এগিয়ে এসেছেন দেখে বাউলে তার হাতে বড় একখানা শিকড় দিলো।

খান-সাহেব তো নাকের কাছে শুকতে শুকতে বলেন,—বাঃ শিরামে তো বহুৎ আচ্ছা বাস নিকাল্‌তে !

বাউলে দেরি না করেই বলেই চলে,—আমি সব জন্তুর ও পাখির ভাষা বুঝি, আর আমিও তাদের মতো করে তাদের সঙ্গে কথা বলি। তোমরা বানরের ডাক শুনেছো তো ! বলেই বানরের ডাকের নকল করে আওয়াজ করলো। জানো এই ডাকে ওরা কি বললো ? বললো, তুমি ওদিকে যেও না, ওদিকে ভয় আছে, এদিকে এসো। এই তিনটি কথা বললো। বলেই আবার বানরের নকল ডাক দিলো।

—এ তো গেলো বানরের ডাক। পাখির ডাক শুনবে ? বন্যকুক্কুট ডেকে কি বলে জানো ?—বলেই ভীষণভাবে কয়েকবার ডাক দিলো ! এই ডাকে কি বলছে জানো ? বলছে—আর এগিয়ো না, সামনেই বাঘ ! আমিও তার উত্তরে ঝমাৎ করে চাতক পাখির কায়দায় ডাক ছাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে বাউলে চাতক পাখির নকল করে বিকট আওয়াজ করে বসে কয়েকবার। সবাই তো হেসেই খুন, মায় খান-সাহেবও হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন।

বাউলে আগেই তার জেলে-পাড়ার লোকেদের জানিয়ে রেখেছিলো,—চাতক পাখির এই ডাক শুনতে পেলে তোমরা বুঝবে, নিশ্চিন্তমনে কাজ করে যেতে পারো, আমি ওদের মাতিয়ে রেখেছি।

চাতক পাখির ডাকের শেষে বাউলে তার ঝোলা থেকে দ্রুত আতশী কাঁচখানা বের করলো। কাপড়ে মুছতে মুছতে বললো,—খান-সাহেব, আপকো হাথ দেখ্‌নেসে কই কসুর হ্যায় ?

—আরে সাধু ইসমেভী তুমকো এক্তিয়ার হ্যায় !

—দেখাইয়ে আপকো হাত।—বলেই বাউলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে খান-সাহেবের হাতের রেখাগুলি আতশী কাঁচে দেখতে থাকে। অন্যেরা তখন গামছা দিয়ে তাদের হাত সাফাই করে নিচ্ছে অসীম আগ্রহে।

হাত দেখে প্রত্যয়ের ভাব নিয়ে বাউলে বলে,—আভী হ্যাম্ নিশ্চিন্ত্ হো গিয়া। আপকো এক সালভর কই লড়াই করনে হোগা নেই। কোন্ লড়নেওয়ালা হ্যায় খান-জোয়ানকো সাথ্। আপকো জলদিসে জলদি ছুট্‌টী মিল্‌ যায়গা।—লেখিন, এক বাৎ খান-সাহেব, কিধর যানেকো বকৎ, সে আপকো ঘর যানা, বলকি লড়াইকো ময়দান যানা—সব কইকো পহেলে দেখ লেনা কোন্ নাককো কোন্ পুরাসে শ্বাস নিকালতে ; যব বাঁ পুরাসে পড়নেওয়ালা হ্যায় কভী উস্ টাইমমে কই কামমে মাৎ যাও ; লেকিন যব্ ডাইনে পুরাসে শ্বাস নিকালতে তব যো কই কামমে লাগো তোমকো জরুর ভালাই হোগা, মঙ্গল হোগা।

খান-সাহেব তো আনন্দে আত্মহারা। দুই আঙুলে দুই নাকের শ্বাস পরখ করতে করতে হাঁক দিলেন,—কই ভাই-সাব্, জলদি চা বানাও, আউর সব কইকো পিলাও !

সবাই চা-এর জন্য উদগ্র প্রতীক্ষায়। ওদের মধ্যে একজন মাদ্রাসায় পড়া বাঙালী মুসলমান যুবক ছিলো। খুবই চালাকচতুর। গোড়া থেকেই সে বাউলের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলো। তবুও এইসব চমকলাগা কথাবার্তায় তন্ময় হয়ে যায়। হঠাৎ সজাগ হয়ে এবার বলে উঠলো,—কই ওরা তো এখনও এলো না ! টাকা নিয়ে ডিঙি নিতে এলো না ! দেখি একবার। —বলেই নদীর কিনারায় গিয়ে দ্যাখে, কেউ আসেনি, ডিঙিখানাও নেই।

তবে এই সাধু কি ওদেরই লোক !! —এই ভাবনা আসতেই ছুটে চলে আসে খান-সাহেবের কাছে। পাশে ডেকে নিয়ে সাহেবকে ওর মনের সন্দেহের কথা বলে। খান-সাহেবদের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হতে দেরি হয় না। বিদেশ-বিভুইতে যুদ্ধ করতে এলে সৈন্যদের এ মনোভাবই হয়ে যায়—সন্দেহের কথা বললেই তৎক্ষণাৎ তারা বিশ্বাস করে বসে। যেখানে ছিল সেখানেই কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে রইলো খান-সাহেব—মুহূর্তের মধ্যে মনের রাগ ও বিদ্বেষকে ধূমায়িত করার জন্য দাঁত কড়মড় করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চমক দিয়ে সাধুকে বলে ওঠে,—তোম্ থোড়াই সাধু। তোমকো হাম পাকড় লেতা। তুরণ্ সদর চালান কর্ দেউঙ্গা। বড়া অফিসার উধর তোমকো বিচার করেঙ্গে, তোম্ সাধু হ্যায় বল্‌কি ধোঁকাবাজ হ্যায়।

বাউলে সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে,—খান-সাহেব, যো আপকো বিচার হ্যায় ওভী মান লেতা। —মনে মনে ভাবলো, আগে তো এখান থেকে সরে পড়ি তারপর যা হয় হবে।

খুলনা শহরে মিলিটারির এক কর্তা মেজর খান-সাহেবের কাছে সাধুকে নিয়ে হাজির। মেজর সাহেব দাবড়ি লাগিয়ে প্রশ্ন করেন, —তোম্ পাকিস্তানকে খিলাফ কই কাম কিয়া, কই দুসমনি কিয়া ?

জীবনে এক সময়ে যখন সামরিক শিক্ষা নিতে যায় তখন বাউলে দেখেছে কোর্টমার্শালে কি ঘটে। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে মেজর সাহেবকে বলে,—হাঁ, কিয়া হুজুর।

মেজর সাহেবের তাৎক্ষণিক বিচার,—তব্ তোম্ তো দোষী হ্যায়।

—হুজুর হাম্ দোষী হ্যায়।

—বাস্, তোমাকে পাঁচ বরষ জেল—আবার ইংরেজি করে বলেন,— **Five years imprisonment**। তোম্ তো ফকির আদমি, উস্ লিয়ে **not rigorous but ordinary......** সমজ্ লিয়া ?

—জো হুজুর ! —বলেই বাউলে আদাব জানালো।

বাউলে এবার খুলনা জেলে আটক কয়েদী। একজন সুন্দর চেহারার সাধুবেশধারী কয়েদী পেয়ে জেলার সাহেব যেন খুশি। বুকে ও হাতে লাঞ্ছন দেখে আদেশ দিয়ে বসলেন সাধুকে কোর্তা পরতে হবে না, তবে হাফ প্যান্ট পরতেই হবে। কিন্তু কেষ্ট ফাইলে লাইন দেবার সময় কোর্তাও অবশ্য পরতে হবে আর থালা-বাটি হাতে তো নিতেই হবে। কয়েদী নম্বর প্লেটটা রুদ্রাক্ষের মালার পাশেই ঝোলাবার আদেশ হলো। কয়েদী নম্বর পড়লো ১৫৬০।

বাউলে সব তাতেই রাজি। তবে তিলক কাটা আর হাতদেখাটা ছাড়েনি। খাওয়া-দাওয়া শোয়া কোনো তাতেই কোনো নালিশ নেই। জেলার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেই জানায়,—খুব খুশি, খুব খুশি। এতো খাবার যে সবটা খেয়ে উঠতে পারি না আমি।

খুলনা জেলখানা। ভৈরবনদীর তীর বরাবর লম্বা হয়ে ছড়িয়ে আছে। তবে চওড়া বেশি নয়। ছোটো জেল। মাত্র শ'দুয়েকের মতো কয়েদীর স্থান হতে পারে। তা হলে কি হবে, এই স্বল্প পরিসর জেলের মধ্যে বর্তমানে আছে দেড় হাজার চেয়েও বেশি কয়েদী। কালটা যে বড়ই আপদ্‌কাল। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস। ৭ই মার্চ ঢাকার রমনা ময়দানে বঙ্গবন্ধু মুজিব ঘোষণা করেছেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। তারপরই শুরু হয়েছে শাসক ইয়াহিয়া খানের অমানুষিক অত্যাচার, মারধোর, জেল ও গুলি। ভরে গেছে এই ছোট্ট জেলখানা। আওয়ামী লীগের শুধু পাণ্ডারাই নয়, বহু চুনোপুটিও গিজ্‌গিজ্ করছে। জেলখানা সবসময়ই এখন গরম হয়ে আছে।

বাউলের ভাবনা, ওর কথাবার্তায় কোন্ লাইন নেবে। লাইন ওকে নিতেই হবে। কোনমতে বেঁচে দেশে ফিরতে তো হবে। মাধুরীর কথাও মনে পড়ে, মনে পড়ে মায়ের কথাও—বহুদিনই তো হলো ওদের সঙ্গে দেখা হয় না। ভেবে ঠিক করলো, আওয়ামী লীগকে মেনে না নিলে উপায় নেই, তবে জেলের কর্তাদেরও তো মন রেখে চলতে হবে। যাক্ গে ! আমি তো শুধু সবাইকে ভবিষ্যৎ বাণী শোনাই। তাই শোনাবো—হয় ভালো, না হয় মন্দ। আওয়ামী লীগকে বাহবা দেবো কিন্তু ভারতের মতলব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবো।

সেদিন এক আওয়ামী নেতা নেছের আলি সাহেব এসে বাউলের পাশে বসলেন

জেলের ভেতর ছোট্ট একখানি উঠোন মতো ছিলো। তারই পাশে একটি শিউলিফুলের গাছ। শরৎকাল এসে গেছে। ফুল ঝরঝর করে তলায় পড়ে সাদা বিছানা যেন পেতে দিয়েছে। তারই মাঝখানে বাউলে ভোর সকালে চান-টান সেরে কপালে ত্রি-পুণ্ড্র-লাঞ্ছন এঁকে বসে আছে। নেছের আলি সাহেব হাত এগিয়ে ধরে বললেন,—কি সাধু! বলো এবার আমাদের ভাগ্যে কি আছে?

বাউলে বলে,—না, আজ হাত দেখা নয়। ছক্ কেটে নিশ্চিন্ত হয়ে বলবো। বলেই আস্তে ও আলতো করে কিছু ঘন হয়ে ঝরে পড়া শিউলিফুল সরিয়ে রাখলো। শিউলিফুল অতো মিষ্টি হলে হবে কি, ভারি অভিমানী ফুল। এতটুকু অযত্নে নাড়াচাড়া করলেই মিইয়ে যায়, বিবর্ণ হয়ে যায়। তাই বাউলে প্রায় একটা একটা করে তুলে সরিয়ে রেখে মাটিতে তর্জনীর নখাগ্রে ছক্ কেটে ফেললো। মেএ্যাজ্ঞানেরা তো বিশেষ তিথি-নক্ষত্রের আমোল দেন না। তাই বাউলে শুধু জেনে নিলো কি মাসে আর কি বারে জন্ম।

তারপর কতো যে নম্বর লিখলো ছকের বাইরে ও ভিতরে, তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে গম্ভীর হয়ে বলে,—তা সাহেব, মুজিব তো এখন জেলে, ছকে বলছে উনি শীঘ্রই ছাড়া পাবেন। ঠিক কখন তা এখন বলতে পারছি না। তবে কি জানেন, ভারত তো কোনও নাড়া দিচ্ছে না। আর দিলেই কি ভালো হবে? কার কি মতলব তা বোঝাই দায়। শেষকালে আমরা এক বিদেশীকে হটিয়ে আরেক বিদেশীকে এনে না বসাই। এইটুকু আমার ভাবনা। ছকের ঈশান কোণে যে ইঙ্গিত পাচ্ছি তাতে বাঙলাদেশের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের কোনও কিছু নেই। আর আপনার নিজের কথা। ...শিগগীর, খুব শিগগীর ছাড়া পাচ্ছেন। তৈরি থাকবেন। —শেষ কথাগুলো ওর কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে আস্তে আস্তে বাউলে বললো।

নেছের আলি সাহেব অতি উৎসাহে বলে বসলেন,—শাবাশ্ সাধু, শাবাশ্!

বেদে বাউলের অতি প্রেয় 'শাবাশ্' কথাটা ওকে সুদূর অতীতে নিয়ে ফেললো। বড়দলের কথা, গোসাবার কথা, রাঙাবেলের কথা, সাতজেলের কথা মনে ভেসে ওঠে। সর্বস্থানে সে কীভাবে এই 'শাবাশ' কথাটা শুনতে চেয়েছে। এবার এই সুদূর খুলনা জেলখানার কয়েদী জীবনেও সেই বহুআকাঙ্ক্ষিত কথাটা শুনবার ভাগ্য হলো। ভাবে, হলো বটে তবে এ তো অপরের শুভকামনায় ভাগ্য-ছকের প্রতারণা মাত্র।

প্রতারণা কিন্তু বেশিদিন আর প্রতারণা থাকে না। শুভদিন বুঝি অতি দ্রুত ঘনিয়ে আসে। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৭। খান সেনারা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। যশোহর দুর্গও ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তি বাহিনীর দখলে এলেও খুলনার তখনও পতন হয়নি। যশোহর দুর্গের খান সেনারা খুলনার পথে দ্রুত জাহাজে পাড়ি দেবার চেষ্টা করছে। তা করলেও শহরের পথে পথে তখন মুক্তিবাহিনীর সমানে আক্রমণ চলেছে। জেলে বসে বসে বাউলে ও আওয়ামীদলের লোকেরা শহরের কোথায় লড়াই চলেছে, গুলিগোলা চলেছে—তাই উন্মনা হয়ে অনুমান করে চলেছে—কারও ঘুম নেই, কারও বিশ্রাম নেই।

শেষ পর্যন্ত কদিনের মধ্যেই খুলনা শহর মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। দেখতে না দেখতে মুক্তিবাহিনীর স্টেনগানধারী যোদ্ধারা জেলে এসে সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে গেছে। বাউলে সাধারণ কয়েদী, কাজেই ওর মুক্তি হয়নি। মুক্তি না এলেও কয়েক মাসের মধ্যে ওর পক্ষে এক আনন্দের সংবাদ এলো—ওকে বরিশাল জেলে বদলি করবে। বাউলে ইতিপূর্বে বরিশাল কোনও দিন যায়নি। বরিশাল যাবে বলে ওর আনন্দের সীমা ছিল না।

বরিশাল জেলে গিয়েও একইভাবে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে। সাধুলোকের প্রতি সবারই টান থাকে। বেশ কিছুদিন পর দেশের অবস্থা থিতিয়ে এসেছে। সেই সুযোগে

বাড়িতে একখানা চিঠি লিখবে বলে স্থির করে। এতোদিন কোনও চিঠিপত্র লেখেনি—পাছে কর্তৃপক্ষ ওর সব খবর পেয়ে যায়। এখন তো আর সে ভয় নেই, সব খবর পেলেও কোন কিছু আশঙ্কা করার নেই।

চিঠি দেখে জেলার সাহেব বললেন, – দ্যাখো সাধু, তোমার বাঙলা লেখা ভারি সুন্দর। আমি এক বিপদে পড়েছি ; মুজিব সরকারের এক কড়া আদেশ এসেছে, আমাদের সব চিঠি ও কাগজপত্র এখন থেকে বাঙলায় লিখতে হবে ; শুধু তাই নয়, কয়েদীদের যতো টিকিট আছে তা সবই একমাসের মধ্যে বাঙলায় লিখতে হবে। তা আমাদের জেলে কত কয়েদী আছে জানো ? জেলের 'কেষ্ট-ফাইল' মানে কেস-ফাইল বলছে কয়েদী আছে ৭৫৫৫ জন, তাছাড়া মেয়ে কয়েদী আছে ১২০০ মতো, সাকুল্যে ৮,৭৫৫ জন। এতো টিকিট একমাসে বাঙলা করে ফেলা কি সোজা কথা ?

বাউলে না ভেবেই বলে বসে,—ভালই তো, করলে তো একটা কাজের মতো কাজ হয় !

জেলার সাহেব বললেন, —তুমি তো বললে ভালই হয় ! তা তুমি লিখে দিতে পারবে ?

—আমি ! তিরিশদিনের মধ্যে হাজার আটেক টিকিট !! ...দেখি কতোটা করতে পারি।

খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তের মতো সায় দিলেও মনে মনে কিন্তু ওর জেদ এসে গেছে। কোনও চ্যালেঞ্জের কাছে বাউলের পিছু-পা হওয়া ধাত নয়, অভ্যাসও নয়।

কাজেই মাথাচুলকিয়ে একটু পরেই বললো, – –হুজুর পারবো, তবে আমাকে একখানা টেবিল ও চেয়ার আর সারা রাত ধরে কাজ করার মতো তেল-ভরা একটা হারিকেন দিতে হবে। ভালো দোয়াত ও কলমও চাই।

বাউলে যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে তাতে জেলার মহাখুশি। আরও খুশি হতে হলো চব্বিশ দিনের দিন যখন তাড়ার পর তাড়া টিকিট সব লিখে এনে হাজির করলো।

লাভের লাভ বাউলের জেল জীবন কমে এলো। শাস্তির মেয়াদের যা বাকি ছিল তার অনেকটাই জেলার রেমিশন করে দিলেন, মানে মুকুব করে দিলেন।

আঠারো

অবশেষে একদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বরিশাল-এক্সপ্রেসে খুলনায় হাজির। কোথাও দেরি করতে চায় না, এখন বাড়িমুখো। সীমানা পার হতে আবার ঝামেলায় পড়তে না হয়, তাই ঠিক করেছে, খুলনা থেকে ভোর সকালে সাতক্ষীরা স্টীমারে উঠে বেলা তিনটে নাগাদ যাবে আশাশুনি। তারপর তো এ সব জায়গা বাউলের জানাশুনা। আশাশুনি নেমে সোজা হাঁটাপথ ধরলো। মাঝপথে দেবহাটায় এক আত্মীয় বাড়ি এসে তাদের সাহায্যে ডিঙিতে ইছামতী পার হয়ে সন্দেশখালি হাজির। এবার পথেই পড়বে সাতজেলিয়া। ভারি ইচ্ছে হয়েছিলো আগেই মাধুরীর খোঁজ নিয়ে বাড়ি যাবে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আগে মা-র কাছে যাবে বলেই স্থির করে। পথে চেনাশুনা লোকে ওকে ধরে বাড়ি বসিয়ে সব কাহিনী শুনতে চায়। কিন্তু কেউ-ই মা-র কথা বলে না। তাতেই, বনে বাঘ সন্ধানে অভ্যস্ত বাউলে কিছু-একটা হয়েছে বলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কোথাও কাল-বিলম্ব না করে 'আসছি, তখন কথা হবে' বলেই সটান বাড়ি আসে।

ধারে কাছে এসে দ্যাখে, নদীর পাড়ে সবই ঠিক চলছে। একই রকমভাবে সব লোকের আনাগোনা, চরের উপর অনেক ডিঙি উপুড় হয়ে পড়ে আছে, দুখানা লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে

ঘাটে, এই মাত্র খেয়া এলো ওপার বাসন্তী থেকে, কয়েকখানা ভটভটি টানা চলে গেলো—হয়ত মাছ নিয়ে ক্যানিং-এ যেতে ব্যস্ত। ব্যস্ত, সবাই ব্যস্ত। বাউলে এবার ভেড়ি থেকে বাড়ির ছিলা-ভেড়ি ধরবে। কয়েকখানা ভ্যানও হাজির লক্ষ ঘাটায়—যাত্রীদের সাতজেলে নিয়ে যাবার প্রত্যাশা তাদের।

ছিলা ভেড়িতে পা দিয়ে কেমন যেন মনে হতে থাকে, ওর বাড়িটা বড়ই চুপচাপ। নিজেও চুপেচুপে পা ফেলে এগিয়ে এলো। থ-মারা ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ওর মন কেঁদে ওঠ। কেউ নেই! কেউ নেই বাড়িতে! কয়েকবার ডাকলো,—মা, ও মা। কোনও সাড়া নেই। কিন্তু ঘরগুলি তো সবই সুন্দরভাবে নিকোনো। মায় দাওয়া ও উঠোনও। যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। তবে? বাউলে আকুল হয়ে ডাকে, —মা! ও মা! এবারও কোনও সাড়া নেই। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে পড়ে বাউলে। পরক্ষণই রান্নাঘরে এগিয়ে যায়; ঝাঁপি-দরজার হেঁতাল নড়ির আগলটা ঘুরিয়ে ভিতরটা দ্যাখে। দেখে আরও অবাক। সমস্ত বাসন-কোষন মাজা ও উপুড় করে রাখা!... তবে!

ফিরে এসে আরেকবার 'মা-মা' ডেকে দাওয়ায় ঝোলা রেখে উবু হয়ে বসলো। বসতেই বিধবাপল্লীর মানুষেরা এসে হাজির, সঙ্গে মেয়েরাও আছে। ওদের দেখেই ওর বুকটা ধড়াৎ করে ওঠে। কারও মুখে হাসি নেই। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা-মা ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে চোখ মুছতে মুছতে বললেন,—কি কববো বাবা! উনি গত হয়েছেন আজ ক'মাস হলো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ সবাই। একান্তভাবে বাউলের রক্তজবা তিলকের দিকেই সবাই তাকিয়ে আছে।

বাউলেও মাথা নিচু করে চুপ হয়ে গেছে। একবার শুধু নিজের কাছে নিজে বললো,—তা হলে তো আমার শেষ চিঠিখানাও পেয়ে যাননি!

—না, এই নাও সে-চিঠিখানি।

বাউলেও চিঠিখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

কিছুটা সময় কেটে গেলে বাউলে জানতে চাইলো, —তা ঘরগুলির চাবি কোথায়? দেখছি দু-ঘরেই তালা দেওয়া।

—তোমার চাবি? সে তো মাধুরীদির কাছে। ও-তো দুদিন অন্তর আসে, বিধবাপল্লীর কাজকম্ম সেরে তোমার বাড়িতে আসে! নিজহাতেই সবকিছু করে, আর কাউকে কিছু করতে দেবে না। ঘর-বাইরে ঝাড় দিয়ে গোটা বাড়ি নিকিয়ে না দিলে যেন তার শান্তি হয় না! তা তাকে ডেকে দিচ্ছি, তুমি এয়েছো শুনলে এখনই ছুটে আসবে। ডাকতে পাঠাই তাহলে?

—না, না, ডাকতে হবে না। আমিই যাব তার কাছে। কাল সকালেই যাবো। আজ না, আমাকে তোমরা আজ একা থাকতে দাও। তোমাদের সকলের মঙ্গল তো? আজ আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ওরা সবাই চলে গেলে বাউলে একা একাই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। মা-কে কোথায় দাহ করেছিলো, তা সব জেনে নিয়েছে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে সে একা-একা সেই শ্মশান ঘাটে গিয়ে বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে। চারিদিকে মিশমিশে ঘন অন্ধকার। এক মা, শুভ্র নদীর প্রতিফলিত আবছায়া আলো ছড়িয়ে পড়েছে আলগোছে গাছের মাথায় মাথায়। একই আলোতে চরের শেষপ্রান্তে কচি গোলগাছের ঊর্ধ্বমুখী পাতা ক্ষীণভাবে চিকচিক্ করে উঠছে মৃদু বাতাসের দমকে দমকে। এই গোলগাছের গোড়ায় মা-র দাহ হয়।

কতোকথাই তো মনে পড়ে, মা ও তার জীবনের। ওপারের গাঢ় বন-রেখা বুঝি বাউলের মনকে শান্ত করে দিতে চায়। দূরে হলেও, এখান থেকে সোজা দক্ষিণে ধূপনির নেতো-ধোপানির মন্দির। অতীতের স্মৃতিজড়িত ধ্বংসস্তূপে পরিণত এই মন্দির সুন্দরবনের এক মহা সম্পদ। কেন জানি, আজ সেই মন্দিরের কথা মনে হোল বাউলের। দুহাত তুলে প্রণাম জানালো আর নিজের মায়ের কাছে শক্তি কামনা করলো। মা-ও যেমন তার জীবনকে ঘিরে ছিলেন, বনও তো তেমনি তার জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছে—শক্তি দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে, দিয়েছে প্রশান্তি।

সেই প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এলো শ্মশান থেকে গভীর রাতে। বাকি রাতটা দাওয়ায় শুয়ে আর আধোঘুমে কাটিয়ে দিলো। ভোর না হতেই দু-একবার 'মা-মা' ডেকে সব কাজ সেরে নিজের পুকুরে চান করে যেন নতুন জীবনে পদার্পণ করলো। এই পুকুরটা আর কিছুই নয়, একটা ডোবাকে কেটে একটু বড় করে নেওয়া নিজহাতেই। মায়ের সুবিধা আর বিধবাপল্লীর জল-ব্যবস্থা করার জন্য এই পুকুরের পরিকল্পনা। আশ্চর্যভাবেই এই পুকুরের জল বেশ মিষ্টি। নোনা দেশে এমন জল পাওয়াই দায়। বাউলে সবসময় বলতো আমার মায়ের আশীর্বাদেই তোমরা এই মিষ্টি জল পেয়েছো। মায়ের দেওয়া মিষ্টি জলে চান করে এবার যেন আরও শান্ত হলো। ওর যে এখন মাধুরীর কাছে যেতে হবে।

আগেরদিন সবাই মাধুরীকে খবর দেবার জন্য উশখুশ করছিলো। কিন্তু মাধুরীর কথা সামান্যতম উঠলেই বাউলে তৎক্ষণাৎ তাদের কথার মাঝেই বলে,—না, না, কিচ্ছু বলতে হবে না। হয়তো কথা পাড়তে গিয়েই ওরা বলে,—তা মাধুরী আমাদের ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। ভারি···

—না না. মাধুরী লক্ষ্মী না দুষ্টু মেয়ে তা আমি কাল সকালে গিয়ে ওর কাছ থেকেই জেনে আসবো। তোমরা আমাকে এখন একটু শান্ত হয়ে বসতে দাও।

সকালে চান সেরে এসে ভালো করে এঁকে দিলো ওর ত্রি-পুণ্ড্র-লাঞ্ছন। আজকে তিলকের টানগুলি আরও চকচকে লাল। বুকের লোমের উপর টানা তিলকগুলি জ্বল-জ্বল করছে ওর ফতুয়ার আলগা বোতামে। উঠবার সময় বড় রুদ্রাক্ষের দানাগুলি বুকে দুলে উঠতেই ওর মন যেন নতুন তেজে জেগে উঠলো।

বাউলে ছুটেছে, কোথাও এতটুকু দেরি করতে চায় না। একখানা ভ্যান পেলে হতো। এই ভোর-সকালে ভ্যান পাবে কোথায়? আর পেলেই বা তার পয়সা কোথায়? ছুটেছে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে। সাতজেলে মাধুরীর বাড়ির কাছে ওর বুক দুরদুর করে ওঠে। সবুরের সঙ্গে প্রথমেই দেখা—দেখা হতেই সবুরের আনন্দের সীমা থাকে না। বলে,—বাউলেদা' বাউলেদা তুমি এসে গেছো। এসে গেছো!

—এসে গেছি তো দেখতে পাচ্ছিস; বল খবর কি? তোরা সব ভালো তো? তুই দেখি অনেক বড় হয়ে গেছিস?

—ভালো তো আছিই, দিদি কিন্তু এখানে নেই। কোথায় জানো? পাশেই দয়াপুরে। রাইচরণ মিস্ত্রীর বাড়ির পাশেই। সেখানে গেলেই দেখা হবে।

শুনতেই বাউলে যেন চুপ হয়ে গেছে। সবুরকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে পরমুহূর্তে ছুটলো দয়াপুরের পথে। ছোটার মাঝে আজে-বাজে নানা কথা মনের মধ্যে ভাসে—আশঙ্কার কথা, আনন্দের কথা, বিস্ময়ের কথা। শুধু ছোটার আগে সবুরকে বলে এলো,—যা, তুইও কাপড়চোপড় পরে আমার পেছনে-পেছনে আয়, আসবি তো! আসবি

তো ! আসিস্ ।

যুবক সবুরকে আর কতো পেছনে ফেলবে বাউলে। দয়াপুর পৌঁছতেই সবুর ধরে ফেলেছে বাউলেদাকে। মনের প্রশ্ন জেনে নিতে পারতো হয়তো সবুরের কাছ থেকে—কিন্তু সে ইচ্ছা হলো না, আর সবুরও দ্বিধাগ্রস্ত কোনও কিছু আগে থাকতে বলতে।

বাউলে খিড়কি দরজায় এসেছে, মাধুরীও সদ্যস্নাত হয়ে এসেছে। মাধুরীর কাছে এর মধ্যেই উড়ো খবর আসে, বাউলেদা জেল থেকে ফিরেছে, কোথায় কে যেন দূর থেকে বাউলেদাকে দেখেছে। কাজেই সকাল সকাল চান্ সেরে পরিষ্কার শাড়ী পরে কপালে ও সিঁথিতে রাঙা সিঁদুরের ফোঁটা ও টানা দিয়ে বাউলেদার সামনে এসে দাঁড়ালো আর গড় হয়ে প্রণাম জানালো।

প্রথমে থ মেরে গেলেও, পরমুহূর্তে নিচু হয়ে মাধুরীকে হাতে তুলে নিয়ে হাসি-মুখেই বললো,—বাঃ ভারি সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে।

কথাটার মধ্যে বিদ্রূপ থাকতে পারে মনে করে মাধুরী তার মনের কথা প্রকাশের জন্য আঁকুপাঁকু করে উঠলো। বললো,—তুমি যাই মনে করো, আগে আমার কথা শুনতে হবে, বাউলেদা !

—বলো মাধুরী, তোমার কি কথা ?

—আমি যে পাগোল হয়ে উঠেছিলাম। শেষ পর্যন্ত কিনা আমাদের দিদিমণিও। মা ও বাবা কতদিন তো আমার পিছনে লেগেছিলেন। কিন্তু শেষমেষ দিদিমণি কি বললেন জানো ?

—বলো মাধুরী, তুমি নিশ্চিন্তে বলো…বলো !

—দিদিমণি বললেন, দ্যাখো তুমি দশের মধ্যে কাজ করো, দশের মধ্যে কাজ করতে মেয়েদের এক মহা আপদ আছে। তোমার মতো সোমত্ত যুবতীর অনেক কথা শুনতে হবে ! অনেকের তোমার দিকে তাকিয়ে চোখ টাটাবে। তুমি যতো শীঘ্র পারো বিয়ে করো। বলবে তো বাউলেদার কথা। আমি নিশ্চিত জানি, সে তোমাকে আশীর্বাদ করবে। আমি হলফ্ করে বলতে পারি, বাউলেদার ভালবাসা ম্লান হবার নয়। আজ প্রায় চার বছর তো তাঁর খোঁজ নেই। কিন্তু অমন লোক আর হয় না। কবে আসবে তার কোনও ঠিক নেই। যদি ইতিমধ্যে কোনও দুর্ঘটনা তোমার হয়ে যায়, তখন বাউলেদাই আমাকে দায়ী করবে। তুমি আর দ্বিধা করো না। বাউলেদার ভালবাসা ও আশীর্বাদ তুমি পাবেই। …পাবেই তুমি।

—ভালবাসা ও আশীর্বাদ !! বলেছে এই কথা ?

—হ্যাঁ বাউলেদা, তুমি বলো তোমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ পাবো কিনা ?

বাউলের একহাত তখনও মাধুরীকে ধরে আছে, এবার আরেক হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে ধরে মাধুরীর মাথায় হাত দিয়ে বললো,— নিশ্চয় মাধুরী, তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ দুই-ই পাবে। তোমার মতো মেয়েকে ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাতে না পারলে কাকে আর জানাবো !

আলিঙ্গন মুক্ত মাধুরী দ্বিতীয়বার গড় হয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

মাধুরী এবার ছুটে যায় বাড়ির ভেতর। সেই ফাঁকে মাধুরীর স্বামী ধীরু কয়ালের সঙ্গে বাউলে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। বাউলের তো গল্পের অন্ত নেই। জেল থেকে সবে এসেছে। কাজেই জেলখানার নানা গল্প পেড়েছে।

এমন সময়ে মাধুরী ছুটে এসে এক তাড়া চাবি, আরেকটা মাটির ভাঁড় এনে দিলো। বললো,—নাও বাউলেদা, এই নাও তোমার বাড়ির চাবি, আর এই ভাঁড়।

বেশ করে পলি মাটির প্রলেপে মুখটা আঁটা ভাঁড়—দেখে ঠাট্টা করে বাউলে বললো,—কিরে বাপু ! কোনও সাপ-টাপ তো রেখে দাওনি !!

তখন মাধুরীর চোখে জল এসে গেছে। বলে, —না বাউলেদা, অমন কথা বলো না ! মা মৃত্যু-শয্যায় বলেন, এই ভাঁড়ে কিছু টাকা বেদে বাউলের জন্য জমিয়ে রেখেছিলাম, তুমিই হাতে করে বাউলেকে দিও ! বলেই মাধুরী বিন্যস্ত চুলের আড়ালে মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সেই কান্না ঠেকাতে গিয়ে বাউলের হাত চোখের জলে আর সিঁথির সিঁদুরে মিশে লাল হয়ে ওঠে।

উনিশ

বছর না ঘুরতেই এ কে নতুন মাধুরী। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মহীয়সী নারী। শুধু নারী নয়, মা-ও বটে। এখন সে বাউলেদার সঙ্গে প্রায় শাসিয়ে কথা বলে। বলে, —তোমার বিয়ে করতেই হবে। কতোদিন এমন একা-একা থাকবে ! এতোদিন যাহোক মা ছিলেন। এখন ? তা হয় না, তোমার বিয়ে করতেই হবে। আমিই বা কতোদিন আর তোমার ঘর আর উঠোন নিকোবার কাজ করবো !

এমন বলার অধিকার ছিলো মাধুরীর। সেই অবধি, সেই জেলে যাবার কাল থেকে এ-বাড়ির দায়িত্ব যেন মাধুরীর ওপরে ছিলো। আর সেই সঙ্গে ছিলো বাউলেদার হাতে গড়া 'বিধবাপল্লীর' কাজকর্ম। তাই এই দাপটি মাধুরীর এমনি-এমনি আসেনি। এ ভালবাসার দাবী।

দাবীও কাজে পরিণত করতে মাধুরীর দেরি হয় না। সাতজেলের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে-শাদি করিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি দেখতেও মিষ্টি, শুধু মিষ্টি না, ডানপিটেও—যেমন কিনা ভয়ঙ্কর বনের আওতায় ভাটি অঞ্চলে মেয়েরা গড়ে ওঠে। সে স্রোতের নদীতে ডিঙি চালাতেও জানে যেমন, তেমনি ধান কুটতেও ভালো জানে। তার চেয়ে বড় কথা মাধুরীর কাছ থেকে সে অনেক গানও শিখে ফেলেছে। মাধুরী জানে, এমন মেয়েকে বাউলেদা অবহেলা করতে পারবে না।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটে। যে-ঘটনা আবার নতুন করে মাধুরী ও বাউলেকে এক নতুন সংগ্রাম ক্ষেত্রে একত্র করে দেয়। এবারের ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের পদধূলিতে ধন্য গোসাবার সংস্কৃতি কেন্দ্র নয়, সামাজিক বিপ্লবী কর্মধারার ধারক ও বাহক রাঙাবেলেও নয়, মায়া ও মমতা ভরা দুটি বিধবাপল্লীও নয়—এবার পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ, সর্বাপেক্ষা তেজোময় এবং সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময় সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মাধুরী ও বাউলেকে একত্র করে দেয়। কেমন করে বন্য ও হিংস্রতম ব্যাঘ্রের এই দুর্মতি হলো তা ভাবতেও অবাক লাগে। কেউই আজ অবধি এর কূলকিনারা করে উঠতে পারেনি।

সমকালে বনে বাঘ মারার আর কোনও উপায় ছিলো না। ১৯৭৫ সালে টাইগার প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। শুধু বাঘ মারা নয়, বাঘ মারার কোনও ফিকিরের সন্ধান পেলেও ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে। ফলে বাঘ মারা হয়তো কমেছে কিন্তু বাঘের হাতে মানুষ মরার ঘটনা মোটেই কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। বাঘে কত লোককে যে মেরে ফেলে তার সঠিক হিসাব পাওয়া এক দায়। কেননা, চাষীরা, মৌলিরা বা জেলেরা বাঘের হাতে মারা পড়লেও তার সংবাদ বন-কর বা টাইগার প্রজেক্ট অপিসে পৌঁছে না। বাঘের হাতে মরার

কথা জানালেই, তখনই উল্টে তাদেরই দায়ী হতে হয়—নিশ্চয় তারা বাঘ মারতে গিয়েছিলো। আর সে মামলা থেকে রেহাই পাওয়া জলের মতো টাকা খরচ করেও হয় না। কাজেই কেউই বাঘের হাতে মরার খবর দেয় না; বলে, কুমীরের পেটে গেছে, না হয় সাপের কামড়ে মরেছে।

এই অবস্থায় বাঘেরা নিশ্চয় লাই পেয়ে গেছে। এ যাবৎ অন্য কিছুতে না হোক, বন্দুকের বড়ো ভয় করতো। বন্দুকের নল দেখলেই ওরা ক্ষেপে উঠতো—লাঠি-তলোয়ারকে ওরা থোড়াই কেয়ার করে। এখন ওরা দেখছে, বন্দুকে ওদের কেউই মারে না। বন্দুক শুধু ফাঁকা আওয়াজ করে। এখনও সম্পূর্ণ না হলেও টাইগার প্রজেক্টর ফলে দিনে দিনে এই বিশ্বাস ওদের মনে আরও প্রগাঢ় হবে।

সুন্দরবনের রক্ষিত বনে এই আইন চালু হওয়াতে বাঘেরা উল্টে বনাঞ্চল ছেড়ে মানুষালয়ে ভ্রমণ করতে শুরু করেছে। আগেও করতো, তবে এখন যেন বেশি বেশি। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষেরাও সমান ভয়ালো: বন্দুক দিয়ে না হোক, লাঠি-সোটা-বল্লম নিয়ে সমবেতভাবে সুযোগ পেলেই বাঘ মেরে কুপিয়ে মাটির তলে পুঁতে ফেলে। আইনের ভয়ে দামী চামড়াটাও সহসা বিক্রী করার মতলবে কলকাতায় আসতে সাহস পায় না। তবে চোরাগোপ্তা ব্যবসায়ও যে নেই তা কি করে বলা যায়। তা না হলে কলকাতার চামড়ার দোকানে অতো বাঘের চামড়া কি করে পাওয়া যায়!

ঘটনাটি ঘটে ১৯১৭ সালে মাধুরীর নিজস্ব গ্রামে, দয়াপুরে। ওদেরই নিকটতম পড়শী রাইচরণ মিস্ত্রীর বাড়িতে। বাঘটি সন্ধ্যের গোনে এই পাড়ায় এসে উঠেছে। উঠেই দু-তিনটা বাড়িতে গরু ও ছাগল খেয়েছে। এই সব বাড়িতে গোয়ালগুলি ছিলো শোবার ঘরের বেশ সামনে, আঙিনায় ঢুকবার মুখেই। গন্ধ পেতেই গরু-ছাগলরা তো তারস্বরে ডাকতে থাকে। পাডায় সাড়া পড়ে যায়—বাঘ এসেছে। পাড়ার চাষীরা সবাই যে যার ঘরে। সাড়া পড়তেই যে যার খিল এঁটে দিয়ে চিৎকার করতে আর টিন পেটাতে থাকে। অন্ধকারে কি আর করবে, কারও কাছে তো বন্দুক নেই। মহা সোরগোল—চিৎকার আর টিন পেটানো এবার আশপাশের গ্রাম-গুলিতেও শুরু হয়েছে। বাঘটির বয়স সাত-আট বছর, সবে যৌবন প্রাপ্ত।

চাষী আর জেলেদের বাড়িগুলি সবই ভেড়ির কোল ঘেঁষে বরাবর লম্বা লাইন হয়ে আছে। একদিকে ভেড়ি, অপরদিকে ধানক্ষেতের মাঠ, তাও আবার গলা-জলে থৈ-থৈ করছে।

ভয়ঙ্কর চিৎকার আর টিনের শব্দে—বাঘ হকচকিয়ে যায় নিশ্চয়। একবার মাঠের জলে বেশ শব্দ করেই নেমেছিলো। গ্রামের লোকেরা ভেবে নেয়, হয়তো দুশমন মাঠ পেরিয়ে ওপার চলে গেল। তবুও ওদের কেউই দরজা খুলে বাইরে বেরুবার সাহস করেনি, উচিতও মনে করেনি। যা করার, তা করা যাবে কাল সকালেই। কোনও বাড়ি থেকে বাঘের চলাফেরার শব্দ আর পায়নি। বাঘ বড়ো নিঃশব্দ পদচারি। বিশেষ করে শিকার-মত্ত বাঘেরা।

রাইচরণ মিস্ত্রীর বাড়িটা মাটির দেয়ালে ঘেরা, আর উপরে খড়ের দোচালা। পাশাপাশি দুটি কামরা। দুটি কামরার চারদিকেই মোটা মাটির দেয়াল। তার মধ্যে একটি কামরা ঘিরে দুদিকে বারান্দা। অন্য কামরাটিতে বাড়ির সবাই মিলে ঢুকে দরজাটা আগল দিয়ে দেয় নানা কায়দা ও কসরৎ করে। বাকি ঘরটির দরজা বারান্দা ঘুরে পূব দিকটায়। তাড়াতাড়ি আশ্রয় নিতে গিয়ে সে দরজাটা হাঁ করে খোলাই পড়েছিলো।

এদিকে বাঘ নিশ্চয় ধানক্ষেতের গলাজল ঠেলে দীর্ঘপথ এগুতে চায়নি। ফিরে এসেছে চুপিসারে সাঁতরে সাঁতরে। এসে উঠেছে মিস্ত্রীর ঘরের পেছনে। গায়ের জল ঝাঁকা মেরে ঝেড়েছিলো বলে জানা যায় না, তবে তেমন করলেও নিঃশব্দেই করেছে। সামনে খোলা দরজা পেয়ে নিরাপদ আশ্রয় নেবার লোভেই বোধহয় সুড়সুড় করে ঐ ঘরটাতে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই কথা নেই বার্তা নেই হয়তো সটান শুয়ে পড়ে। সারা রাত কাটায়। কি মতলব ছিলো ওর মনে, তা বোঝাই দায়।

ভোর হয়েছে। সূর্যরশ্মির ছটা না এলেও গোটা এলাকা আকাশের আলোকে আলোকিত। ভোরের এই আলোকে ভয় কিসের! বনের বাঘ কি কুকুরের মতো কোণা ঘুপচিতে শুয়ে শুয়ে সারা রাত কাটাবে। বাড়ির একটি ছোট মেয়ে রোজকার মতো উঠোনে গোবর-জলের ছিটে দিচ্ছে। এমন সময়ে খোলা দরজার ফাঁকে দ্যাখে বাঘের ডোরা। ভাগ্যি আঁতকে ওঠেনি। পাশের বাড়ি মাধুরী সবে উঠে উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছিলো। তার দিকে উবু হয়ে নিঃশব্দে ছুটে গিয়ে আর কথা বলতে পারে না, শুধু দু-হাত দিয়ে হাড়ির মতো মুখ দেখায় আর বারবার আঙুল দেখিয়ে বোঝাতে চায়—ঐ ঘরে…ঐ ঘরে।

মাধুরীর বড়ো লোভ, বাঘের বাউলেকে তো সে ভালোভাবেই দেখেছে, বাঘকে সে একবার চোখের দেখা দেখে নেবে। সবাই জেগে উঠলে বাঘ নিশ্চয় সরে পড়বে, তখন হয়তো আর দেখতে পাবে না! দেখতে চায়, একবারটি সে দেখতে চায়। এই অবস্থায় বাউলেকে একবার স্মরণ করারও ফুরসুত নেই ওর। কোমরে আঁচল ভালো করে জড়িয়ে বুড়ো আঙুলে ভর করে টিপে টিপে বারান্দায় উঠে দরজার আড়ালে পাশ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তারপরেই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক দরজার মাথায় মোটা শিকলটা একবার নজরে পড়ে। কান খাড়া করে আছে, যাতে ঘরের ভেতর থেকে ছুঁচ পড়ার শব্দও ধরতে পারে! কিন্তু মাধুরী কতোটাই বা সতর্কিত হতে পারে। বনের এই হিংস্রজীব যে শিকারের গন্ধ, শব্দ ও ছায়া কতটা তীক্ষ্ণভাবে ধরার ক্ষমতা রাখে, সে খবর তো মাধুরী জানে না। মাধুরীর এখন যে মত্ততা এসেছে তাতে ও-সব জানবার আবশ্যকই বা কি! চকিতে দু-হাত উঁচু করে একহাতে শিকলি আর আরেক হাতে দরজার অন্য কপাটটি ধরে নিজের দেহকে যেন ধাক্কা মেরে ঝমাৎ করে খোলা দরজার সামনে এনে দাঁড় করালো…এক ঝলকে যা দেখলো তা জীবনে ভুলবার নয়—বলিষ্ঠ লোমশ দুই বাহু সামনে বাড়িয়ে ঘাড় যেন এইমাত্র উঁচু করে দরজার দিকে চোখ মেলে ধরেছে অপূর্ব চেহারায়, ভয়ালো কিন্তু হাল্কা আগুনের মতো সৌন্দর্যময়। ক্যামেরার ক্লীকের মতো পলকের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে ধরা পড়ে শুধু ওর চোখের আরশিতে নয়, ওর ধুক্‌ধুক্ করা বুকের মাঝেও।

তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার অমোঘ তাগিদেই সশব্দে কপাট ভেজিয়ে কম্পিত হাতে শিকলি টেনে দেয়। দিয়েই অন্য কোনদিক না তাকিয়ে উবু হয়ে বারান্দা থেকে পড়ি-মরি করে ঝাঁপিয়ে উঠোনে পড়েই চিৎকার কর ওঠে। কই! চিৎকার তো হয় না!! কোমল হাতে বারবার জোরে গলায় হাত বুলিয়ে আর ঢোক গিলে স্বর বের করে বললো—আঘ্, আঘ্,…বাঘ! বাঘ!

উঠোনে মাধুরীর গলা শুনে যে যার সব বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কি ব্যাপার তা জানতে মাধুরীকে তখন কোথায় পাবে ওরা। মাধুরী নিজের বাড়িতে ছুটে সবুরকে টেনে তুলে বলতে বলতে হাঁপাচ্ছে,—যা, যা, শীগ্‌গির যা, জামা পরতে হবে না, যা ছুটে বাউলেদাকে ডেকে আন্। ঐ দ্যাখ ঐ ঘরে বাঘ আটক পড়েছে। আতঙ্কে আমিই শিকলি দিয়ে দিয়েচি। যা, নোড়া, নোড়া, জলদি নোড়া। বাউলেদাকে বলবি, আমিই ডেকেছি, বন্দুকটাও নিয়ে

আসে যেন।

জামাটা কাঁধে ফেলে আজও দোড় কালও দোড়—সবুর এসে বাউলেদাকে হাঁপাতে হাঁপাতে সব বলে। শুনতেই বাউলে যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বলে,—চল্, ছোট্। রাস্তায় সব শুনবো।

বন্দুকটা সেদিন বাড়িতেই ছিলো। অনেক পুরনো, তবুও হাজার জল-ঝড়ে চামড়ার সিলিঙ্গটা এখনও আছে। ঘরের খুঁটিতে সেই কাঁধ-ঝোলানিতে বন্দুকটা টাঙানো ছিলো। সকালের নদীর হাওয়াতে বন্দুকটা আজও ঈষৎ দুলছিলো। বাউলে তা দেখে একবার শুধু বললো, —তুই বড়দলের মতো আজও দুলছিস, চল আজ তোরও পরীক্ষা, আমারও পরীক্ষা। বাউলে চারটা এল জি বুলেট নিতে ভোলেনি। বাঘের সঙ্গে লড়া-পেটা করতে এল জি-ই বাউলের পছন্দ।

গোসাবার খেলার মাঠে পড়তেই বাউলে বললো,—মরদ! দাঁড়া, আগে টাইগার প্রজেক্টে খবরটা দিয়ে আসি। তুই এখানে আড়ালে এসে বন্দুকটা ধর। —বলেই বাউলে একদমে সোজা তেতালায় দৌড়ে উঠেছে। হাঁপের ফাঁকে ফাঁকে বলতে চেষ্টা করে যেটুকু শুনেছে। প্রজেক্টবাবু বললেন,—তোমার বলতে হবে না, আগেই খবর পেয়েছি। তোমার আগেই হয়তো সজনেখালি অপিস থেকে বন্দুক ও বাঘের খাঁচা নিয়ে পৌঁছে যাবে। রেডিওফোনে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেছে। ডিরেক্টরও স্পীড্‌বোটে তোমার আগেই হাজির হবেন। তুমি যাও, ভ্যানে করেই যেও কিন্তু।

এই সাত-ভোরে ভ্যান কোথায় পাবে। পুকুরের ধারে একখানা ভ্যান মানে তে-চাকার সাইকেল পড়ে আছে। কিন্তু চালক নেই। নাই বা থাকলো, বাউলে নিজেই চালক হয়ে ভ্যান চালালো রেসের ঘোড়ার মতো। রাস্তায় বড়ো খানা-খন্দ। পেরে ওঠে না। চালাতে চালাতে বলে, —মরদ! নাম, নেমে পেছন থেকে ঠেলতে থাক; আমিও চালাই, তুই-ও ঠেল।

দয়াপুরে বেদে হাজির। তখনও টাইগার প্রজেক্টের লোকজন আসেনি।

—বাউলেদা! বাউলেদা! তুমি এসে গেছো! এসে দ্যাখো, কি কাণ্ড করে বসেছি। ঘরের দরজাটা খোলাই ছিলো। মেয়েটা খবর দিতেই দরজার সামনে গেছি। বাঘটা দেখে তো হতভম্ব। তোমরা যা বলো তা তো নয়। চুপচাপই ছিলো। আমি দেখেই শিকলি মেরে দিয়েছি। এখন তুমি এসে গেছো, যা করার করো। তবে আমার ইচ্ছা, বাঘটাকে মেরো না। না, মারবে না।

বাউলের কোনও কথা বা বাগাড়ম্বরের সময় এটা নয়। শুধু বললো, —নাও এই বন্দুকটা। ধরে রাখো। পাশে সরে যাও। ভয় নেই তোমার, ওতে গুলি ভরা নেই—বলেই একবার বন্দুকটা ভেঙে দেখে নিলো, গুলি ভরা আছে কি নেই।

মুহূর্তে সবাইকে ডেকে বললো,—বাঁশ আনো, খুঁটি আনো সবাই। একদল ঝাড় কেটে বাঁশ আনো। দ্যাখো কোথায় শক্ত দড়ি আছে।

একবার ঘরের পেছনটা দেখে এসে বললো,—যা বাঁশ আছে তা দিয়েই বারান্দাটা আগে ঘিরে শক্ত বেড়া বেঁধে ফেলো। কই কাজে লাগো। দেরি না। এমন বেড়া যাতে বাঁশ থেকে বাঁশ তিন আঙুলের বেশি ফাঁক না থাকে। ষাট-সত্তোর মরদে কাজে মেতে উঠেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে শক্ত বেড়া বাঁধা হয়ে যায়। আশ্চর্য এতো হট্টগোলেও বাঘ কিন্তু চুপচাপ। একবার শুধু দরজায় ধাক্কা দেয়। তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই, হাঁকডাকও দেয়নি।

এমন সময়ে প্রজেক্টের লঞ্চ, খাঁচা, কাছি, দড়ি যাবতীয় লটবহর নিয়ে হাজির। সঙ্গে

মাঝি-মাল্লা, পাইক-বরকন্দাজ—প্রায় জনা বিশ। গ্রামের সব লোকই প্রায় তখন বাঘের খাঁচাখানা দেখতেই ব্যস্ত। বিশমন ভারি শাল কাঠ আর মোটা লোহার গরাদের খাঁচা। আর মাটিতে নামানো নয়। বাঁশে ঝুলিয়েই ঘুমন্ত বাঘকে লঞ্চে তুলতে হবে—তাই যে যার মতো অপরকে বোঝাতে লাগে।

প্রজেক্টের বাবু নেমেই বললেন, —বাউলে, তুমি এসে গেছো, আমাদের তাহলে আর ভাবনা নেই। তোমার পরেই সব ভার রইলো। এই নাও ঘুমপাড়ানি ছোটো বন্দুক ও তার গুলি, আর এই নাও ওষুধের গুলি মারবার পিস্তল।

বাউলের সব কিছু জানা আছে। বললো, —আপনাদের কারও কিছু করতে হবে না। যা করছি শুধু দেখে নেন। তবে লোকজন সব একপাশে সরিয়ে দেন, আর একটা গুলিভরা রাইফেল নিয়ে এইখানটায় বড়বাবু থাকুন। যদি তেমন বোঝেন বাঘটাকে চোট্ করে ঘায়েল করবেন ; আশা করি তেমন কিছু করতে হবে না। হ্যাঁ, তবে দড়িকাছি নিয়ে জনা দশেক তৈরি থাকে যেন। ঝমাৎ করে তারা যেন চারখানা পা বেঁধে ফেলে। লম্বা দুখানা কাঁচা বাঁশ অবশ্যই যেন থাকে। বেশ লম্বা বাঁশ। সবার আগে কিন্তু চট্ দিয়ে চোখমুখ বেঁধে ফেলতে হবে।

কথাগুলি সব দুবার করে করে বলে যাতে কোনও ভাবে অপরিষ্কার না থাকে। একবার ছুটে এসে মাধুরীকে বলে যায়. —দেখো যেন আমার বন্দুকটা আর কারও হাতে দিও না! বাঘটাকে আমি 'মনি ঘুমলো' করে দেবই। —কথাটা শুনে এতো শঙ্কা ও বিপদের মধ্যেও মাধুরী হেসে ফেললো।

বলেই ঘুমপাড়ানি বন্দুক হাতে নিয়ে আর ওষুধের পিস্তলটি গামছা-বাঁধা কোমরে গুঁজে কুটোর পালায় উঠলো। কুটোর পালাটা একেবারে বাঘের ঘরটা ঘেঁষে। পালার উপর থেকে এক লাফে ঘরটির চালে গিয়ে পড়লো বাউলে। তারপর মটকার চালের খড় টেনে অনেকখানি ফাঁক করে নেয়। সবাই ভাবছে অতো উপরে বাঘে নিশ্চয় বাউলেকে থাবার মাথায় পাবে না।

এবার ঘরের ভিতর টর্চ ফেলে গুলি মারার নিরীখ করছে বাউলে। সময় লাগে। কেননা ঘুমপাড়ানি গুলি পায়ে কিম্বা হাতে লাগলে কাজই হবে না, আবার মাথার ধারে কাছে লাগলে অক্কাও পেয়ে যেতে পারে। গুলি মারতে হবে ঠিক গলায়। আবার শরীরের অন্যত্র কোথাও লাগলে কোনও ফল হবে না। অবশ্যই গুলি করার তিন মিনিটের মধ্যে পিস্তল দিয়ে ওষুধের গুলিটা মারা চাই। ওষুধের গুলি ঠিকমত গায়ে না ফুঁড়লে বাঘটা কিছুক্ষণের মধ্যে মারা পড়তে পারে। কাজেই পিস্তলটা বাউলে ঠিকমতো দেখেশুনে এবার কোলের মধ্যে হাঁটুতে চেপে ধরে আছে।

পরপর বন্দুকে ও পিস্তলে চোট হবার পর বাউলে চুপচাপ মটকার মাথায় বসে পড়ে আর হাত উঁচু করে সবাইকে ইশারা করে, —কেউ নড়ো না, যার যার জায়গায় থাকো! —মিনিট তিনেক পরে মটকার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভাল করে দেখে এবার নিশ্চিন্ত। ঘাড় কাৎ করে হাতের উপর চিবুক রেখে দূর থেকে সবাইকে জানিয়ে দেয়, বাঘ এতক্ষণে ঘুমিয়ে গেছে। বড়বাবুকে চিৎকার করে বলে, —দড়ি কাছি ও লোকজন নিয়ে এখন দরজা খুলতে পারেন। তবু খোলার মুখে যেন রাইফেল নিয়ে তৈরি থাকেন।

দায়িত্ব সমাধার উদগ্র আনন্দে ঘরের চালার ওপর পা ছড়িয়ে বসে দুহাতে বন্দুক ও পিস্তল উর্দ্ধে তুলে ধরে সড়্ সড়্ করে ধপ্ করে উঠোনে নেমে পড়ে। পড়েই উত্তেজনার শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চাপা স্বরে নিজেকে শুনিয়ে উচ্চারণ করে— শাবাশ!

মাথা তুলে দ্যাখে, সামনে মাধুরী দাঁড়িয়ে। তার হাতে ধরা আছে বাউলের বন্দুকটি। এতো উত্তেজনায়ও বাউলে রসিকতা করতে ভুলে যায় না। বলে, —'মনি ঘুমলো' এবার পাড়া জুড়ালো'।

মাধুরী হাসতে হাসতে বলে, —য্যাও! আমাকে ঠাট্টা করছো!! দিদিমণি কাছে থাকলে তোমাকে শুনিয়ে দিতো!

—ও সব কথা নয়, আমাকে আগে একটা বিড়ি খাওয়াও তো, লক্ষ্মী!

বিশ

এখানেই ইতিকথা টানা যেতো। কেননা পরের ঘটনা সবই প্রায় বাঘটির জীবন-কথা। কিন্তু তা পায় মাত্র। এই ঘটনার রেশ আমাদের গোসাবা ও সাতজেলিযার মানুষদের পরেও প্রতিফলিত হয়ে পড়ে নানা রঙে। সেই রেশের আভা বাউলে ও মাধুরির ওপর পড়ে বৈকি!

বাঘটিকে যখন লঞ্চে আনে, তখন দয়াপুর অঞ্চলের গোটা মানুষ যেন লঞ্চের গায়ে। মানুষ এসে পড়েছে গোসাবা, রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া থেকে, এসেছে মরিচঝাঁপি, কাঁঠানখালি, কুমিরমারি, মোল্লাখালি, মেলমেলে, রাণীপুর, কচুখালি, ঝিঙেখালি মায় দুর্জনেখালি ও সুধন্যখালি থেকেও। মানুষে মানুষে ছয়লাপ—ছেলে, মেয়ে, মরদ ও বহু বুড়িরাও। এতো মানুষ এসে এতো আলোচনা করেও নির্ণয় করতে পারে না—কেনই বা এমন জলজ্যান্ত ও যৌবন উন্মেষে উজ্জ্বল বাঘ-পুঙ্গব মানুষের আশ্রয়ে এলো আর সারা রাত কাটালো মানুষের ঘরেই, মানুষের পাশেই! না পারুক, মানুষেরা কিন্তু বাঘটিকে পরম ভালবেসে ফেলেছিলো। তাকে নিয়ে চলে যাবে কলকাতায়, আর চিরতরে আশ্রয় দেবে চিড়িয়াখানায়, তাতেও এরা কম বেদনা বিধুর হয়নি।

লঞ্চ যখন ছাড়ে, বাউলে তখন চরের পলিমাটি ধরে হরিণের মতো আলগোছে ছুটে এসে মাধুরীকে সতর্ক করে দিয়ে গেলো, সে যেন তার ঐ বে-পাশি বন্দুকটা সযত্নে ও সতর্কে রাখে। সে-ও বাঘের সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানা যাবে। ফিরে আসতে তার দেরিও হতে পারে।

সুযোগ পেয়ে মাধুরী বললো, —বাউলেদা! আগামী মঙ্গলবার সাতজেলের হাট ; তুমি ওদিন সকালে অতি অবশ্য আসবে আর আমার এখানে খাবে! নেমন্তন্ন রইলো, বুঝলে।

লঞ্চ ছেড়ে যায় দেখে বাউলে আবারও হরিণের বেগে চরের পলিমাটির প্রলেপ এবার ছিন্নভিন্ন করে চলে গেলো। যাবার সময় মাঝপথে চিৎকার করে বললো, —নিশ্চয় আসবো, নিশ্চয়।

এমন আহ্বান প্রত্যাখ্যান কবার লোক নয় বেদে বাউলে।

ক্যানিং-এ লঞ্চ যখন এলো, তখন পুরো ভাটি। জল থেকে ঢালু চর প্রায় একশো হাত, পাকা ভেড়ির ধারে তো খাড়াই বিশ হাত। কেমন করে ত্রিশ-চল্লিশ মন বাঘ সমেত খাঁচাকে পিচ্ছিল ও খাড়াই পথে উঁচু করে তুলবে? কোনো পথ নেই, অপেক্ষা করতে হলো ছয় ঘণ্টা, পুরো জোয়ার আসার আশায়। দুপুর রাতে লরিতে তুলে সবাই মিলে রাত-ভোর এসে পৌঁছলো চিড়িয়াখানায়। এতক্ষণে বাউলে ও পাইক-বরকন্দাজরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ঘুমপাড়ানি বুলেটের মেয়াদ সাত-আট ঘণ্টা। মাঝপথে লরিতে বাঘের ঘুম ভাঙে। ছোট্ট খাঁচা, উঠে উবু হয়েও বসতে পারে না দয়ারাম। দয়াপুরের লোকেরা বাঘটির নাম

দিয়েছিলো —দয়ারাম। চিড়িয়াখানা কর্তাদের মোটেই পছন্দ হয় না নামটা। তাঁরা এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেন। সবাই মিলে সানন্দে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেন এক উৎসবে বাঘটির নাম-করণ করে দিয়ে যেতে।

বাঘটিকে যে-ই দ্যাখে, সে-ই ভালোবেসে বসে। ইতিহাসটা শুনলে তো আরও চমকিত হয়, গদোগদো হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী নাম দিলেন—সুন্দরলাল। উৎসবে সবাই এসে হাজির জীবপ্রেমিকরা তো বটেই। বাউলেও এসেছে। দেখেশুনে সে দূরে, বেশ দূরে আরেকটি খাঁচা ঘরের অলিন্দে বসে। সুন্দরলালের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে। দুদিনে খাঁচার মধ্যেও সে যেন আরও সুন্দর ও সবল হয়ে উঠেছে। সুন্দরলালও বারবার দূরের দিকে তাকায়। ভিড়ের লোকেরা তো জানে না, বনে বাঘের চরিত্র। বাঘ কখনও নিকট সামনে তাকাতে অভ্যস্ত নয়। বনে ধারে কাছে সে কাকে দেখবে ? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে তার কাছে এগুতে সাহসী হবে ! বনের বাঘের চরিত্রগত অভ্যাস দূরের দিকে তাকানো বেশ দূরের দিকে গলা বাড়িয়ে তাকানো। বাউলেও চোখাচোখি হবার জন্যই অতো দূরে গিয়ে বসেছিলো। কলকাতার লোকে ভীড় করেছে গিয়ে সুন্দরলালের খাঁচা-ঘরের রেলিঙের ধারে। আর বনকর বাবুরা, প্রজেক্ট-কর্তারা ! তারা তো তাদের মতলবে মুখ্যমন্ত্রীর আশপাশে সেজেগুজে ঘুরতেই ব্যস্ত— যেন তারাই বাঘটাকে ধরেছে, কলকাতাবাসীদের কাছে যেন এই উপহারটা আনার সর্ব গৌরবটা তাদেরই প্রাপ্য।

একা-একা দূরে বসে বাউলের নানা কথা মনে পড়ছে। মনে মনে কথাও বলছে সুন্দরলালের সঙ্গে : কেন তোদের মতো সুন্দর জীবকে গুলির আঘাতে আমরা মারি ! না, আমরা তো তোদের মারবো বলে একটা দিনের তরেও বনে বন্দুক হাতে উঠি না। তোরাই আমাদের ভুল বুঝিস। আমরা বনে যাই মাছ, মধু, কাঠ, পাতা কাটতে। তোরাই তো আমাদের ক্ষিপ্ত করে তুলিস্। দেখলি তো, তুই এসেছিলি আমাদের এক গ্রামে ; মেরেছি আমরা তোকে ? অমন সুন্দর বলদৃপ্ত চেহারার জীবকে কি মারতে কারও মন চায় ! মাধুরীরও আকুল আবেদন ছিলো তোকে যেন আমি মারি না। না, মারিনি। মারতে চাই না। তোরা সুন্দরবন থেকে উজাড় হয়ে গেলে এই বনকে কেউই আর সুন্দরবন বলবে না ; বলবে কাঠ-খোট্টা কাঠের বন।

উৎসব শেষ হতেই বাউলে একা-একা বাড়ি ফিরে আসে। করবেই বা কী ? কেউই ওর খোঁজ করলো না। খোঁজ করবেই বা কে ? সবাই তো যে-যার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছে !!

একুশ

বাড়ি ফিরে বেদে বাউলে বাজারের মুখটায় ফলের দোকানের চৌকিতে বসে জিজ্ঞাসা করে,—কিরে বিশু। সাতজেলের হাট মঙ্গলবার, তাই না ?

বাউলে সবই জানে, তবু কেন জানি, বিশুকে জিজ্ঞাসা করলো। বিশু তার নতুন এক ভক্ত। বিধবাপল্লীর ধলা-মাসির ছেলে। নামটা ধলা হলে কি হবে, রঙটা পানের খয়েরের মতো কালো। বিধবা কিন্তু ফিরে বিয়ে-শাদি করেনি। ছেলেটিকে নিজেই মানুষ করেছে ঘরে বসে কাঠি দিয়ে মাদুর বোনে। কাঠি-গাছের চাষ শিখে নেয় রাঙাবেলের সমবায় সমিতি থেকে। মোটামুটি তা থেকে সংসার চালায়। সম্প্রতি বাউলে এই ফলের দোকান দিয়েছে বিশুকে সঙ্গী বানিয়ে।

বিশু বলে, —মঙ্গলবারই তো হাট, তা নয় তো কবে ? কেন ? ফল নিয়ে যাবো নাকি

হাটে বিক্রী করতে ?

—না, তা বলছি না। এমনিই শুধোচ্ছি।

এমনি-এমনি তো বটেই। কিন্তু বাউলের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে মাধুরীর নেমন্তন্নের সঠিক দিনটা নিয়ে। বোধহয় দৃঢ়ভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চায়।

পরদিন বাউলে সকালেই সাতজেলের পথ ধরেছে। ঐ পথেই যাবে দয়াপুর। ধীরে ধীরে হেঁটেই যাবে গোটা পথটা। কাঁচাপাকা মেশানো পথ। দুধারে নানা ধরনের গাছপালা। একটা নোনা-আতা গাছ ফলবতী হয়ে নুইয়ে পড়েছে প্রায় বাউলের চোখের সামনে। হঠাৎ থেমে গিয়ে বাউলে ফিরে এলো গোসাবায় ওর নিজের ফলের দোকানে— না, আজ খালি হাতে যাওয়া ঠিক নয়। ভেবেই এক থলি ভর্তি করে নিয়ে চললো নানা জাতের, নানা সোয়াদের দেশী-বিদেশী পাকা-পাকা ফল ; তার মধ্যে কাশ্মীরি আপেলই ছিল বেশি। এবার বাউলের মনটা শান্ত ও রসালোও হলো এই ভেবে—না, আমিও আজ মাধুরীকে খাওয়াবো। লেন-দেনটা এক পক্ষে হয় না। ভালবাসাটাও না।

এদিকে মাধুরীও তৈরি। ঝাল-ঝোলে-অম্লে বাউলেদাকে পরিতৃপ্ত করে দেবে আজ। কাজের অন্ত নেই। সবুর আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করেছিলো। ডেকে বললো,—যা না লক্ষ্মী, ভালো দেখে কলা-পাতা কেটে আন : বড় দেখে কাটবি। দয়া-কলা গাছের পাতা আনবি, বড়ো ও মোটা।

চাষীবাড়ির রান্নাঘর হলেও বেশ বড়ো-সড়ো। দুটি ঝাঁপই খুলে দিলে গোটা ঘরটা আলোকিত হয়ে যায়, বেশ খোলামেলা মনে হবে। ঘরের এক কোণে হেঁশেল। বাকিটা বসে খাবার প্রশস্ত চত্বর মতো। গোবর-জলের প্রলেপ শুকিয়ে এখন তা ঝক্‌ঝক্ করছে। এখানে বসিয়ে মাধুরী খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে। বাউলেদাকে আর সেই সঙ্গে ভাই সবুরকেও। দুখানা করে কলাপাতা ধুয়ে-মুছে এগিয়ে দিয়েছে সবুর।

মাধুরী হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওঘরের কাঠের বড়ো পেটরা থেকে একখানা আসন নিয়ে আসে। আসনখানা ওরই নিজহাতে বোনা। পুরনো শাড়ির রঙ-বেরঙের পাড় দিয়ে বোনা। বুনেছিলো রাঙাবেলের মাদুর-শালায় দিদিমণির সঙ্গে বসে বসে। পাড়ের রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে ভারি সুন্দর আঁকজোক করা। কারো নামে উৎসর্গ করে রাখেনি, সুন্দর বলেই এতদিন সযত্নে রেখেছিলো। সেখানেই আজ বাউলেদাকে খেতে বসতে দেবে।

গতকাল মাধুরী সাতজেলের হাটে যায় নিজেই। পছন্দমতো শাক-সবজি ও মাছ তো এনেছিলোই, সেই সঙ্গে এনেছিলো অনেকগুলি পোড়া মাটির লাল ছোটো ছোটো বা[illegible] ; তাতেই এতক্ষণে ব্যঞ্জনগুলি ভর্তি করে আনমনে সাজাচ্ছিলো। খিড়কিতে একটা শব্দ হতেই সবুরকে বলে, —কিরে! বাউলেদা তো এখনো আসে না, ভারি ভাবনা হচ্ছে। ভাবছি আবার কোনও 'সুন্দরলাল' ওকে মাতিয়ে নিলো কিনা!...

বলতে বলতেই বাউলেদার ডাক,—মাধুরী! কই তুমি!

ভাই-বোন দুজনে ছুটে এসে বললো, —বাব্বা! কি ভাবনায় ফেলেছিলে বাউলেদা!

বাউলে ঝমাৎ করে সায় দেয়,—তাহলে তো আমার দেরি করেই আসা উচিত ছিলো, আরও কিছুক্ষণ অন্তত আমাকে নিয়ে ভাবতে!

—যাও, তোমার দুষ্টুমি করতে হবে না। দেরি করো না, একটুও না। হাত-পা ধুয়ে এসো। তোমার তো আবার পূজোআহ্নিক আছে।

—এবার যদি আমি বলি, যাও! না, না, কপালে ত্রিপুণ্ড্র-লাঞ্ছন দিই বলে তোমরা ভেবেছো আমিও পূজা-আহ্নিক করি। মোটেই না! ও-বালাই আমার নেই, কপালে

ফোঁটা-তিলক দিই মনে জোর পেতে, মনে আত্মবিশ্বাস আনতে মাত্র।

—শুধু তাই !!

—তাই যদি বলো, তবে বলি রঙ-বেরঙ দেখে বাঘ যাতে ভাবে, আমি ওদেরই জাত-ভাই !! ···কি বলবো তোমাকে মাধুরী, সুন্দরলালকে তুমি তো অমনভাবে দ্যাখোনি। চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় দেখে আমার ভারি মায়া লাগছিলো। শেষকালে আমিই হোলাম কিনা ওকে বন্দী করার কাল।

—বাউলেদা ! সত্যই কি তুমি বাঘকে অতো ভালবাসো ?

—জানিনা !···বলেই যেন অনমনস্ক হয়ে যায়।

মাধুরী অনুমান করে, বাঘের কথা তুললে বাউলেদাকে ঠেকানো মুশকিল। তাই এবার শাসিয়ে বললো, যাও আগে হাত-পা ধুয়ে এসো। আমার রান্না সব জুড়িয়ে গেলো যে।

—কই দেখি, কি সব রেঁধেছো আমার জন্য ?

—না, না, তোমার দেখতে হবে না। বলছি, আগে যাও, হাত-পা ধুয়ে চট্ করে চলে এসো।

বাউলে আসনখানার উপর ভদ্রাসনে বসে দাড়ি-গোঁফে হাত বোলাচ্ছে। মাধুরী হেঁশেলে বসে পোড়া-মাটির বাটিতে রকম-বেরকম রান্নাগুলি ভাগে ভাগে সাজাচ্ছিলো। এবার কলাপাতায় ভাতের রাশিটা আলগোছে সরু সরু আঙুলের ইলিবিলি কেটে আলতো চাপে গোটা করে আনছে। বাউলে মুগ্ধনয়নে সেদিকেই তাকিয়ে আছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছিলো মাধুরীকে। একখানা লালপেড়ে শাড়ি পরা। মাথার ঘোমটা আলতোভাবে পিঠের ওপর নত হয়ে যেন নুইয়ে পড়েছে। সদ্য স্নাত খোলা কুন্তলরাশি ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠটা জুড়ে, তাতেও বাঁধ মানেনি। উপচে পড়া রাশিগুলি মুখমণ্ডলীর দুপাশে লতার মতো এঁকে বেঁকে মাটি স্পর্শ করতে চায়। পাছে আজ কোনও অবাধ্য আবেগ তাকে পেয়ে বসে, তারজন্যই বুঝি সিঁথির সিঁদুর অমন করে টেনে দিয়েছে মাথার মধ্যমণি অবধি।

সবুর দুষ্টুমিভরা সুরে বললো,—বাউলেদা, তা হবে না। তড়িঘড়ি তোমাকে খেতে বসতে দেবো না। তার আগে তোমাকে গান শোনাতে হবে। ছাড়ছি না আজ তোমাকে।

বাউলে নেহাৎ বুঝি একটা অপত্তি করতে চায়, তাই কয়েক লহমার জন্য চুপ। ভদ্রাসনে বসা ছিলো, আস্তে আস্তে হাঁটু ভাজ করে গোড়ালির ওপর বজ্রাসনে বসে নেয়। মুখে চাপা দরাজ গলায় গুনগুন করে উঠেছে। গোটা গানটা গুনগুন করে নিজের কাছে তুলে ধরলো যাতে সুরের আবেগের ঢেউ আনতে কোন বেগ না পেতে হয়।

চাপা সুরটা কানে যেতেই মাধুরী আনমনা। রক্তাভ গালখানি নিজের হাঁটুর উপর এলিয়ে দিয়ে যেন তির্যকভাবে মোলায়েম চাহনিতে ভাতের রাশির ওপর নিজেরই আঙুলের কোমল ইলিবিলি দেখছে।

বাউলে দরাজ গলায় ভাটিয়ালি টান দেয় :

তুই যদি গাঙ হোস বন্ধু
আমি তাইতে ডুবে মরি,
বন্ধু ভাসায়ে গাগরী
ও বিদেশী বন্ধু !

মাধুরী যেন আর নিজেকে সামলাতে পারে না। সর্বাঙ্গে ঝাঁকি মেরে উঠে মিনতির সুরে বলে,—না, বাউলেদা, না,···তুমি ও-গানটি গেয়ো না।

সমস্ত লাজ-সরম ভুলে সবুরের সামনেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে বাউলেদার গোঁফ-দাড়িতে
াকা মুখখানাকে দুহাতে চেপে ধরে বারবার কাতর অনুনয়ে জানায়, —না, বাউলেদা, না !
।-গানটা শুনলে আমার বুকের ভেতর যেন তোলপাড় এনে দেয় ! ....তুমি ও-গানটা গাইবে
। ! বাউলেদা আমাকে তুমি ও-গানটা শোনাবে না ! না ! না !

বনবিবি

'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' ও 'সুন্দরবন' গ্রন্থ দুটি রচনার পর আবারও যে সুন্দরবন নি
লিখতে বসতে হবে, তা আগে ভাবিনি। সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে নিসর্গ ও জীবনের কা
নিরবচ্ছিন্ন ও অপরিমেয়। সুন্দরবন ও তার মানুষের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। সুন্দরবনে
এই মহাকাব্যের প্রতি একবার আকৃষ্ট হলে দুর্মর অনুরাগ কাউকে স্থির থাকতে দেয় না
আমাকেও দেয়নি। তাই বুঝি আবারও লিখতে বসতে হয়েছে।

—গ্রন্থকার

এক

ভেড়ির ওপর এক পা, আরেক পা ভেড়ির ঢালু কোলে রেখে কলিম একমনে ডাল টছিল। হেঁতাল গাছের ডাল। বেশ মোটা দেখে কাল বাদা থেকে এনেছে। তার হাতে নাবার মতই লাঠি হবে। বাওয়ালির বাঘ তাড়াবার নড়ি। কালই আবার যে বাদায় উঠতে বে। তারই প্রস্তুতি।

মঠবাড়ির ভেড়ি। দশ হাজার বিঘার আবাদকে ঘিরে আছে এই ভেড়ি। খুলনা জেলার ক্ষণ-পশ্চিম প্রান্তে এই আবাদ। উত্তর, পূব ও দক্ষিণ ঘিরে আছে কয়রা নদী। পশ্চিমে খবেড়ে খাল। এই আবাদের পত্তন মাত্র সত্তর বছর আগে। শুধু আবাদের পত্তন নয়, জেরও পত্তন বটে। দক্ষিণ বাঙলার ইতিহাসে আবাদ ও সমাজের পত্তন এই সময়ই য হয়। ইছামতি ও কালিন্দির অববাহিকায় এই ধরনের বড় আকারে পত্তন বোধহয় নতুন র শুরু হয়েছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্ত রায়ের চেষ্টায়। তারপর থেকেই সেই ধারা অল্পবিস্তর অনুকরণ হতে থাকে এই সেদিন পর্যন্ত। নার এই সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মঠবাড়িই তার শেষ নিদর্শন। মঠবাড়ির পর আর নও আবাদের পত্তন হয়নি। দক্ষিণে কয়রা নদীর ওপারেই সুন্দরবন।

নতুন সমাজের পত্তন বটে, কিন্তু এ সমাজ আগের মত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অষ্টবজ্রে বাঁধা দু সমাজও নয়, মোল্লা ও মৌলবির পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তৃত মুসলমান সমাজও নয়। বৃটিশ ভুদের পক্ষপুষ্ট লোভাতুর জমিদার ও পত্তনদারের আধিপত্যে, আর বাঙলার দু-মুসলমান নির্বিশেষে সংগ্রামী মানুষের জীবিকার তাগিদে এই দুর্গম অরণ্যাঞ্চলে নতুন তি ও সমাজ দেখা দেয়। তাই এই অঞ্চলে সামাজিক বাঁধনের শিথিলতা আছে, আর ছে ইংরেজ দুলাল জমিদারদের অত্যাচারী মনের ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বাসনা মেটাবার সর ক্ষেত্র। কিন্তু তার উপরও আছে, জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে এখানকার মানুষের স্পরের প্রতি আত্মীয়তা বোধ। একে অপরের পাশে না দাঁড়ালে যেমন দুর্গম বনের হিংস্র গুর মুখোমুখি বাস করা দায়, তেমনি লোনা জলের প্রবল প্লাবনের বিরুদ্ধে যোজনব্যাপী র্ঘ ভেড়ি গাঁথা ও রক্ষা করাও দায়। সাধারণ মানুষের জীবনের জন্য ও জীবিকার জন্য এই ত্মীয়তা বোধই এখানকার সমাজের ভিত।

আধুনিকতম ও বিশাল শিল্পনগর কলকাতার পাশেই, বলতে গেলে দেড়শো মাইলের ধ্য, এমন এক সমাজের কথা ভাবাই আশ্চর্য। পথের হাজার খাল, নদী, বিল ও বাঁওড়ে স্থন্ন এই অঞ্চলে দুরধিগম শ্বাপদ-সঙ্কুল সুন্দরবনের মত অরণ্যের ছায়া যেন বাঁচিয়ে খেছে এমনি এক সমাজকে। সুন্দরবনের ছায়া যেন বহুদূর বিস্তৃত। ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূর কেই অচেনা গাছ-গাছড়া, লোনাপানির প্রবল জোয়ার-ভাটা, নতুন নতুন জীব ও জন্তু, নো ফুল ও পলিমাটির মিষ্টি গন্ধ, সর্বোপরি দিগন্তব্যাপী হুহু করা নির্জনতা—যে কোনও

আগন্তুককে জানিয়ে দেবে, তুমি এক অদ্ভুত ও অপূর্ব বনের নিকটবর্তী হতে চলেছ। সুন্দরবনের এমনি ধরনের ছায়ায় আবিষ্ট, বনের অতি সন্নিকটে মঠবাড়ির আবাদ।

দশ হাত উঁচু ভেড়ি টানা চলে গেছে চারপাশে নদী ও খালের তীর ধরে। সারা আবাদে কিন্তু কোনও বড় গাছের বিশেষ বালাই নেই। তবে পূব ভেড়ির দুপাশ দিয়ে হেঁদো গাছের ঝাড়। ঝাড়গুলি কোথাও মানুষের সমান উঁচু, কোথাও বা তাও নয়। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই সবুজ ঝাড় ও ভেড়ি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

বেলা দশটা বাজে, তবুও মানুষের কোনও সোরগোল নেই। নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ। বনের স্তব্ধতা প্রান্ত অঞ্চলের মানুষের আবাসগুলিকেও যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক আধটু শব্দ তরঙ্গ হয় না যে এমন নয়। কেউ হয়ত দূরের মানুষকে ডাকছে, কখনও বা ছোটছেলের বুক ফাটা চিৎকার, কখনও বা বনের পাখির বা হরিণের এক আধটা ডাক। জীবনের এই সাড়া কিন্তু কানে বেঁধে না। দূর থেকে ঢেউয়ের মত ভেসে ভেসে আসে, ভেসে ভেসে মিলিয়ে যায়।

কলিম হেঁতাল ডালের কাঁটা ও পাতা ছাঁটাই করে, আর কি যেন বিড়বিড় করে বলে বলা যায় না, কলিম বাওয়ালি, সবাই বাউলে বলেই ডাকে। হয়ত বা মন্ত্র আওড়াচ্ছে। বাঘ তাড়াতে মন্তর-পড়া নড়িই বোধ হয় ওর সম্বল।

দূরে ভেড়ির ওপর দিয়ে হন্‌হন্‌ করে আসছে লায়লা বিবি। হেমন্তের সকাল। বেলা দশটার মধ্যেই বেশ কড়া রোদ। নোনাদেশে অল্পেতেই মাটি তেতে ওঠে। তাহলেও কনকনে উত্তরে বাতাস থাকাতে সকালের শীতের আমেজ তখনও কাটেনি। লায়লা বেশ করে গায়ে কাপড় জড়িয়ে হেঁটে আসছে। পরনে সাদা থান—এদেশে তবন নামে পরিচিত। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় দশ বছর। তার আগে থেকেই পাছাপেড়ে শাড়ি চালু হয় বাঙলাদেশে। অন্যত্র অচল হয়ে এলেও বাঙলার এ ভাটিদেশে পাছাপেড়ে শাড়ি তখনও পুরো চালু। বিশেষ করে, লায়লা বিবির বয়সের মেয়েদের তো কথাই নেই। কিন্তু কি জানি কেন, লায়লার এ শাড়ি পছন্দ নয়। সাদা তবনই তার মনের মত।

ভাটিদেশে চাষী মুসলমান মেয়েদের হাজার আবরুনশীন হলেও মাঠে ঘাটে এক আধ বেরুতেই হয়। তা বেরুলেও কেউই লায়লার মত অমন করে দিনে দুপুরে রাস্তাঘাটে বেরোয় না। সর্বত্রই লায়লার যেন অবাধ গতি। প্রথম প্রথম লায়লার এমন চলাফেরা ছিল প্রায় সকলেরই নেকনজরে। আজকাল যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। বলতে গেলে, এমন অবস্থা করে দিয়েছে মঠবাড়ির ছেলেমেয়ের দল। কেউ 'বুবু', কেউ 'ফুফু', কেউ 'খালি' কেউ 'ভাবি', কেউ বা 'নানি' সম্পর্ক পাতিয়ে লায়লার গতি অবাধ করে দিয়েছে সর্বমহলে লায়লার এই বিদ্রোহের পেছনে এক ইতিহাস আছে। ইতিহাস আছে বলেই তার এ আচরণ মানানসই হয়ে গেছে। তাই বলে, কেউ যে তার উদ্বেলিত যৌবনে আকর্ষিত হয় না তার চঞ্চলতার প্রতি কটাক্ষ হানে না, বা কেউ ঈর্ষান্বিত শ্যেন দৃষ্টি দেয় না, এমন নয়। তা দিলেও, লায়লা সামনে এলে আবাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সহজ ভাবেই কথা বলতে হয় তার সঙ্গে।

লায়লা হন্‌ হন্‌ করে কাছে এলো বলে। কলিমের পাশ দিয়েই তার যেতে হবে। কলিম কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই লক্ষ্য করেনি। একমনে হেঁতাল নড়িকে মাপঝোঁক করে কাটবার চেষ্টা করছে। আচমকা লায়লাকে দেখতে পেয়েই বলে ওঠে,—আরে! এই ভোর গোনে অতে টুকটুক করে কোথায়?

কলিম রসিক। সুযোগ পেলে ফুক্কুড়ি কাটতে ছাড়ে না। বাগে পেয়েছে। সহজে ছাড়বে

া কলিম। ঠোঁটে ঈষৎ হাসি এনে ভ্রূ কুঁচকে একত্র করে চোখ পিট্‌পিট্ করছে। বাউলের এ চেহারা লায়লার অজানা নয়। লায়লাও কম কি! সে ফুরসত দেবে কেন! লে,—তোমাদের আছে তো ঐ নড়ি, আর নয় বন্দুক!......তা আবার নতুন নড়ি কেন?

—কেন? তোমার পিঠেই পড়বে বলে তো এই নড়ি!

—ও-ব্বাবা! বাঘ ফেলে এবার মেয়েমানুষ! বাঘ ফেলে বড় জোর না হয় বাঘিনী হোক্! তা না, এবার মেয়েমানুষের পেছেন!

—তা, রায়বাঘিনীও তো সব আছে!

—তাহলে, বাদা ছেড়ে একেবারে আবাদে! রক্ষক এবার ভক্ষক!

—কেন? বাউলে হয়েছি বলে আহার-নিদ্রাও ছাড়তে বলো?—ফোঁড়ন কেটেই হাত নেড়ে দুই আঙুল দেখিয়ে ভাবগানের এক ছড়া গেয়ে দিল,—

"দুটো পাখি বাচ্চা পাড়ে
ঠোঁটে করে আহার আনে,
পয়ার হলি যাবে উড়ে, যার যেখানে মন!"

লায়লা মুচকি হেসে বলে,—যাও! রঙ্গ করতে হবে না। অতো জোড়া-পাখির খোয়াব দেখা শিখ্‌লে কোত্থেকে?

—আর যদি জোড়া-বাঘের স্বপন দেখি!

—রাখো! বাঘের গল্প জুড়তে হবে না। শুনি দেখি, কি ব্যাপার? সে নড়ি কি হলো? সেই আদ্দিকালের মন্তরপড়া নড়ি?

—আর বলো না! সে নড়ি তো কাছারি বাড়ি! ফেলে আসতে হলো। নায়েব দেখতে নিয়ে আর ফেরৎ দেবার নাম নেই। বললেই বলে কাল নিস্। রোজই বলি, রোজই এক কথা!

পুরানো লাঠিটার কথা উঠতেই কলিম যেন কেমন হয়ে যায়। বহু স্মৃতি বিজড়িত এই লাঠি। দুর্গম বনের অনেক জীবন মৃত্যুর কাহিনী জড়িয়ে ছিল তার সঙ্গে। লায়লাও অবাক। পর মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে চলতে চলতে বললো,—ও! তাহলে তো কাছারির নন্দার কথাই ঠিক। নন্দা দেখি সবই জানে!

মেয়েদের কথায় কলিমের বিশেষ আস্থা নেই। কাছারির মারপ্যাঁচের ইঙ্গিতেও কলিম কোনও ব্যগ্রতা দেখায় না। হাতের কাজে মন দিল। লায়লাও আগের মত হন্‌হন্ করে আঁকাবাঁকা ভেড়ির ওপর সর্পিল গতি নেয়।

দুই

লাঠিটার কথা কলিম ভুলেই থাকতে চেয়েছিল। কোত্থেকে লায়লা এসে আবার মনে করিয়ে দিল—মমতা জাগিয়ে দিল তার ফেলে আসা আদ্দিকালের হেঁতাল নড়ির ওপর। তাকে ফেলে আসতেই হয়েছে, তাকে পৌরুষ-মন ঝেড়ে ফেলতে চায় মন থেকে। চাইলে কি হবে! কলিমই কি পেরেছে সব সময়ে তার বিগত জীবনে।

সে সময়ে কলিমের প্রথম যৌবন। সেদিন কলিম হাঁটু ভেঙে ভেঙে চলেছে। ছোটবেলা থেকে হাঁটু ভেঙে চলাই তার অভ্যাস। টোটা-ভরা বন্দুকটি বাঁ-কাঁধেই চাপান আছে। মাট-হাতি কাপড় টেনে শক্ত করে হাঁটুর উপর পরা। সেও এক হেমন্তের দুপুর। লালডোরা গামছাখানি বুক ও পিঠ ঢেকে চাদরের মত জড়ান ছিল। এবার খুলে নিয়ে মাথায় জোরে

ফেটা বেঁধেছে। পাগড়ি বলা চলে না, তবুও পাগড়ির মত গামছার পেখম ঝুলছে কানের পাশ দিয়ে। এমনি ধারা পেখম ঝুললে কলিমের কেমন যেন মনে হয়—দুনিয়ার কাউকে তোয়াক্কা করার নেই, কোনও বিপদ বিপদই নয়।

হরিণ শিকারের কথা মনে করেই কলিম সেদিন বনে উঠেছিল, মৈঁশেলির ট্যাঁক। মৈঁশেলি নদীর বাঁক এখানে ঘোড়ার খুরের মত। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই নদীর ফাঁকা আলো দেখা যায়। এমনি ধারা সরুফালির মত বনে আশঙ্কা বা ভয়ের কোন কারণ নেই। তাছাড়া আবাদ ও বাদার সীমানায় বেনেখালি বন-কর অফিস খুব বেশি দূরও নয়। কলিম বেশ হাল্কা মনেই এড়িয়ে চলেছে।

তবে একটু সতর্ক হবার ছিল। বৃষ্টি অনেকদিন থেমে গেলেও বনের পলিমাটির পিচ্ছিল ভাব তখনও যায়নি। একটুতেই শূলোর মাঝে পা হড়কে যাবে। কলিম তাই হাঁটু ভেঙে ভেঙে চলবার সময় বুড়ো আঙুল টিপে টিপে চলেছে।

বন্দুকটির ওপর যেন অদ্ভুত মায়া ; এটি তার পৈত্রিক সম্পত্তি। বহু কষ্টে অর্জিত এই বন্দুকের কাহিনী তার বা'জানের আমল থেকে শুনে এসেছে। বা'জান শিকারি হলেও, বন্দুক তার জোটেনি বহুদিন। ১৩১৬ সনে দক্ষিণ বাঙালার এক প্রকাণ্ড ঝড় ও প্লাবনের পর মহামারি দেখা দেয়। তার প্রকোপে আবাদের লোক প্রায় উজাড় হবার জো হয়েছিল। পরের বছর লোকের অভাবে আবাদের অনেক জমিই অনাবাদী থাকে। সেই সুযোগে রাতদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বা'জান অনেক ধান পায়। এমন সুযোগে কোনও শিকার-পাগল সুন্দরবনের চাষী বন্দুক কিনবার লোভ সামলাতে পারে না। কলিমের বা'জানও পারেনি।

কলিম হরিণ শিকারে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু সুন্দরবনে উঠে বাঘের কথা না ভেবে উপায় নেই। ভাবনা এলেও, কত বারই তো কলিম বনে উঠেছে কিন্তু একবারও এই রাজ্যের সেই রাজার সঙ্গে তার দেখা হয়নি তখনও।

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে শৈশবের এক মর্মান্তিক ঘটনা। রাত দুপুর, সবাই নিঘোর ঘোরে ঘুমিয়ে। হঠাৎ গোয়াল ঘরে গরুর দাপানি আর মৃত্যুভয়ের ডাক। ত্রাসে সবাই তো তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। আগুন জ্বালিয়ে কতো হৈ-হল্লা, কিন্তু বাঘ থোড়াই কেয়ার করে। ধলিকে মুখে ধরে গলার দড়ি একটানে ছিড়ে গোঁ গোঁ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তারপর শিশু কলিম বা'জানকে কতবার বলেছে,—দেবে বা'জান! দেবে আমাকে লোহার পাত দিয়ে মুড়ে?

—কেন? লোহার পাত মুড়ে কি হবে রে?

—বাঘে আমাকে কিছুই করতে পারবে না। বন্দুক নিয়ে তখন একটা একটা করে বাদার সব বাঘ মেরে শেষ করব। স-ব বাঘ!

—সব বাঘ মেরে ফেলবি! বলিস্ কি! তাহলে তো সুন্দরবন আর বন থাকবে না। বাগান হয়ে যাবে! বনের রক্ষক বাঘ, আর বাঘের রক্ষক বন। বুঝলি?

ছেলেমানুষের মনে খট্‌কা লাগে। বাঘ না থাকলে বন থাকবে না, বাগান হয়ে যাবে! মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায়। বনের অভাবটা যেন ভাবতেই পারে না। মুখে অবশ্য কিছুই বলতে পারেনি।

এবার যৌবনে মাথায় ফেটা বেঁধে বন্দুক হাতে সুন্দরবনে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার কথাটি মনে পড়তেই কলিমের হাসি পেল। হাসির ঠোঁটেই বিড়বিড় করে বলে,—তুই তো

ছেলেবেলায় ভারি ভীতু ছিলি !

কথা বলতেই চিন্তার স্রোত থেমে যায় । বন্দুকের কাঁধে মোলায়েম করে কয়েকবার হাত বোলায় । যেমন করে পিতা তার কাঁধের সন্তানের পিঠে হাত বোলায় । হাত বোলাতে বোলাতে পাগড়ীর পেখমে আঙুল লাগতেই সজাগ হয়ে উঠল,—সে তো দাঁড়িয়ে পড়েছে ! তার তো থামবার কথা নয় ! আবার হাঁটু ভেঙে চলতে শুরু করে শূলোর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে ফেলে ।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে পড়েছে । বনের গভীরে । বাঁ দিকের নদীটি অনেক আগেই বাঁক নিয়ে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে ! কলিম ডানদিকের নদী কাছ-ছাড়া করেনি ।

অগুনতি কুমির কামোটে ভর্তি নদী অবশ্য বিশেষ ভরসার বস্তু হবার কথা নয় । তবুও সুন্দরবনের নদী শিকারির মনে যেন সাহস যোগায় । নদী মানেই আলো । নদীর কূলে গহন বনের মত আলো-আঁধারের রোমাঞ্চে অধীর হয়ে উঠতে হয় না । বনের গভীর যেন গম্‌গম্ করে । মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে । কিন্তু সুন্দরবনের জীবন্ত নদী তার স্রোতের টানের শব্দে মনকে হালকা করে দেয়, বুকে বল আনে । বল আনবার আরও কারণ আছে । নদীর দুপারেই বন । তবু বনের গহনে নদী যেন একটা সীমানা । সীমানায় পিঠ দিয়ে লড়াই করতে যে-কোনও যোদ্ধার আপনা থেকে সাহস আসে । নিবিড় বনে আবার হামেশাই দিক হারা হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ; সেদিক থেকেও আঁকাবাঁকা নদীও বুঝি দিশেহারার কাছে নিশানার স্বরূপ ।

কাজেই কলিম নদীর চরে না হলেও, কাছাকাছি নদী বরাবর চলেছে । কাছাকাছি চলার পেছনে অন্য মতলবও ছিল । হরিণ শিকার করতে বেরিয়েছে । বাঘের দেখা পাবার কোনও আশা রাখেনি । তবুও বলা যায় না ! কলিম সতর্ক থাকতে চায় । নদীর কূলে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের খোঁচ স্পষ্ট ধরা পড়বেই পড়বে । হরিণের লোভে বাঘকে নদীর ধারে ধারে তো ঘুরতেই হয় ।

কলিম সতর্ক ছিল বটে । কিন্তু একই সঙ্গে আর কতদিকে খেয়াল থাকে । বনের আরও গভীরে এলে হঠাৎ এক সময়ে মনে হলো, বনটা যেন সহসা নিঃসাড় লাগছে । কেমন যেন থমথমে । পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশির্ করে উঠলো । গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে । পাগড়ি বাঁধা গামছার পেখমে ঝাঁকি মেরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কলিম ।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি । থামের মত দাঁড়ান গাছের গুড়ির ফাঁকে ফাঁকে তন্ন তন্ন করে দেখে । দূরে গোলপাতার ঝাড় । এমনি ধারা ঝাড় বাঘের বড় পছন্দ ! এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে কলিম সেদিকে । না, কিছুরই সাড়া মেলে না ; ঝাড় বাঁদিকে রেখে নদীর কূল ধরে আবার এগিয়ে চলল ।

নদী এবার দক্ষিণ মুখে চলতে চলতে হঠাৎ সোজা পশ্চিমে একটু এগিয়েই আবার পুরো বাঁক নিয়েছে দক্ষিণে । এই বাঁকের মুখে পলিমাটির চর । বিস্তীর্ণ চর । বাঙলাদেশের অন্য নদীর মতই সুন্দরবনের নদী । যেদিকে বেঁকবে সেদিকেই চর ফেলবে, অন্য দিকে ভাঙন । ডান দিকে বাঁক নিলে, ডান পারেই চর ফেলবে । বাঁ-দিকেই বাঁক নিলে বাঁ পারেই চর ফেলবে ।

নোনা পলিমাটির চরের ধারে ধারে ঝাকাল কেওড়া গাছ যেন ছেয়ে গেছে । এই কেওড়া গাছই কলিমের এবার লক্ষ্য । চরের কেওড়াগাছ হরিণকে পাগল করে দেয় । দলে দলে তারা কেওড়া পাতা খেতে আসে । এমন চরে একবার কেওড়া গাছে উঠে বসতে পারলে,

হরিণ পাওয়া যাবেই যাবে। কলিম আর দেরি করতে চায় না। সূর্য হেলে পড়বার আগেই গাছে ওঠা চাই। দ্রুত পা ফেলে চলেছে।

দ্রুত পা আর ফেলতে হয় না। বুনোগন্ধ! যে গন্ধে বনে সমস্ত জীবই চমকে ওঠে। যে গন্ধে আত্মরক্ষার কথা সর্বাগ্রে মনে হয়। কলিমের বুক কেঁপে উঠল। দ্বিতীয় ঝলক বাতাসে বাঘের সে গন্ধ আরও তীব্র। দক্ষিণে বাতাস। ঝটিতি সেদিকে মুখ করে আরও খানিকটা হাঁটু ভেঙে কলিম দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেহের সর্ব শক্তি পায়ের পাতায় জড়ো। এতটুকু ইঙ্গিত পেলে, পা চালু করতে মুহূর্ত দেরি হবে না। দেহের শক্তি পায়ে জড়ো, কিন্তু মন নিবিষ্ট চোখে ও কানে। গন্ধ নাকে আসতেই ধীরে ধীরে বন্দুকটি কাঁধ থেকে নামিয়ে সামনে উঁচিয়ে ধরেছে। তারপরই নিশ্চল। মনে আশঙ্কা—ওকেই লক্ষ্য করে নিশ্চয় ওৎ পেতে লুকিয়ে আছে। একটু নড়লেই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। খট্—পেছনে কি একটা শব্দ। চকিতে দেহ যেমন ছিল, তেমনি রেখেই কলিম মাথা ঘুরিয়ে দিল পেছনে। কেন এই শব্দ সেদিকে লক্ষ্য নেই। শুধু দেখে নিল, কিছু দেখা যায় কিনা। না, কিছুই না। আস্তে আস্তে আবার মাথা ঘুরিয়ে নিল।

কয়েক লহমা কেটে যায়। কোনও কিছুরই সন্ধান মেলে না। কিন্তু গন্ধ যেমন ছিল, তেমনি তীব্র ভাবেই আসছে। মনে পড়ে যায় তার বা'জানের কথা। বা'জান বলতো—বনে বাঘের গন্ধ পেলে বুঝবি, বাঘ তোকে তাক্ করেনি, বাঘ তোর জন্য ওৎ পাতেনি। শিকার করতে বেরিয়ে সুন্দরবনের বাঘ কখনও বাতাসের পথে এগুবে না। বাতাসের মুখোমুখি হয়েই এগুবে। যাতে তার গন্ধ শিকারের নাকে ধরা না পড়ে। বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের ঝিলিক চোখে লাগলে যেমন বুঝতে হবে বজ্র অন্তত সেবারের মত তার মাথায় পড়ছে না। বজ্র যার মাথায় পড়ে তার ঝিলিকের আলোক দেখবার অবকাশ হয় না। তেমনি সুন্দরবনের বাঘ যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাকে গন্ধ পাবার অবকাশ দেয় না।

বা'জানের কথা মনে পড়তেই কলিমের—মন খানিকটা শান্ত। তবে এবার পালাতে হবে। কিন্তু কোন পথে, কোন দিকে? সহসা কিছু ঠিক করতে পারে না। দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক নয়। সামনের গাছটাই কেওড়া গাছ। গুঁড়িতে ডালপালা আছে। গরান বা সুন্দরী গাছের মত ছাল ফেটে ফেটে রুক্ষ হয়েও নেই। নিঃশব্দে ওঠা যাবে। কলিম উঠেও পড়লো।

বেশ উঁচুতেই উঠল। গোল-ঝাড়ের ওপাশটা এবার দৃষ্টিতে আসে। দেখে তো কলিম থ মেরে গেছে। এক শীর্ণ জলধারার কূলে কূলে গোল গাছের ঝাড়। তারই বেষ্টনে এক চত্বর। পাশেই একটা কেওড়া গাছ অনেকটা হেলে আবার মাথা উঁচু করে উঠেছে। আর কোনও গাছ ধারে কাছে নেই। বেশ দেখা যায়, ফাঁকা চত্বরে দুপুরের সূর্যের আলো মাটি পর্যন্ত এসে পড়েছে।

এমন আলোতে কিছুই অস্পষ্ট থাকবার কথা নয়। সামান্য একটু দেখতেই কলিম ডাল-পাতার আড়ালে ঝট্ করে মাথা নিচু করে দিল। সবটা দেখবার সাহসও যেন হয় না। একটু পরে বন্দুকটা ডান হাতে চেপে ধরে দ্বিতীয়বার মাথা উঁচু করল।

বিশালকায় বাঘ ও সমকক্ষ এক বাঘিনী পাশাপাশি একদিকে মুখ করে আছে। দুজনেই থাবা দুটিকে সামনে খানিকটা লম্বা করে দিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। অলসভাবে এ-ওর মুখের কাছে মুখ নিচ্ছে।

সামনেই কি যেন একটা নড়ে ওঠে। সুন্দরবনের বাঘের সামনে আর কোন্ জীব নড়াচড়া করবার সাহস রাখে! অর্ধমৃত লব্ধ শিকার। কলিম ভাল করে চেয়ে দেখে—না, আরেকটি

বাঘ !···ওপাশে আরেকটি !···এপাশে যে আরও ! বাঘ ও বাঘিনীর চারিপাশে প্রায় গোল হয়ে চারজন বসে আছে উবু হয়ে মাটির সঙ্গে চিবুক লাগিয়ে। বেশ বোঝা যায়, ওদের চারজনেরই দৃষ্টি জোড়া বাঘ-বাঘিনীর দিকে। মুখ যেন কাঁচুমাচু করে তাকিয়ে আছে। কোনও শব্দ নেই, কোনও গর্জন নেই। বাঘিনী একবার মস্ত এক হাঁ করে হাই তুললো। তাতেই যা একটু শব্দ।

কলিম হতভম্ব। বন্দুক হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরাই আছে। বেশ দূর। তবুও বন্দুকের আওতার মধ্যে হলেও হতে পারে। কিন্তু···কলিমের একবারও গুলি করার কথা মনে আসে না। এই দৃশ্য থেকে সে দূরে পালাতে চায়। দ্রুত পালাতে চায়।

বিন্দুমাত্র দেরি না করে, যেমন নিঃশব্দে উঠেছিল তেমনি নিঃশব্দেই গাছ থেকে নেমে এলো। এলো একেবারে নদীর কিনারায়। বিস্তৃত ফাঁকা চর ধরে নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দ্রুত পায়ে চলল। জলে শব্দ হতে থাকে। তা হোক। জলের শব্দে ডাঙার জীব বিশেষ সচকিত হয় না। তাছাড়া, বিপদ এলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বারও সুযোগ রইল।

তিন

বনের পথে ভয়াবহ দৃশ্যের কথা ভাবতেই কলিমের মন দুরদুর করছিল। কিন্তু বন ছেড়ে নদী পার হয়ে আবাদে পা দিতেই দুপুরের ঘটনা সবই যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। স্বপ্ন যেমন লোকে কাউকে সহসা বলতে চায় না, কলিমও তেমনি স্বচক্ষে দেখা এই স্বপ্ন কাউকে বলতে চায় না। বলেও না।

শুধু স্বপ্নের মত ঘটনা বলে নয়। সুন্দরবনের উপকূলবাসী মরদ মনের শিকার স্পর্ধাও যেন আহত। শিকারির বেটা হয়ে বন্দুক হাতে এমন সুযোগ ছেড়ে দিয়ে এলো ! এ আপশোষ সহসা ব্যক্ত করতে চায় না কারও কাছে।

তবে কতক্ষণ আর সে চেপে থাকবে। পরদিন ভোরে চলল নিধু শিকারির কাছে। মঠবাড়ির পশ্চিম ভেড়িতে কয়েক ঘর নিয়ে 'পোদ' পাড়া। এ পোদ পাড়ার অধিবাসী নিধু মোড়ল। নিধু শিকারি কলিমের বা'জানের শিকার বন্ধু। চাচা বলেই কলিম ডাকে। কাহিনী শুনতেই চাচা বলল,—কি বলছিস তুই ! কত শিকারির কথা জানি, তারা কেউ তো একটার জায়গায় দুটো বাঘ একত্রে দেখেনি ! আমাকে দেখাতে পারিস ? আর কেউ জানে এই ঘটনা ?

আনন্দ, বিস্ময় ও আপশোষের সাথী পেয়ে কলিম উল্লসিত। চাপা কাহিনী ব্যক্ত করতে যেন মুখর হয়ে উঠল। খুঁটিনাটি সব বর্ণনার পর ব্যগ্র হয়ে বলে,—যাবে চাচা ! চলো তাহলে এক্ষুনি। এক্ষুনি না গেলে যে অতো দূর থেকে ফেরাই দায় হবে।

—আজ গিয়ে কি হবে ? তুই যেমন ! আজও আছে নাকি ? অমন দলবেঁধে আজও থাকবে নাকি ?

—চলো না ! ঠিক থাকবে। অমন চত্বর ফেলে যাবে কোথায় ? বাদায় অমন রোদই বা মিলবে কোথায় ?

চলল দুজনে। বন্দুক হাতে কলিম, আর খালি হাতে চাচা। অঘ্রাণ মাস। মাঠে বিশেষ কাজ নেই। মঠবাড়ির জমি নাবাল। মাঠের ধান উঠতে এখনও একমাস বাকি। এ সময়ে কেউ কোথাও গেলে বিশেষ খোঁজ হয় না। বন-বাদাড়ের মানুষ অবসর পেলে বন-বাদাড়ে যে একটু ঘুরবে, তা ধরা কথা।

আজ ওরা বনের ভেতরে হেঁটে হেঁটে যেতে চায় না। ডিঙি নিয়ে চলল নদী বেয়ে। অনেক দূর এসে গেছে। দুই গলুইতে দুজনে,—কথাবার্তা বিশেষ নেই। ইসারা ইঙ্গিতে দু-একটা কথা যা চলেছে। হুকো আনলেও হুকোয় তামাক খায় না। হুকোতে যে বড় শব্দ হয়। শুধু কলকেই ভাল; নিঃশব্দে তামাক টানা যায়।

কলিমের মুখে কলকে, কিন্তু নজর চরের দিকে। কাল ফিরতি পথে এক কুমির পড়ে সামনে। রোদে পড়েছিলো আরাম করে চরের ওপর। কলিমের সাড়া পেতেই সড়্‌সড়্ করে তখন জলে নেমে পড়ে। নজর দিয়ে সেই দাগই কলিম আজ খুঁজছে। দাগ থাকবার বিশেষ কথা নয়। রাতের জোয়ার নিশ্চয় একবার পলিমাটির প্রলেপ দিয়ে গেছে। তবু যদি থাকে।

নজর দিয়ে সে-দাগ এখনও পায়নি বটে, কিন্তু একটু এগিয়েই চরের মাথায় কয়েকটি খোঁচ দেখে মনে হয়, বুঝি বা তারই নিজের পদ চিহ্ন। চাচাকে ইসারা করে ডিঙি ভিড়িয়ে দিল। গামছার ফেটা মাথায় বেঁধে বন্দুক হাতে চরে নেমে পড়ে। নেমেই চাচার গলুই কাছে টেনে ফিসফিস করে বলে,—ডিঙিতে থেকো। আগে ভাগে উঠবে না। চিনে আসি, সেই ভিটে কিনা। সেই গাছটা পেলেই ডাকবো। খবরদার! আগে উঠো না যেন।

চাচাও গলা বাড়িয়ে চুপিচুপি বলে,—ডাকবি কিন্তু। খবর্‌দার, একা যাবি না।

—না, না, যাব না। কান খাড়া রেখো কিন্তু। ডিঙি তৈরি রেখো তুমি,—বলেই কলিম চাচার গলুই জলে ঠেলে দিল। ঘাড় বাঁকিয়ে বনের দিকে তাকিয়ে আছে। ডিঙি পাক খেয়ে অপর গলুই গায়ে এসে ঠেকে। তবু কলিমের দৃষ্টি বনের দিকে। তেমনি ভাবে বনের রন্ধ্রে চোখ রেখে রেখেই চর বেয়ে উঠে গেল।

এই বাঘের মেলা বা জমায়েত দেখতে আসার পেছনে ওদের কিন্তু একমাত্র শিকারি-মনের দুঃসাহসিকতার আকর্ষণ নয়। একমাত্র শিকার স্পৃহার অদম্য নেশাও নয়। বনকে ওরা আপনার করে দেখে, বনের প্রতি মমতা ওদের কাছে আপনার গৃহ আঙিনার মমতারই সমান। আবার বনকে ওরা ভিন্ন রূপেও দেখে। ভিন্ন সত্তা আরোপ করে। বন ওদের কাছে এক শক্তির প্রতীক। বন্য জীব ও বৃক্ষের অদ্ভুত আচরণ ওদের কাছে সেই শক্তির পরিচায়ক। ভাবে, হয়তো বা ওদের জীবনেরও মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ামক। তাই বন আজও হয়ে আছে ওদের কাছে—বনদেবী। তীর্থ দর্শনের মত বনদেবীর এই শক্তি লীলা দেখলে অনাগত ভবিষ্যতে কোনও মঙ্গল সূচিত হবে,—এমন আশাও ওদের মনের তলে থাকা বিচিত্র নয়।

এক, দুই, তিন—প্রায় কদম গুণে গুণে কলিম নিঃশব্দে চরের উপরে এলো। সামনে খানিকটা শক্ত মাটিতে নিজের পদচিহ্ন পরিষ্কার। এই চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে গেলে গাছটিও ঠিকই চিনবে। দেখে দেখে চলেছে।

একটা পায়ের ছাপের উপর চোখ পড়তেই কলিমের বুকটা শুকিয়ে গেল। তারই পায়ের ছাপের উপর বাঘের থাবার স্পষ্ট চিহ্ন। ...তবে! ...চাচাকে ডাকি!...গাছেরগুড়ির আড়াল থেকে ইসারায় ডাকবার জন্য হাত উঁচু করেছে। মুহূর্ত সময় দিল না। বজ্রহুঙ্কারে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাঘের থাবা ঘাড়ে না পড়ে কানের পিঠে পড়েছে। কলিম ধরাশায়ী—

আর কোনও শব্দ নেই। বন্দুকের আওয়াজও নেই। চাচা হতভম্ব। বন্দুকের জন্য তার হাত ইশ্‌পিশ্ করে। কিছুই করার নেই। করবেই বা কি! কলিম ডিঙি তৈরি রাখতে বলেছিল। তৈরিই ছিল। কিন্তু শিকারমত্ত বাঘের সামনে এমন ভাবে ডিঙি রাখাও বিপদ। কাল বিলম্ব না করে এক ধাক্কায় কিনারা থেকে দূরে সরিয়ে নিল চাচা। হাতে বোঠে নিয়ে দড়াম দড়াম করে ডালিতে বাড়ি মারে আর চিৎকার করে। একাই হল্লা করতে চায়। ভয়

দেখিয়ে সুন্দরবনের বাঘকে ভীত কববার চেষ্টা। যতই নিদারুণ চিৎকার করুক না কেন—নিঃশব্দ বিস্তীর্ণ ফাঁকা বনে সে আওয়াজ ঢেউয়ের মত দুলে দুলে ঢিমে তালে মিলিয়ে যায়। নিধু শিকারির নিজের কাছেই নিজের হুঙ্কারকে মনে হয় যেন,—এক ব্যর্থ করুণ আর্তনাদ। চিৎকার আপনা থেকে থেমে গেল। থামতেই বাঘের এক-আধটা চাপা গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। নিধু শিকারি এবার বাড়ি ফিরে যেতে চায়। কিন্তু যাবে কি! বারবারই পিছন ফিরে চরের উপর কলিমের পদ চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকে···।

কলিম ধরাশায়ী। থাবার আঘাতে কানের পিঠের খানিকটা মাংস উড়ে গেছে। রক্ত ঝরে পড়ছে। সুন্দরবনের বাঘ কখনও যেখানে শিকার করে সেখানে খেতে বসে না। কলিমের কোমরে গোটো করে কাপড় পরাই আছে। তারই উপর দিয়ে কামড়ে ধরে মুখে তুলল। মুখে নিয়ে গরগর করতে করতে এগিয়ে চলল বনের ভিতর।

কিছুটা এসেই পিছনের পা ভেঙে বসে পড়ল। সামনে কলিমকে রেখেছে। আধা-চিৎ হয়ে কলিমের দেহ নেতিয়ে আছে। তারই উপর দিয়ে ওপাশে দুই থাবা টানটান করে দেয়। যেন বীরদর্পে বসে আছে। হিংস্রতার প্রতিমূর্তি বটে। কিন্তু সে হিংস্রতা কাপুরুষের নয়, বন্য জীবনে বলদৃপ্ত পৌরুষের আচরণ মাত্র। কলিমকে যেন কোলের মধ্যে করে রেখেছে। এক একবার ঘাড় নিচু করে গন্ধ নেয়, আর গর্গর্ করে প্রতিবাদ ধ্বনি করে।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোলে কলিম এলিয়ে আছে। সহসা তার জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ মেলেছে। মুহূর্তে আবার চোখ বন্ধ করল। হাত পা নড়াবাব শক্তি তখনও পায়নি কিন্তু চেতনা এসেছে। দ্বিতীয়বার এই বিভীষিকার সামনে চোখের পাতা খুলতে সাহস পায় না। অনিবার্য মৃত্যুর সামনে চিন্তাশক্তি বোধহয় স্তব্ধ হয়ে আছে।

গাঁ গাঁ······গাঁ গাঁ—হিংস্র প্রতিবাদ ধ্বনি। রক্ত মাংসের লোভে কণ্ঠ গহ্বরের লোলুপ আওয়াজ তো এ নয়!······হঠাৎ ক্ষিপ্র বেগে ছুট দিল। সামনে তার সমকক্ষ হয়ত বা কাউকে দেখেছে। ছুটে যেতেই পেছনের পায়ের টানে কলিম দুহাত ছিট্‌কে গেল।

ধাক্কা খেয়েই কলিমের দেহ সজাগ। শক্তি বুঝি ফিরে এসেছে। আর কাল বিলম্ব নয়। টলতে টলতে সামনের গাছটাতেই টেনে হিঁচড়ে উঠল। উপরে উঠল। আরও উপরে উঠল। গাছের ডালের শেষ মাথায়। তবুও যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর নাগালের বাইরে মনে হয় না।

তে-ডালার ফাঁকে কোনমতে বসে বুক দিয়ে জাপটে ধরে আছে ডালপালা। এতক্ষণ পরে মনে পড়ে তার বন্দুকের কথা—বন্দুক নেই! গাছের তলায় ভাল করে চেয়ে দেখে কোথাও বন্দুক নেই। তবে তাব বন্দুক গেল কোথায়! বন্দুক! না, কানের ধারে বড় যন্ত্রণা। দেখবার চেষ্টা করে হাত দিয়ে। হাতের তেলো রক্তে লাল হয়ে যায়। আশ্চর্য, মাথার ফেটা তখনও খুলে পড়ে যায়নি। তাড়াতাড়ি মাথার গামছা খুলে ক্ষতস্থানে বেঁধে দিল।

বাঁধতে না বাঁধতে দেখে, বাঘ ছুটে এসেছে। এসেই ঘাড় উঁচু করে এদিক ওদিক চাহনি দেয়, থপ্ থপ্ করে দেহ কাঁপিয়ে এদিক একবার যায়, ওদিক একবার যায়। থেমে যায়, আবার মাটি শুঁকতে শুঁকতে খানিকটা এগিয়ে যায়। এক একবার শিকারির মত গুটি মেবে নদীর দিকে উঁকি মারে। যেন শিকার দেখতে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একবার বনেব মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে না। কলিম নিঃশব্দে বসে আছে। মৃত্যুর সামনে সর্বযন্ত্রণা ভুলে নিঝুম হয়ে ডাল আঁকড়ে আছে। বেশি সময় নয়, আবার ছুটে আসে, হুড়মুড় করে ছুটে আসে। এ তো চুপিসারে শিকারের

নিকটবর্তী হওয়া নয়,—লব্ধ শিকার আহারের জন্য আসা। ঝোপ-ঝাড় ভেঙেই ছুটে আসে। বনে অন্ধকার নেমে এলো বলে। কয়েকবার ঘোরাফেরা করার পর কিছুক্ষণ নদীর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে একবার বিকট হাঁক দিয়ে উঠলো। তারপর শান্ত পদক্ষেপে এপাশ ওপাশ দুবার ঘুরে চলে গেল। আর ফিরে আসে না।

গভীর বনে রাত্রের অন্ধকার। কলিমের যেন নতুন করে আর কিছু ভয় করবার নেই। অন্ধকারের আবরণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অন্ধকার তার আশ্রয়। পরদিন দিনের আলোর ভয়ে কীভাবে পালাবে এই তার চিন্তা। চাচা! চাচা কি পালাতে পেরেছে। হয়ত পেরেছে। আবাদের সকলকে রাত্রেই নিশ্চয় সবকথা বলবে।......হয়ত পালাতে পারেনি। যদি নাই পালাতে পারে, তবে কোথায় গেল? কোথায় তাকে খুঁজবে! আবাদে গিয়ে সে চাচার কথাই বা কি বলবে! ঘুরে ফিরে দিনের আলোর ভয় তাকে পেয়ে বসে। আবাদে অন্ধকারের ভয়, বাদায় আলোর ভয়।

রাত্র শেষে ভোরের আলো বনের পাতার ছাতার উপরে এসে পড়ে! তবু কলিম কিছু স্থির করতে পেরে ওঠে না। কিছু পাখির কাকলি ছাড়া জীবনের বিশেষ কোনও সাড়া নেই। ধীরে ধীরে বেলা হতে থাকে, ভাবে এইবার পালাবে। এক ডাল নামে, আবার উঠে পড়ে। নিচে নামতে আশঙ্কার অন্ত নেই।

হঠাৎ কলরব! অনেক লোকের সমবেত কলরব। কেউ ডাকে,—কলিম! কলিম! কেউ বলে,—ওদিকে না, এদিকে।

বন্দুক চোট করে ওঠে। চাচার গলা, হাঁ চাচার গলার ডাক,—ডিঙি ভেড়ো! ডিঙি ভেড়ো!

কলিম নিশ্বাস ফেলবারও বোধহয় অবকাশ দেয় না। পাগলের মত ছুটে এলো চরের দিকে। সাড়া না দিলে যে ওরাও শব্দ লক্ষ্য করে বন্দুকের চোট করে বসতে পারে, তা ভাববারও অবকাশ বা অবস্থাও ছিল না।

কলিমকে দেখতে পেয়েই সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো। কাউকে ডিঙি থেকে নামবার অবকাশ দেয় না কলিম। একছুটে তরতর করে চর বেয়ে নেমে ডিঙির কোলে হাজির। অজস্র প্রশ্ন। অতো প্রশ্নের জবাব কি দেবে কলিম! দুএকটা কথা বলেই গামছা খুলে দেখিয়ে দেয়। ক্ষতের সঙ্গে সেটে গেছে গামছা। একটানে খুলে দেখাল।

চাচা সবাইকে ঠেলে এসে বলল,—চল, ওঠ ডিঙিতে! তোর বন্দুক? বন্দুক কোথায় ফেললি?

—বন্দুক! জানি না কোথায়! ...বনেই আছে।

নিধুশিকারি বনের দিকে তাকিয়ে বলে,—চলো, চলো সবাই। বন্দুক আনতে হবে না বুঝি, চলো।

কলিম অস্বাভাবিক চিৎকার করে ওঠে,—না, না, বন্দুক দরকার নেই! হাজার খুঁজেও পাবে না তোমরা। না, না, আজ না। ডিঙি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।

শুধু সেদিনই নয়, কোনও দিনই কলিম কাউকে খুঁজতে দেয়নি সে-বন্দুক—নিজেও সে-মুখো আর হয়নি।

আজ যেমন কলিম ফেলে আসা আদ্দিকালের লাঠিকে ভুলে থাকতে চায়, সেদিনও তেমনি ফেলে আসা বন্দুককে ভুলে থাকতে চেয়েছিল। চাইলে কি হবে? হয়ত বন্দুকের মায়া কাটিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে মায়া কাটাতে কলিমের জীবনেরও মোড় ঘুরে যায়।

দুর্গম বনের ক্রোড়ে যে শিশু লালিত, আশৈশব কাল থেকে যে মন অরণ্য ও জীবনকে অভিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত, বনের ভীতি, বিহ্বলতা, আনন্দ ও উচ্ছলতা যার সত্তাকে স্বাভাবিক ভাবেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে—এই ঘটনাকে সে সহজ ভাবেই ব্যাখ্যা করে নিল। দৃঢ় প্রত্যয় এলো, বন্দুকের বিনিময়ে বনবিবির অদৃশ্য স্নেহেই তার জীবন সেদিন ফিরে পেয়েছে, নইলে বাঘের কোল থেকে কে কবে ফিরতে পারে! মনে হলো, বনবিবির উপাসক বাওয়ালির জীবনই তার জন্য নির্দিষ্ট।

বাওয়ালি জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও ডাক কলিমের মনের তলে অনেকদিন ধরে গুন্‌গুন্ করে। অবশেষে একদিন আক্রাম বাওয়ালির দ্বারস্থ :

যাবার আগে নিধু শিকারির কাছে গেলে সে বলল—কি হে! তুমি নাকি ফক্কির বাউলে হতে চলেছ।

—রাজা-বাদশা হবার তো জো নেই, তাই ফকির হয়েই দেখি না একবার!

—তা বেশ! কিন্তু কার কাছে বাউলে মন্ত্র নেবে? শুনলাম, আক্রাম বাউলের কাছে যাওয়া ঠিক!

—তাই তো ইচ্ছে।

—জানোতো আক্রাম বাউলের কথা, বড় কড়া লোক কিন্তু। কাউকে মন্ত্র দিতে চায় না। আর যদি দিলো তো তাকে এমন পরখ করে নেবে, বলার না। নাজেহালের একশেষ করে তবে ছাড়বে। বুঝে-সুজে যেও কিন্তু।

—দেখি একবার বুড়োকে ঘায়েল করতে পারি কিনা। পারি না পারি, দেখতে দোষ কি! বনেই তো পড়ে থাকতে হবে! অস্তর যখন ছেড়েছি, একবার মন্তরের চেষ্টা করতে তো হয়। কি বলো?

কলিমের পক্ষে পারা না পারা নিয়ে নিধু শিকারির মনে সন্দেহ থাকলেও মুখে সায় দিল। কলিম এবার গড়-কমলপুরের পথে। পথ বলা বোধহয় ঠিক নয়, ভেড়ি ধরল। ভেড়িই এ দেশে একমাত্র পথ।

মঠবাড়ি থেকে গড়-কমলপুর সোজা পশ্চিমে। অনেক দূর। যেতে যেতে বেলা প্রায় গড়িয়ে আসবে। গড়-কমলপুর খুবই পুরান আবাদ। রাজা প্রতাপাদিত্যের কমলপুর দুর্গ এখন গড়-কমলপুর নামেই পরিচিত। রাজধানী ধূমঘাটের পুব-দিকে কপোতাক্ষী নদীপথে শত্রু সৈন্যকে রুখবার জন্য এই দুর্গের সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু দুর্গ নয়, কামানের গোলাগুলি বানাবার জন্যও এই এলাকা নির্দিষ্ট ছিল।

গড়-কমলপুর যেতে কলিমকে দুটি নদী পার হতে হবে। প্রথম শাঁখবাড়িয়া, তারপর কপোতাক্ষী ; বেদকাশীর ধারে শাঁখবাড়িয়া পার হয়ে কিছুটা এই নদী বরাবর এগিয়ে সোজা পশ্চিম-মুখো চক্‌গড় আবাদের ভেড়ি ধরে গড়-কমলপুর পৌঁছান যায়। চক্‌গড়ে পৌঁছাবার আগে অবশ্য কপোতাক্ষী পার হতে হবে।

গড়-কমলপুরের মুখেই গড় গাঁ। এই গড় গাঁয়ে আক্রাম বাওয়ালির বাড়ি। নাম আক্রাম ঢালি। প্রতাপাদিত্যের কোনও ঢালি সৈন্যের বংশধর। যোদ্ধার বংশ।

ভাটি বাঙলার মানুষ মাত্রই কোন না কোন ভাবে যোদ্ধা। সংগ্রামী না হলে এখানে জীবিকার সংস্থান হয় না। খরস্রোতা নদীর জোয়ার ভাটার সঙ্গে এদের দিন রাতের লড়াই চলে। প্রতি বছরই ভরা লোনা-প্লাবনের জন্য এদের তৈরিই থাকতে হয়। আর বছরব্যাপী লোনা মাটিতে সোনা ফলাবার সংগ্রাম তো আছেই। এক কথায়, নদী ও লোনার বিরুদ্ধে এদের জীবন-মরন লড়াই। তা ছাড়া আর যে লড়াই আছে, সে তো এদের কাছে হাতের পাঁচ। এরা তা ভুলেই থাক। জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের সঙ্গে নিরলস লড়াই। তবুও, এত যোদ্ধার মধ্যেও প্রতাপাদিত্যের ঢালি সৈন্যের বংশধরেরা আজও বিশেষ সম্মানের অধিকারী। আক্রাম একে তো ঢালি, তার উপর বাওয়ালি। এক ডাকে এ গের্দে সবাই চেনে।

আক্রামের বাড়ি ঢুকতে প্রথমেই কলাগাছের ঝাড়। তারপরই ছোট আঙিনা নিয়ে দুখানি গোলপাতার দো-চালা। শীতের মরসুম, গোবর দেওয়া চত্বর তক্‌তক্ করছিল। তবুও যেন একটা গুরু গম্ভীর পরিবেশ। গৃহীর গৃহে যদি শিশুর কাকলি না থাকে, তাতে যা হয়। আক্রাম নিঃসন্তান।

কলিম দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে বেশ ক্লান্ত। তাহলেও খুশি মন নিয়েই এসে দাঁড়াল।

—কি চাস ? হবে না, ওসব হবে না !......তফাৎ যা,......তফাৎ যা !

ভারিক্কি দেহের ভারিক্কি আওয়াজে আক্রামের অভ্যর্থনা।

কলিম হক্‌চকিয়ে গেছে। কথা নেই, বার্তা নেই, কি মতলবে এসেছে তার খোঁজ নেই —বলে কিনা হবে না। কলিমের মুখে প্রায় প্রত্যুত্তর এসে গিয়েছিল—লেজ ধরে দেখলে না, এড়ে কি বক্‌না, আগেই খাল পার হতে বলছো ?—কিন্তু কলিম নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল।

অপরিচিত যুবক দেখেই আক্রাম বুঝে নিয়েছে। তার কাছে প্রায়ই এমনি ভাবে দূর দূরান্তের গাঁ থেকে অনেক জোয়ান ছেলে মন্ত্র নেবার আশায় আসে। আক্রাম গালি দিয়েই চলেছে। তবু কলিম স্থির চাহনি নিয়ে দাঁড়িয়ে। অমন চুপমেরে থাকতে দেখে আক্রাম আরও ক্ষিপ্ত। দাওয়ায় বসে ছিল। যেন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাঁচা পাকা দাড়ি আর বাব্‌রিচুলে ঝাঁকি মেরে মেরে গর্জন করতে থাকে,—যা, বেরিয়ে যা ! ভাগ্, এক্ষুনি ভাগ্...ভাগলি না।

কলিম তবুও স্থির। আক্রামের এবার অশ্লীল ভাষায় গালি। যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলে খাবে। কলিম একবার ভাবে, চলে যাবে নাকি ? মাথা ঘুরিয়ে খিড়কির দরজার দিকে একবার নজরও দেয়। পর মুহূর্তে ভাবে,—না ! দেখি না, শেষ পর্যন্ত কি করে। যে গর্জায় সে বোধহয় বর্ষায় না !

এমন সময় আক্রামের বিবি হুকো নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এমন গালাগালিতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ অন্যপক্ষের কোনই সাড়া না পাওয়াতে একটু অবাক। দো-বেড়া কাপড় পরা। ছোট আঁচলে কোন মতে মাথা ঢেকে কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে আসছিল। কলিমের শান্ত মুখে দুষ্টুমি চাহনির ওপর নজর পড়তেই ফুঁ থেমে গেছে। আরও অবাক। ......একটু বুঝি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সহসা দ্রুত পায়ে এগিয়ে বুড়োর হাতের তেলোতে থপ্ করে হুঁকোর খেলো বসিয়ে দিয়ে ছোট্ট করে বলল,—আর কেন !!

তারপর ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে রসুইখানার দাওয়ায় কলিমকে বসতে দিল। বসিয়েই একটানা প্রশ্ন করে বৃদ্ধা বিবি,—তুই কোন্ আবাদের ? আম্মা আছে ? মন্তর নিবি ? আম্মা সায় দিল ? কি করে দিল !

কলিম মুখ নিচু করে আস্তে বলে,—না, আমার আম্মা নেই।
—আম্মা নেই! তা বাউলে হতে এলি কোন্ সাহসে?
—বনবিবির দয়ায়। এখন বাউলের দয়া।
—বড্ড বেকাদা নোক রে, বড্ড বেকাদা নোক!
কলিম চুপ হয়ে আছে, বিবিও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক।
হঠাৎ কলিম মাটির থেকে চোখ তুলে বলল,—আম্মা! একটু পানি দেবে? বড্ড তেষ্টা।
মাতৃসম্বোধনে এবার বুঝি সন্তানহীনা বৃদ্ধা বিবি বিমূঢ়া।—তাই তো! —বলেই প্রায় এক ছুটে সরায় করে একটু গুড় আর এক বদনা পানি নিয়ে আসে।
এদিকে বৃদ্ধ বাউলে নিস্তব্ধ ও নিস্তেজ। বিবির ছোট্ট আবেদনে, না হুঁকোর টানে—তা বলা দুঃসাধ্য। গালাগালি ও আক্রোশের আবেগ থেমে আসে। ঝড়ের উদ্দামের পর ধরিত্রী যেমন শান্ত হয়ে পড়ে। শান্ত হলেই যে তাকে আরেক আবেগে পেয়ে বসবে—যে আবেগে সে বাদায় বিপন্ন মানুষের জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ করতে দ্বিধা করে না কোনদিন। দেবে না সে সেই আবেগকে প্রশ্রয়। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বারবার হুঁকো টানতে থাকে। কলিমকে হাতে ধরে বিবিকে ভিতর আঙিনা থেকে আসতে দেখামাত্র হুঁকার টানের লয় যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। কলকে বুঝি ফেটে যাবে। না, কলকে ফাটে না—ফাটলো আক্রাম বাউলে। ঝড়ের বেগে বলল,—যা, মঙ্গলবার আসিস্......সেদিন কথা হবে।

* * * * *

কলিম আর দ্বিতীয় কথাটি বলেনি সেদিন। বিবির হাতের মুঠো শিথিল হতেই গুরু ও গুরু-পত্নীকে সেলাম ঠুকে ফিরে এসেছিল। ফিরে এসে শুধু মঙ্গলবার গুনতে থাকে। মঙ্গলবার সে যাবে, কিন্তু খালি হাতে কি করে গুরুর কাছে যাবে! ভাল একটা সিধে নিয়ে যাবার বড় আশা। নতুন একটি ধামা, দাদখানি ধান, আর এক ভাঁড় খেজুর গুড়ও যোগাড় করেছে। খেজুরগাছ এদেশে দুর্লভ। নোনা মাটিতে মিষ্টি ধান হলে কি হবে, এ মাটির মিঠে রস খেজুরগাছ সঞ্চয় করতে অপারগ। ফলে খেজুর গুড় আবাদে দুর্মূল্য। এক ভাঁড় গুড় আর এক ভাঁড় দুধ দিয়ে নিধু শিকারী কলিমের এ-যাত্রা মান রক্ষা করে। কিন্তু সুফলা বাংলা দেশে কোন সামাজিক পর্ব, পালন বা উৎসবে ফল ছাড়া সিধে হয় না। একে নোনা দেশে ফল পাওয়া দায়, তাতে আবার শীতকাল। ফলের তল্লাসে মঠবাড়ির পূব-পল্লীর সীমানায় কলিম হাজির।
পূব ভেড়ির মাঝামাঝি বড় আল্ বা ক্রস্-ছিলা। ক্ষেতের মাঝ দিয়ে টানা এসে পশ্চিম ভেড়িতে মিশেছে। এই ক্রস্-ছিলার পাশেই লায়লার ঘর। লায়লার বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ। একাই এ বাড়িতে থাকে। পুত্র-হারা মা সে। আঁতুড় ঘর থেকেই তাকে শূন্য কোলে বেরুতে হয়েছিল। এই শূন্যতা তখন লায়লাকে পেয়ে বসে। দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে এক দ্বৈত জীবনের আগমন বার্তায় লায়লার মনে কত স্বপ্নসৌধই না জানি গড়ে উঠেছিল পলে পলে গত ন'মাস ধরে। সবই যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। অন্য নারী হলে কি হতো কে জানে, কিন্তু লায়লাকে এই শূন্যতা কঠিন করে তোলে। স্পর্শকাতরতা নারীর এক মহাসম্পদ—যার অভিব্যক্তি তার চোখে, মুখে ও অঙ্গ সম্বরণে অহরহ প্রতিফলিত হয়। সন্তান-হারা লায়লার মাতৃহৃদয় যেন সেই স্পর্শকাতরতা হারিয়ে ফেলে। যার দিকেই

দৃষ্টিপাত করুক না কেন, সে পুরুষ হোক আর নারী হোক—লায়লা বেশ কিছুক্ষণ ধ
তাকিয়েই থাকে। নিঃসঙ্কোচে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে কোন উন্মনা ভাব থাক
না। সন্তানের জন্ম ও মৃত্যুতে বুঝি জীবনের আনাগোনা নিয়ে এক বৈরাগ্যের অনুভূতি দে
দিয়েছে। লায়লার চোখের চাহনিতে ছিল তারই পরিচয়

এরই কিছুদিন পরে আর এক মৃত্যুতে লায়লার বাহ্যিক কাঠিন্যে পরিবর্তন আসে
সোয়ামী ছাদেক আলি একদিন বিনা আড়ম্বরে বনে কাঠ কাটতে ওঠে। সঙ্গীরা সাতদি
পরে বাঘের হাতে ছাদেকের মৃত্যু সংবাদ তেমনি বিনা আড়ম্বরেই পৌঁছে দেয় লায়লা
কাছে।

এবার শুধু মনের শূন্যতাই নয়, বাইরের শূন্যতাও লায়লাকে চেপে ধরে। সংসারে তা
কেউ রইল না—সে একা। তাই সে এর থেকে বাঁচবার জন্য যেন সকলের হয়ে উঠ
চায়। সকলকে জড়িয়ে যেন এই শূন্যতা পূর্ণ করে রাখতে চায়। সকলেও তাকে বু
আশ্রয়পুষ্ট করে রাখতে চাইল। আপদে ও বিপদে, আনন্দে ও উৎসবে লায়লাকে ডাক দে
সকলে। কাজ না থাকলেও, কাজের অছিলায় মঠবাড়ির প্রতি ঘরে তার আমন্ত্রণ ও আগম
যেন লেগেই আছে। বলতে গেলে, লায়লা ইতিমধ্যে সকলের হয়ে উঠেছে।

ফলের খোঁজে পুব-ভেড়ির সীমানায় এসে সেদিন কলিমের বোধহয় লায়লার সঙ্গে প্রথ
আলাপ। এর আগে অবশ্য কাজে-অকাজে লায়লার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বা দু-একটা কথা
হয়েছে ; কিন্তু তাকে আলাপ বলা চলে না। ভেড়ির পাশ দিয়ে যেতেই দূর থেকে লায়লা
উঠানে মাচায় পুষ্ট লাউগুলি ঝুলতে দেখে কলিম এগিয়ে আসে। কিন্তু লাউয়ের ক
পাড়বে কি করে তাই তার সমস্যা।

খিড়কি-দরজার হুড়কো খুলতে খুলতে কলিম বলল,—ঠাগ্‌রোন্‌, অমন ফলব
কদুগাছে একটা কালো হাড়ির মুখও রাখোনি! নেক্‌ নজর পড়বে যে!

মুরগীর বাচ্চাগুলিকে লায়লা লঙ্কার বীচি খুলে খুলে খাওয়াচ্ছিল। চিলের ছোঁর ভ
দাওয়ায় বসেছে। কলিমের আওয়াজ পেতেই আলগা আঁচল জড়িয়ে নিয়ে উঠানে নে
এলো। বলল—কালো হাড়ি ঝোলাতে হবে কেন! আমারই মুখ তো কা
হাড়ি!—বলেই সশব্দে হেসে উঠল।

কলিম এমন চোখা উত্তর আশা করেনি। তার ঠোঁটে ঠাট্টার হাসি মিলিয়ে যাবার মত
সামলে নিয়ে বলল,—না! তাতে কিন্তু মানাবে না।

লায়লা হাসি না থামিয়েই বলে,—কেন, নেক নজরে পড়েছে নাকি! দরকার নেই নে
নজরের, তুমি একটা কদু নিয়েই যাও না। কি হবে আমার এতো কদু!

কলিম এবার লজ্জা পেয়ে মনের কথা পাড়ে—জানো তো, ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করত
কড়ি; আমার হয়েছে গিয়ে তাই। গুরুকে সিধে দেব, তাই ফল খুঁজে খুঁজে মরছি

—অবশেষে কনের কাছে কড়ি!......আর না মেলে তা গলায় দড়ি! তাই তো

—তা তুমি তো বেশ ফকির-মান্‌ষের বোল শিখেছো! রগড় না ঠাগ্‌রোন্‌, একটা চাই
আজ। তা না হলে গুরুর কাছে যাই কি করে বলো!

গুরুর কথা উঠতেই একের পর এক প্রশ্ন করে লায়লা কলিমের আদ্যোপান্ত কাহি
জেনে নিল। যাবার বেলা কলিমের হাতে একটার বদলে দুটো কচি লাউ কেটে দি
বলল,—আচ্ছা, বাউলে!......

—না, না, আমি এখনও বাউলে হইনি।

—বেশ না হযেছ! আচ্ছা তোমার গুরু বিবিদের বাউলে মন্তর দেয়?

—বিবিদের !—কলিম হতভম্ব।

কেন, বিবিরা কি দোষ করল ? তোমার বনবিবি বুঝি বিবি না ?......কি, সায় দিচ্ছ না যে !

কলিম সায় দেবে কি ! থতমত খেয়ে গেছে। পরাজয়ের হাসি এনে বলল,—ঠাগ্‌রোন, তোমার সঙ্গে পারা যাবে না !......

লায়লা বোধহয় এতেই খুশি। খিড়কি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল,—যাও বাউলে,......যাও বাউলে, ভালোয় ভালোয় মন্তর নিয়ে এসো।

এবার বুঝি 'বাউলে' ডাকের প্রতিবাদ করতে কলিমের মন চায় না।

পাঁচ

পরদিন শুকতারা থাকতেই খুব ভোরে কলিম উঠেছে। এক কাছারি ছাড়া মঠবাড়িতে কোনও বড় পুকুর না থাকলেও অনেক বাড়িতে ডোবা আছে। সাধারণত ডোবার জলে সকলে গোছল সারলেও আজ কলিমের বদ্ধ জলে শুদ্ধ হতে ইচ্ছা হয় না। নদীর পলিমাটি সিক্ত স্রোতের জলে অবগাহন করে নিয়ে যাত্রা করল।

সিধে মাথায় করে কলিম আক্রাম বাওয়ালির বাড়ি হাজির। সিধে দেখতেই আক্রামের মনে হলো, তার অনুমান মিথ্যা না,—এ বান্দা ছাড়বার পাত্র নয়।

আজ কিন্তু আক্রামের সেদিনের রূপ নেই। প্রথম থেকেই কলিমকে সাগ্রহে বসিয়ে কথা পাড়ল,—তোর বাউলে ফকির হবার শখ্ কেন রে ?

কলিম একটু নড়ে বসে আট হাতি কাপড়ের কোণা টেনে হাটু ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে বলল,—বড় গাছে কাছি বাঁধাই ঠিক বলে মনে হলো !

—বড় গাছ না হয় হলো, সে কথা বলছি না। কাছি বাঁধবার শখ্ কেন ?

—কি জানো গুরু ! পড়লো ফাগুন তো উঠলো আগুন ! আমার গিয়ে তাই হয়েছে। কি ফেরে যে সেদিন বনে গিয়েছিলাম, তারপর থেকেই যেন মন মজে আছে। বারবার ঐ এক কথাই মনে আসে।

সুযোগ পেয়ে কলিম একে একে সেদিনের সব খুঁটিনাটি ঘটনাই বলল।

কাহিনী শুনে আক্রাম চুপ হয়ে গেছে। একে তো-মনে মনে প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিল, তার ওপর এই অদ্ভুত ঘটনা তাকে আরও আকৃষ্ট করে। কলিমকে যেন তখনই তার মনের মত শিষ্য বলেই গ্রহণ করল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ইতিমধ্যে আক্রামের বিবি কাছে এসে বসেছে। কলিমের কাহিনী শুনতে শুনতে সংসারের সকাল বেলার অগুনতি কাজের ফর্দ ভুলেই গেছে। তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে ফকিরের মুখের দিকে—এইবার নিশ্চয়ই ফকির সায় দেবে !

সায় দিলো আক্রাম। হঠাৎ অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি ভাবে বলল,—পরীক্ষা দিতে পারবি ? এক পরীক্ষা তো তোর হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে পরীক্ষা দিতে হবে। বল, পারবি ?

কলিমের কণ্ঠে দৃঢ় অথচ শান্ত সুর,—কিসের পরীক্ষা, গুরু ?

—কিসের পরীক্ষা ! বল্, কোথায় তোর সব থেকে ভয় লাগে ?

কি উত্তর দেবে সহসা ভেবে না পেয়ে, প্রথমেই যা মনে পড়ে কলিম তাই বলে ফেললো,—কাছারি বাড়ি।

—ধুত্‌, কাছারি বাড়ির কথা কে বলেছে ? বনে,…বনে তোর কোথায় তরাস্‌ লাগে ?

ধমক খেয়ে চোখ বুঁজে ত্রাসের কথা ভাবতে ভাবতে কলিম বলল,—বনের তরাসের কথা বলছ ? আমি ঠাহর পাইনি, কিন্তু বাঘ আমার ঠাহর পেয়েছে, এমন কথা মনে হলেই তরাসে বুক শুকিয়ে যায়।

ফকির-বিবি উৎকণ্ঠিত। এই ধরনের ধমক ও জেরার তোড়ে অনেক জোয়ান ছেলেকে বিমুখ হয়ে যেতে সে দেখেছে। ভাবে, ফকিরের ধমক্‌ এবার বুঝি বা চরমে উঠবে।

কলিমের উত্তর শুনে ফকির কিন্তু চুপ। কি জানি কি বুঝে ফেলে এক নজরে তাকিয়ে রইল কলিমের চোখে চোখে। কলিমও পরীক্ষার প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে সমভাবে। চোখে চোখ রেখেই ফকির হঠাৎ হেসে ফেলল। দাড়ি গোঁফের আড়ালেও সে হাসি বড় মিষ্টি লাগে।

বিবির দিকে ফিরে ফকির ইঙ্গিত করে অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য। নিয়মমত বন্ধ ঘরে ধূপ-ধুনোর মধ্যে জলচৌকিতে বসে ফকির কলিমকে দুটি ছড়া মুখস্থ করিয়ে বলল,—এ কিন্তু আসল মন্ত্র নয় ; আসল মন্ত্র এখানে আবাদে হয় না। বনবিবির মন্ত্র বাদায় দাঁড়িয়ে নিতে হবে। দেরি আছে তার। পাঁচ বছর। এই পাঁচ সন যখন যেখানেই থাকিস্‌ না কেন, ডাকলেই আমার সঙ্গে বাদায় যেতে হবে। হ্যাঁ, আরেকটা কিরে আছে—এখন থেকে দশ বছর বিয়ে-সাধি মানা কিন্তু। কোন কারণেই এর নড়চড় হবে না।

অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হতেই ফকির-বিবি যেন মুখরা। হাঁকডাক, ছুটাছুটি করে একাই যেন বাড়ি মাৎ করে তুলতে চায়। খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হতে বেশ দেরিই হলো। এটা-ওটা রান্না না করে বিবি থামতেই চায়নি। কলিমের মজাই লাগে, তাকেই সামনে রেখে এত আয়োজন ও ঘটা।

খাওয়া-দাওয়ার পর আক্রাম ও কলিম দাওয়ায় অলসভাবে বসে আছে। আক্রাম তামাক টানতে-টানতে প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, তুই বলছিলি, কাছারি বাড়ি ; সেখানে ভয় পাবার তোর কি হলো ?

—ওঃ, ফকির, সেই কথাটা তুমি এখনও মনে রেখেছ ! কি জানো, মিত্তির জমিদারের কাছারি, আমাদের মঠবাড়ির কাছারি। তখন পোলাবান, বা'জানও বেঁচে। তার সঙ্গে একবার কাছারি যাই। গিয়ে দেখি কি, বুড়ো নুরুল গাজিকে তুরুং ঠুকেছে। গাজি এখন আর বেঁচে নেই। সেদিন ভাদ্র মাসের কাঠফাটা রোদ। দেবতা মাথার ওপর। দুটো এই মোটা গরাণ খুঁটিতে চার-হাত-পা টানটান্‌ করে বেঁধে খলেনে চিৎ করে ফেলে রেখেছে চুপচাপ পড়ে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আর বুকের পাঁজরা বেয়ে দর্‌দর্‌ ঘাম ঝরছে

ফকির সশব্দে হেসে উঠে বলল,—আর তোর বুঝি সেই থেকে ভয় !

খানিকটা হুঁকো টেনে আবার প্রশ্ন করল,—গাজিকে তুরুং ঠুকতে কেন গেল রে

—আর বলো না ! যাকেই জিজ্ঞাসা করি, মালেকের ভয়ে কেউ কিছু বলে না। পরে স জেনেছি। কি আর হবে ! জানই তো চাষার মুখ, না আখার মুখ। আশ্বিন মাস অবধি হিসে করে নায়েব ধান কর্জ দিয়েছিল। গাজি তো ভাদ্দর না পড়তেই তা কাবার করেছে। পে না খেয়ে মাঠে খাটবে কি করে ! তাই গাজি কথার পিঠে কথা শুনিয়ে দেয়—পারব ন বেগার খাটতে, খেতে না দিলে। কিন্তু নায়েব তা শুনবে কেন ! আমি কিন্তু তখন আ কোনদিনও কাছারি মুখো হইনি। ওর ধারে কাছে গেলেই যেন বুক দুরদুর করতো

—আর বাঘ দেখলে ?

—তা যা বলেছ ! কি জানো গুরু, শুনেছি, বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে ; কাছারির যে তা

নেই !

কথায় কথায় সময় কেটে যায়। দেবতা পশ্চিমে ঢলে পড়ে। কলিম ধীরে ধীরে সেদিনের মত বিদায় নিল। বৃদ্ধা বিবি বুঝি বিদায় দিতে পেরে ওঠে না। কলিমের পিঠপিঠ খিড়কি ছাড়িয়ে আনমনে রাস্তায় এসে গেছে। কাণ্ড দেখে কলিম ফিরে আসে কয়েক কদম। এগিয়ে এসে বলে,—যাও আম্মা, মিছে মায়া বাড়িও না !—বলেই দ্রুতপায়ে গড় গাঁয়ের পুরানো ঝোপঝাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল। আড়ালে গেলে বুঝি নিজের আবেগ বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

আজও অবধি কলিম সেদিনের কথা ভুলতে পারেনি। গড় গাঁ থেকে মঠবাড়ি পর্যন্ত সেদিন যেন নিমেষে চলে এসেছিলো। বাড়ি পৌঁছান অবধি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে। মুগ্ধ হয়ে থাকার মত এই কদিনের মধ্যে অনেক ঘটনাই তো ঘটেছে। ফকিরের পরীক্ষা ও সম্মতি, শিষ্য হবার আশীর্বাদ, নতুন এক জীবনে পদার্পণ, যার শুরু হলো সেদিন এক কঠিন পথের মধ্য দিয়ে,—না, এ সব নয়। এ সব ছাড়িয়েও যেন এক অজ্ঞেয় অনুভূতিতে তার মন আপ্লুত। নিজে সে এতক্ষণ ধরতে পারেনি। গাঁয়ে ফিরে নিজের বাড়ির উঠানে আসতেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে চোখ দিয়ে তার দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

শৈশবের মাতৃস্মৃতি বিজড়িত আঙিনায় আসতেই ফকির-বিবির ছবি যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে !

ছয়

কলিম মাতৃহারা। শৈশবেই সে মাকে হারিয়েছিল। সংসার রক্ষা করতে বা'জান তখন নির্ঝঞ্ঝাট ফুফুকে নিয়ে আসে। ঠিক নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। সঙ্গে তার ছোট একটি ছ-সাত বছরের মেয়ে—আমিনা। ফুফুর নিজের মেয়ে নয়। নারী হৃদয়ের কোমলতাকে পুষ্ট রাখবার জন্য এক মাতৃহারা শিশুকন্যাকে ফুফু আশ্রয় করেছিল।

ফুফুর ইচ্ছা ছিল, কলিম বড় হতেই এ সংসারে মায়া ছেড়ে নিজের বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু তা আর যেতে হলো না। কলিমের বাজান কবর নিতেই ফুফু যেন এই আঙিনার মাটির সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়ল।

আবাদের অন্য সব বাড়ির মতই কলিমের বাড়ি নদীর কিনারায় ভেড়ির কোলে। তাছাড়া উপায়ও নেই। প্রতি আবাদে ভেড়ি থেকে একশ হাত গেলেই 'নামো'। ঢালু হয়ে চাষের ক্ষেতের সমতলে বিস্তৃত। এই ক্ষেত চলতে থাকে এক একটি আবাদের অরেক সীমানা পর্যন্ত। সেখানে আবার একশ বা দুশ হাত ক্রমে উঁচু হয়ে আর এক নদীর কিনারায় পৌঁছে। এই ভূমি গঠনে মানুষের কোনও হাত নেই। মঠবাড়ির অধিবাসীদেরও কোন হাত ছিল না। মানুষের হাতে গড়া ভেড়ির বাঁধনে আটক পড়ার আগে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গাঙ্গেয় পলিমাটি ভারাক্রান্ত নদীর জল উপচে পড়ত চারিদিকে। নদীর গতির বেগ থেকে সরে আসতেই রাশি রাশি পলিমাটি প্রথমেই ঝরে পড়ে নদীর কিনারায়। ধীরে ধীরে নদীর তীর গড়ে ওঠে উঁচু হয়ে। পাশাপাশি নদ ও নদীর এই গাথুনির বহুবন্ধনে তখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ জলা ক্ষেত। গাঙ্গেয় অববাহিকায় এই প্রাকৃতিক নিয়ম চলে এসেছে আবহমান কাল। তারপর সংগ্রামী মানুষের বাহুবলে তৈরি নদীতীর বরাবর ভেড়ির বাঁধনে বন্দিনী হয় অনুর্বরা জলসিক্ত ভূমি। মানুষের তাগিদে তাকে যে ফলবতী হতেই

হবে।

মঠবাড়ির বসতিগুলি ভেড়ির কোল ধরে এই একশ হাতের মধ্যে এক সার বেঁধে চলে গেছে বরাবর। এরই মধ্যে সামান্য একটু আঙিনা আর তিনখানা দোচালা নিয়ে কলিমের ঘর। এ ছাড়া কলিমের সম্পত্তি বলতে আছে বিঘে পাঁচেক ধানীজমি আর একখানা পঁচিশ হাতি ডিঙি।

মঠবাড়ির ফলন ভালই। খুব ভাল ফসল হলে বিঘে প্রতি এক বিশ ধান হয়। অবশ্য তেমন ধান হওয়া কালে-ভদ্রের কথা। কলিমের খণ্ড জমিটুকু নাবাল। ফলে ভেড়ির ঘোঘা দিয়ে নোনা জল চুইয়ে এলে ফলন কমে আসে। ভেড়ি হাজার শক্ত-পোক্ত করলেও অমন নোনা জল চুইয়ে একটু আধটু আসেই।

এদের ধানেব হিসাবের সঙ্গে জীবনের সোজা যোগ আছে। একশ ষাট পালিতে এক বিশ ধান হয়। ভাল এক বিঘা জমি ধান দেয় এক বিশ। আবার বছরে একজনের খোরাকিও এক বিশ। এই হিসাবে কলিমের আড়াই বা তিন বিশ ধান যা হতো, তাতে কোনমতে খোরাকির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু শুধু খোরাকিতে তো দিন কাটে না। বাড়তি খরচ আছেই। তারই ভরসা ডিঙিখানা। ভাটি দেশে ডিঙি থাকলে খুচখাচ আয়ের অভাব নেই। সুন্দরবনের সম্পদ অঢেল। কাঠ, মাছ, গোলপাতা, মধু, আরও যে কত কিছু তার ইয়ত্তা নেই। ডিঙি থাকলে সুন্দরবন চরে খাওযা যায়। এখানে অধিকাংশই ভাগ-চাষী। জমি না থাকলেও এরা একখানা ডিঙি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

কলিমের কিন্তু বাড়তি আয়ের দিকে বিশেষ মন নেই। করে না যে তা নয়, তবে উদ্যোগ নেই। এখন তো আরও নেই। রাতদিন পাঁচ বছরের হিসাব করে। তিন বছর হয়ে গেল, আক্রামের কোনও ডাক বিশেষ আসে না। তবুও কলিম ঐ নিয়েই মশগুল। না হয়েই বা উপায় কি! বাওয়ালি পুরো না হলেও—পাড়াপড়শী ইতিমধ্যেই বাউলে নাম দিয়েছে। শুধু তাই নয়। তাদের অসুখে বিসুখে কলিমের ডাক। বাঘের যখন মন্তর জানে—ঝাড়-ফুঁকের মন্তর অজানা থাকবে কেন! লোকের বিশ্বাস দেখে কলিম মুচকি হাসলেও, অন্তরালে আত্মহারা হয়ে পড়ে ওদের ডাকে। ভাবে ওদের যখন অতই বিশ্বাস, হয়ত কাজ দিতে পারে।

ফুফু একদিন কলিমকে কাছে ডেকে বসিয়ে বলে,—তুই তো এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে বেড়াস, বাড়তি কিছু আয়-টায় কর না? না হলে তো চলে না।

—কই, বেশ তো চলে যাচ্ছে! তুমি থাকতে আমার লাও কখনও চড়ায় উঠবে না, ফুফু!

—না, না, ওরকম করিস না। পোষ মাস তো এলো। আর কিছু না করিস, দালালগিরিও তো করতে পারিস। ঠিক তুই কথা বেচে আয় করতে পারবি। দেখ না একবার?

—ছাগল দিয়ে মাড়াই হলে কি কেউ গরুর খোঁজ করবে? আমাকে নেবে কেন।

—নে, আর বকিস না। বোল-ই শিখেছিস। বিয়ে-সাদি করলি না, বুঝবি কি?

কলিম পাশ কাটাল। কাটালে কি হবে, কথাটা ওর মনে লেগেছে। এমনিতে কাজ-কর্ম সহসা করতে না চাইলেও যখন মনে ধরে তখন গতর-খাটিয়ে প্রাণ-মন লাগিয়ে কাজ করবে। সে-কাজে সে সবার সেরা হবেই হবে। ওর কেমন যেন জিদ এসে যায়।

ধান পাকলে যেমন ঘুঘুর ঝাঁক আসতে থাকে। তেমনি ভাটি বাঙলায় ধান কাটতে শুরু হলে দেশ বিদেশের ব্যাপারীর নৌকা আসতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। এক ফসলা দেশ। সারা

বছরের দেন্‌-দায়িক পরিশোধ করতে হবে এই এক মরশুমে। তাই এদেশের মানুষ ধান উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বেচবার জন্য আকুল। পৌষ মাস থেকেই যেন বিকি-কিনির ধূম পড়ে যায়।

বিদেশী ব্যাপারীর দল এখানে এসে পড়ে মুশকিলে। বিদেশ বিভূঁই, তাতে সুন্দরবনের নির্জন ও বিপদসঙ্কুল নদীপথ। স্থানীয় লোকের সাহায্য চাই—তাতে যেমন তারা খানিকটা আশ্রয় পায়, তেমনি খোঁজও পায় কোথায় কি ধান আছে। তাছাড়া, দেশী লোকের মারফৎ দাম দস্তুর করাও সোজা। তাই তারা কয়াল বা দালালের উপর নির্ভর করে। গাঁয়ের লোকেরাও,চেনাশুনা দালালের মারফৎ নিশ্চিন্তে ধান বিক্রী করতেও চায়। দালালের দস্তুরিতে কোন পক্ষই ক্ষুণ্ণ হয় না।

কলিম এক ব্যাপারীকে ধরল। বেশ বড় ব্যাপারী, আড়াই হাজারি নৌকা। ব্যাপারী এর মধ্যেই কলিমের প্রতিপত্তির কথা শুনেছে। বুঝে ফেলেছে, তাকে দিয়েই কাজ হবে। বড় ব্যাপারীদের সর্বদা লক্ষ্য কত তাড়াতাড়ি নৌকা বোঝাই করে ক্ষেপ দিতে পারে। ধান কিনতেই যদি মাস কেটে যায়—তাহলে খাই-খরচা ও নৌকা-ভাড়ায় পোষায় না, তা দালাল পালির মাপ যতই টেনে করুক।

ব্যাপারী কলিমকে নৌকায় এনে আদর যত্ন করে বসিয়ে বলল,—বসো, বসো ফকির, পান-তামুক খাও। তুমি তো আবার ফকির মানুষ, পান-তামুক খেতে আপত্তি নেই তো!

—নোনা দেশে পান-তামুকই তো পানি। ফকির হয়েছি বলে তো পানি খাওয়া বাদ দেইনি।

—তা বেশ বাউলে! দস্তুরি তো যা পাবার পাবে, কিন্তু তোমার……

—নেও, তা আর বলতে হবে না। শলায় কত চাও—দুই পালি. তিন পালি, চার পালি…

—না, না, তা বলছি না। আমরা তো তোমাদের পালি বুঝি না। আমরা কাঁটায় মেপে নবো। গড়ে বিশ প্রতি বারো মণ ধান উঠলেই আমরা খুশি।

চল্লিশ পালিতে এক শলা, আর চার শলায় এক বিশ। দালালদের কেরামতি এলে—চল্লিশ পালি মাপবে সবার চোখের সামনে, কিন্তু ঠিকমত মাপলে হবে দুই বা তিন পালি বেশি। ধানের রাশিতে পালি কে কতটা ঘুরিয়ে বসাতে পারে, তারই কায়দায় এমন অঘটন ঘটে। কলিম ব্যাপারীর সামনেই পালি বসাবার কায়দা দেখিয়ে দেয়। দেখাতে দেখাতে বলে,—ব্যাপারী, তোমরা তো জানো হালের মোচড় দিতে, পালির মোচড় আমাদের হাতে। তোমরা তার কতটুকু বুঝবে! আর দালালি মানে তো ঘটকালি। ঘটকালি করতে গিয়ে নিজে নিশ্চয় বিয়ে করে বসবো না!

ব্যাপারী হো হো করে হেসে উঠে বলল,—সাবাস্‌ ফকির! না, না, তা বলছি না। আমি তো কাঁটায় মেপেই খোলজাত করব।

—তা তো নিশ্চয়। গোনা গরু বাঘে খায় না। কাটা গুণে তারপর আমার হিসেব দিও।

ব্যাপারী কথায় ভুলতে চায় না; কলিমকে বাজিয়ে নিতে চায়,—তা নয় হলো! কিন্তু তুমি তো নতুন ফকির-বাউলে মানুষ, গেরস্তকে মিথ্যা বলে ভোলাবে কি করে?

—বিস্‌মোল্লা! মিথ্যা বলতে যাব কেন? ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কি মিথ্যা বলেছিলো কোনও দিন! তুমিই বলো, ধম্মের জয় হলো, না অধম্মের জয় হলো।

ব্যাপারীর মাথা এবার ঘুলিয়ে যায়। বলে,—তা বেশ, কাল থেকে কাজে লেগে যাও।

কলিম কাজে লেগে গেছে। এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে ধান তুলছে তো তুলছে। ফকির দেখে সহজেই গেরস্তরা ধান ছেড়ে দেয়। নৌকা বোঝাই সহজেই হতে থাকে। কিন্তু

ব্যাপারীর মুখ কালো হয়ে আসে। ব্যাপারীর লাভের হিসাব। শুধু কথায় চিড়া ভিজবে কেন ? কলিমও ভাবগতিক দেখে চিন্তিত। শুধু বলে—দাঁড়াও বড়মেঞা, পুষিয়ে দেব। বলে অবশ্য, কিন্তু কীভাবে পোষাবে, নিজেই ভেবে পায় না। যে খলেনেই বসুক না কেন—বেচারাম, শিবে মোড়ল, আছির গাজী, মুকসুদ মেঞা বা গায়েন মোড়লের খলেন হোক না কেন, প্রথমেই কলিমের মনে থাকে ব্যাপারীকে এবার খুশি করবেই। আরে লাভে লাভ, লাভে দুই-ই, লাভে তি-ন, লাভে চা-র—গানের সুরে সে মাপ সুরু করে। ধান টানতেও থাকে অঢেল। এক শলা, দুই শলা মাপার পর ধানের কুড়ো ছড়িয়ে পড়ে নাকে মুখে। মাংসল চোখ দুটো পিট্‌পিট্‌ করে তির্যক রোদে। ধানের গন্ধে যেন তার মায়া জাগে। এক মনে নিচের দিকে তাকিয়ে মাপ শুরু করেছিলো। কতক্ষণ আর ও-ভাবে মুখ নিচু করে রাখা যায়। গেরস্তের চোখে চোখ পড়ে। পালি ভারি মনে হয় কলিমের। যেন আর ঘুরিয়ে বসাতে পারে না। বসায়ও না। ব্যাপারী গলা খাঁকার দেয়। কলিম আবার পালি ঘোরায়। কিন্তু বাঁ হাতে ধান টানবার আগেই ঘোরায়। তাতে ব্যাপারীর বস্তা ভারি হতে চায় না।

টাকা লেন-দেনের পর কলিম নৌকায় গেলে ব্যাপারী বলে,—কই ফকির ! বিশে মাত্র এগারো মণ উঠেছে !—ব্যাপারী ইচ্ছে করে বেশি কমিয়ে বলে।

কলিম ঝড়ে ছেঁড়া পালের মত মুখ নিয়ে বলে,—আরে, জোয়ার-ভাঁটা ! সব কাজেই জোয়ার-ভাঁটা আছে !

—দেখো যেন, শেষ পর্যন্ত ভাঁটোতে সমুদ্দুরে না পড়ি !

আশপাশের ছোট-খাট খলেনের ধান মোটামুটি উঠেছে। কিন্তু এতে পোষায় না। মঠবাড়ির কাছারির ধানের বড় বড় রাশ দেখলেই যে-কোন দালালের মাপতে ইচ্ছে করবে। কলিমেরও সেদিকে লক্ষ্য আছে। নিধু শিকারিকে দিয়ে ইতিমধ্যে কাছারিতে কথা পাড়িয়েছে। অবশ্য আকারে-ইঙ্গিতে। কাছারির ধানের সুলুক-সন্ধানও সে কলিমকে এনে দিয়েছে।

মঠবাড়িতে মিত্তিরদের এই কাছারির নায়েব প্রভাংশু হালদার। এখানকার লোকেরা অতো কড়া উচ্চারণের ধার ধারে না। এরা বলে, 'পেরভাস নায়েব। পেরভাস নায়েব নায়েবই। নিধু মোড়লের কথায় নয়, নায়েব ইতিমধ্যে ধান বেচবার খবরা-খবর নিয়েছেন, কলিম যে ব্যাপারীর কোলে ঝোল টানছে না, সে খবর তার অজানা নেই। তাছাড়া নায়েবরা বড় ব্যাপারীই খোঁজে। ঝটপট যা বিক্রি করবার করে নিতে চায়। ঢিমেতালে বিক্রি করা মানে টাকা নিয়ে এদেশে বসে থাকা। অতো টাকা নিয়ে বসে থাকতে ওদের প্রাণের ভয়, তা যতই পাইক বরকন্দাজ থাকুক। দেশটা সুন্দরবন।

কলিম ব্যাপরীকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে,—খবরদার, কাছারিতে তুমি নিজে কোনও কথা পাড়বে না, যা বলব তাতেই সায় দেবে।

কলিম কাছারি এসেই এদেশের প্রথা মত হাত বাড়িয়ে নায়েবের আশীর্বাদ চাইল,—আ···শে, বাবু।

—কি সমাচার ? এসো কলিম।

ছোট একখানা চৌকি টেনে নিয়ে বসতে বসতে কলিম বলল,—আর বলেন কেন বাবু, 'গরু নেই তো বলদ দুয়ে দে !

—কেন, আমি বলদ হলাম নাকি ?

কলিম জিভে কামড় দেয়,—ছিঃ বাবু, তা বলতে যাব কেন ! ব্যাপারী বলে, তাকে বারো মণ, চোদ্দ মণ হিসেবে দিতে হবে। এ গের্দে এবার ধানই হলো দশ-মণি, তা আমি

'কোত্থেকে বারো মণের বুঝ দিই ?

নায়েব ব্যাপারীকে লোভ দেখাতে চায়, দামের পড়তাও তুলতে চায়,—না ব্যাপারী, আমার ক্ষেতের ধান এগারো-মণি হবে। বারো-মণিও হতে পারে। দেখতে চাও দেখে নাও।

কথার চালাচালি হয়ে যাবার পর কলিম ধানের রাশ ভাল করে দেখে নিল। সন্ধ্যার দিকে চুপিচুপি এসে বলল,—নায়েব মশায়, দরাদরি তো আপনার পছন্দ হয়েছে, এবার আমি বলি, দেরি করবেন না। দেবতার অবস্থা ভাল দেখছি না। পূর্ণিমাও সামনে। বৃষ্টি হলে সব একাকার হয়ে যাবে। যা গোলাজাত করবার তা কালকের মধ্যে শেষ করুন ; আর যা বেচবার আমি কালই বেচে দিই। আরও বলি কি, যে-রাশ বেশি রোদ খেয়েছে সেগুলিই গোলাজাত করুন, নয়ত গুমে যেতে পারে।

কলিম মিথ্যা বলেনি। ধুরন্ধর পেরভাসবাবু কলিমের মতলবও বুঝলেন। রোদ খাওয়া ধানে বারো মণের বুঝ দেওয়া দুরূহ। বারান্দা থেকে নেমে এসে আকাশের তুলো পেঁজা মেঘ দেখে দেখে বললেন,—তুমি ঠিক বলেছ ফকির ! আমারও তো খেয়াল ছিল না পূর্ণিমা সামনেই। তোমাদের দেশে তো চল্লিশ মাইলের মধ্যে একখানা খবরের কাগজ নেই। আমার কি খেয়াল থাকে।...দেখো, জমিদার বাবু কিন্তু ঠিক খেয়াল করেছে। কলকাতায় থাকে তো, আবহাওয়া অফিস থেকে ঠিক বিষ্টির খবর নিয়েছে। তাই চিঠির পর চিঠি দিয়ে টাকার তাগিদ। তোমরা যা ভাব তা নয়—শুধু ফুর্তির নেশায় টাকার তাগিদ নয়। হাজার হলেও গায়ে জমিদারি রক্ত তো !

পরদিন কলিম পালি হাতে ঠিকমত হাজির। পছন্দ করা রাশগুলিই ধরেছে। মেপে গেলে বারো মণ হিসেব আসবেই।

তিন বিশ মাপা হয়ে গেছে। গায়ে ঘাম দেখা দেবার মত। ধানের কুড়োতে কলিমের কালো ভ্রূ সাদা হয়ে উঠেছে। ঘোড়া ঘামলে তবে তার পূর্ণ বেগ আসে। কলিমেরও যেন তাই। তামাক খেতে উঠেছিল পিঁড়ি ছেড়ে। হুঁকোয় বড় এক টান দিয়ে কোমর থেকে গামছা খুলে মাথায় ফেটা বাঁধল। ফেটায় পেখম ঝুলে পড়ে কানের পাশ দিয়ে। কলিম এ এক নতুনরূপে বেপরোয়া। এই কাছারিতে এই ধানের রাশগুলির কাছেই সে না একদিন নূরুল গাজির তুরুং ঠোকা দেখেছিলো ! কলিম প্রতিশোধ নিতে চায় যেন। বাঘের মত চোখ গোলগোল করে তার বেটে গর্দান জোরে বেঁকিয়ে তাকাল ধানের রাশিগুলির দিকে। ইচ্ছে করেই সে চোখ ফেরাল না অন্য কোনও চোখের দিকে। পাছে তার চোখকে কেউ চিনতে পারে। রাশির মধ্যে পালি বসিয়ে দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে গুণতে লাগে— লাভে লাভ, লাভে লাভ ; লাভে দুই, লাভে দুই ; লাভে তিন, লাভে তিন......

তিন দিন ধরে ধান উঠল নৌকায়। নৌকা বোঝাই। ব্যাপারী মহাখুশি। চৌদ্দো মণ হিসেবে ধান উঠেছে এবার।

সাত

এবারের মত ব্যাপারী খুশি হলো বটে। কলিম ভাবে,—ধুত্, এ অপকম্ম আমার দ্বারা হবে না। পালি হাতে করলেই দুই ধান্দা। শ্যাম রাখি, না কুল রাখি। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

গাছি যেমন করে তার খেজুর গুড়ের ভাঁড়ে 'মুখ-মারে' তেমনি করে কলিম তার

অপকর্মের মুখ-মারবার জন্য উস্‌খুস্‌ করতে থাকে।

ব্যাপারীকে কি একটা বলি বলি করে বলে না। ভাব দেখে ব্যাপারী হাসতে হাসতে বলে,—ফকির, সেদিনও তুমি বেচারামের খলেনে কি একটা বলতে গিয়ে বলোনি। আজও যেন কি একটা বলতে চাও। বলোই না, কি বলবে!

—বলছিলাম কি বড় মেঞা, ধান তো ক্ষেপের মত বোঝাই হয়েছে। আরও অল্প কিছু দিয়ে দিই, মুখটা মেরে নাও।

—তা আর এমন কথা কি?

—কিন্তু একটা আবদার আছে। এ ধান তুমি কাটায় তুলতে পারবে না। যা দেব তাই নিতে হবে।

—ওঃ, তোমার বুঝি নিজের কিছু ধান আছে? তা বেশ। নিবু কলকের আগুনে ফু দিতে কলিম ব্যস্ত। বারবারই ফু দেয়। কথার পিঠে আর কথা বলে না। ব্যাপারী ধরে নেয় কিছু লোকসান দিতে হবে। তা এক বিশের উপর দিয়ে কতটুকুই বা লোকসান হবে! তবে কলিমের বলার ভঙ্গিতে একটু ঔৎসুক্য বাড়লো, এইমাত্র।

কলিম ব্যাপারীকে নিয়ে সোজা লায়লার বাড়ি হাজির,—কই গো মঠবাড়ির মেয়ে! ধান বের করো, ঘুঘু পাখি এসেছে। মেপে দিই।

চেনা গলা পেয়ে লায়লা ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো। এসেই উঠানে পালি হাতে কলিম আর হাতাকাটা ফতুয়া গায়ে নূর দাড়ি-ওয়ালা ব্যাপারীকে দেখে থমকে গেছে। ঢোক গিলে কলিমের দিকে বড় বড় করে তাকিয়ে বলে,—কই, আমি তোমাকে তো বেচার কথা বলিনি! কে তোমাকে বলল, আমি বেচতে চাই?—লায়লা প্রতিবাদ করে যায়। কলিমও নাছোড়বান্দা, লায়লার ধান বিক্রি করে দেওয়াটা তার যেন একটা মস্ত দায়। প্রতিবাদ করতে করতে একবার লায়লা বলে বসে,—আর তুমি পালি ধরলে তো রক্ষে নেই, আমাকে ফতুর করে তবে ছাড়বে!

কলিমের যেন এবার রোখ বেড়ে যায়। প্রায় জোর করেই ধান টেনে নিয়ে মাপতে লাগে। মাপা শেষ হতেই লায়লা অবশ্য খুশি মনে টাকাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কলিম যাবার সময় উঠানের মাচার দিকে তাকিয়ে বলল,—বাঃ, এবারও তো বেশ কদু হয়েছে!

বলেই দেখে, একটা কালো হাঁড়ি ঝুলছে মাচায়। আর কথা নেই মুখে। আড়ালে জিভ্‌ কেটে বড় বড় পায়ে বেরিয়ে গেল।

* * *

দালালগিরি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রাম ফকিরের ডাক আসে। কলিম কত প্রতীক্ষাই না করেছে এর জন্য এতদিন!

আক্রাম একটু কড়া গোছের ফকির। বৃদ্ধও হয়েছে। সহসা ওকে কেউ আজকাল বাওয়ালি করে বাদায় ওঠে না। তাছাড়া ওর দস্তুরিও একটু বেশি। সাধারণ একজন বাওয়ালিকে খাইখোরাক ও জন-মজুরি দিলেই হয়। হাতে-নাতে তার কিছুই করতে হয় না। শুধু নৌকায় বসে থাকবে আর বাঘের বিপদ থেকে কাঠুরিয়াদের রক্ষা করবে। সর্তের বাইরে অবশ্য আরেকটা কাজ আছে, গল্প ও গান করা।

সুন্দরবনে দূর দূর জেলা থেকে শীতের মরশুমে গোলপাতা বা কাঠ কাটতে আসে সব। বড় নৌকা নিয়েই আসে তারা। এক এক নৌকায় ছয় থেকে দশজন লোক, আর মাস

দেড়েকের খোরাকি। খোরাকি বলতে চাল ও মিষ্টি জল, আর কিছু মশলাপাতি। খালে ও নদীতে অজস্র মাছ; কাজেই আহারের অন্য কোন উপকরণই বাহুল্য। জাল ফেললে মাছের ওজনে টেনে তোলাই দায়।

নানা জায়গা থেকে নৌকাগুলি এককভাবে এলেও, পাশ নেবার জন্য বাদার মুখে বন-কর অফিসগুলিতে প্রথমে একে একে তারা জমা হয়। সেখান থেকে এরা দল বেঁধে,—বলতে গেলে নৌকার বহর বানিয়ে বনের গভীরে কাঠ কাটবার ঘেরগুলিতে এসে উপস্থিত হয়। ঘেরের এক এক জায়গায় দেখা যাবে—দশ বিশ খানা নৌকা পরপর নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। রোদ উঠতেই সবাই দল বেঁধে বাদায় ওঠে, আবার বেলা থাকতেই নৌকায় ফিরে আসে। তখন আর কিছু কাজ নেই। কয়েকজন মাত্র রান্না বাড়িতে ব্যস্ত, বাকি সবাই মাতে গানে ও গল্প-গুজবে। এই সময় বাওয়ালি ফকিরদের কাছে গান ও গল্প শুনতে সবাই যেন আকুল হয়ে থাকে। মন্ত্রের বলে ফকিরের দল বাঘকে কতটা মোহগ্রস্ত করতে পারে তা পরের কথা, গল্প-গুজবে কাঠুরিয়াদের কতটা মোহগ্রস্ত করা যায় তারই ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে হয় ফকিরদের এ-সময়ে।

আক্রাম এবার বড় এক বহরের বাওয়ালি। তাদের সঙ্গে এক সর্তও করে নিয়েছে,—এক শিষ্যকে সঙ্গে নিতে দিতে হবে।

বাড়ি থেকে রওনা হবার সময় ফকির-বিবি আক্রামকে একবার স্মরণ করে দিতে ভোলেনি,—দেখো যেন, কলিমকে কোনও বড় বিপদে ফেলো না।

ইছামতী নদী দক্ষিণে এগিয়ে কদমতলী নাম নিয়েছে। আরও ভাঁটিতে আড়াইবাঁকীর দোনে পেরিয়ে আবার মালঞ্চ নাম নিয়েছে। এই মালঞ্চের পশ্চিম তীরে সুন্দরবনের ১৭৪ নম্বর লাট। একটু পশ্চিমে গেলেই যমুনা, তারপরই রায়মঙ্গল নদী। মালঞ্চ থেকে রায়মঙ্গল অবধি বাঘের মস্ত আড্ডা।

১৭৪ নম্বর লাটের একটি পাশ-খাল। বেশ খানিকটা চওড়া খালটা এখানে পূব-পশ্চিম। চাঁদনী রাত। শীতের মোলায়েম চাঁদের আলোয় গোটা খালটি আলোকিত। স্পষ্ট দেখা যায়, সার বেঁধে দশ-বারোখানি নৌকা চাপান দেওয়া রয়েছে। ঠিক চাপান দেওয়া নয়, মঝখানে নোঙর করা। কোন নৌকায় কুপির-আলো দেখা যায়, কোনটায় দেখা যায় না। কেউ গল্প করে, কেউ বা গান ধরেছে, কেউ বা কাউকে বিনা কাজে নাম ধরে ডাকছে। তবু ষাট-সত্তর জনের সোরগোল এই বনকে মুখরা করতে পারে না। হিংস্র নিঝুম নিস্তব্ধ সুন্দরবনকে অতো সহসা আলোড়িত করা যায় না।

বাওয়ালি আক্রামের নৌকায় ভীড় একটু বেশি। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর ছোট ছোট ডিঙি করে অনেকেই অন্য নৌকা থেকে এখানে হাজির। বড় নৌকায় বেশ কিছু কাঠ ইতিমধ্যে বোঝাই সারা। উপর-খোপের সামনে সে বোঝাই কাঠ যেন ফরাসের মত। তারই উপর গোটো হয়ে সব বসেছে। আক্রাম ও কলিম একপাশে। নৌকার গায়ে বাঁধা ছোট ছোট ডিঙিগুলি স্রোতের টানে এক একবার মিলিত হতে চায়, আবার পরমুহূর্তে একে অন্যের ডালির আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মিলন ও বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ ও মিলন। এমন নিঝুম বনে ওদের এই মিলন ও বিচ্ছেদের মর্মবাণী আত্মগোপন থাকে না। ডাইনে ও বাঁয়ে নিবিড় বন। চাঁদের আলোর পক্ষে এই বনকে আলোকিত করা বুঝি দুঃসাধ্য। নাতিদীর্ঘ ঘন অন্ধকার বন দুপাশে প্রাচীরের মত অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আক্রাম গল্প জমিয়েছে। 'বড় রাজার' গল্প। যতে রাজা। 'যশোহর নগর ধামের'

সন্নিকটে নূরনগরের যতীন রায় রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর। ঠিক প্রতাপাদিত্যের নয় ; বসন্ত রায়ের বংশধর। সুন্দরবনের সামান্য জমিদার, তবু বংশগৌরবের জন্যই এত নাম-ডাক। এক সময়ে তিনি জাপান গিয়ে যুদ্ধ বিদ্যা শিখে এসেছিলেন। কি জানি তাঁর কি মতলব ছিল! প্রতাপাদিত্যের দেশ, তিতু মেঞার দেশ—বাঙলার এ অঞ্চলের মাটির আঁশই আলাদা। প্রথম মহাযুদ্ধের আমল। বঙ্গের বিদ্রোহী দলের নেতা তখন যতীন মুখার্জি। জার্মানী থেকে অস্ত্র আসবে। বঙ্গোপসাগরে দুর্গম বনের পথেই এই অস্ত্র আসবে। যতীন মুখার্জি গেলেন বালেশ্বর। আরেকদল এলো রায়মঙ্গলের মোহানায়। এই সূত্রে যতীন রাজার সঙ্গে যোগাযোগ। দুর্গম সুন্দরবনের খাল-পাশখাল, দনে-শিষের নিখুঁত খবর কে দেবে! কে দেবে দুর্ভেদ্য গহন বনের অভ্যন্তরে কোথায় কোন ভাঙা-বাড়ির আস্তানা আছে তার সন্ধান! তাই যতে রাজা আক্রামকে ডেকে নিয়েছিলেন। তারই গল্প সত্য-মিথ্যায়, রাঙিয়ে-রসিয়ে আক্রাম আজ জমিয়েছে।

আক্রাম বলে চলে,—বড় রাজা তো একদিন ডেকে বলল, ফকির জন কয়েক ছেলে-ছোক্‌রা যাবে রায়মঙ্গলের মোহানায়। হাজার হোক বন বাদাড় তো, ফকির না হলে চলে কি করে! তুমি এদের সঙ্গে যাও। দেখো যেন এদের কোন বিপদ আপদ না হয়। আর যদি কোন সাহায্য এরা চায়, তা দেবে। আমার কয়েকজন বরকন্দাজও থাকবে এদের সঙ্গে। তোমার কোন ভয় বিপদ নেই। যদি কোনও বিপদ হয় তো আমিই আছি।

তা বড় রাজা তো! তার কথা ফেলি কি করে! গেলাম। ছেলে-পুলের দল, তারা কি কথা শুনতে চায়! সাথে তদের বন্দুকও দু-একটা ছিল। বললাম—বাদায় ওরকম করো না ; বড়মেঞাকে নিয়ে ছেলেমানুষি করতে নেই।

সন্ধ্যে হলে ওরা সমুদ্দুরের চরে যেত, আর দুই লম্বা লগি পুঁতে, দড়ি টাঙিয়ে আলো ঝুলিয়ে দিত। আলোগুলি মালার মত ঝুলে থাকত। ওরা বলতো, ঐ আলো দেখে কোন জাহাজ নাকি আসবে আর ওদের হাজার হাজার বন্দুক দিয়ে যাবে।

আর সারা সকালে ওদের দল বন্দুক নিয়ে বড়-মেঞা খুঁজে বেড়াবে। যতই বলি ওরকম করো না, ততই যেন ওদের গোঁ চেপে যায়।

দিন ছ-সাত পর একদিন সারা সকাল ঘুরে এসে ডিঙিতে উঠেছে। তিনখানা পঞ্চাশ মণি ডিঙি ছিল। দু'খানা নোঙর করা আর একখানা তাদের সঙ্গে বাঁধা। বেশি সাবধানী হয়ে ওরা সেখানাকে ডাঙার এক গুড়িতে কাছি দিয়েছে।

পড়ন্ত বেলা। সবাই ছইয়ের মধ্যে ঘুমে অচৈতন্য। আমারও চোখ বুঁজে এসেছে। এমন সময় ডিঙিতে টান পড়তে চোখ মেলেছি। দেখি—বড়-মেঞা দুই থাবা দিয়ে কাছি ধরে টানছে। চিৎকার করে সামনে এগিয়ে তাড়াতাড়ি কাছি খুলে দিই। সামনে ছিল হিস্‌নে। সেটাই হাতে করে ডালিতে দাঁড়িয়ে রুখতে থাকি। ওরা তো সব উঠে পড়ে হৈ-হল্লা করতে থাকে। বন্দুক খোঁজে মারবাব জন্য। আমার পাশে যে, সে তো বন্দুক তাক করেছে। বললাম, খবরদার! হাত দিয়ে বন্দুকের নল চেপে ধরে তবে থামাই। বলো, বন্দুক ঠেকাব, না বড়-মেঞাকে ঠেকাব? তাই কি শোনে পোলাপানের দল। হাঁকাহাঁকি করতে বড়-মেঞা একটু নরম-পানা। সরে ঝোপের আড়ালে গেছে। আর যাবে কোথায়! কোন বাধা মানে না। তিন বন্দুক থেকে দমাদম গুলি করল ঝোপ তাক্ করে। ভ্যাগ্যিস্, তখন বড়-মেঞাব রোখ্ নামিয়েছি। বনবিবির দোয়ায় একবার শুধু হাঁক দিয়ে সরে পড়ল।

গল্প শেষ হতেই আক্রাম একটু থেমে কলিমকে বলল,—বুঝলি, রোখের মাথায় রোখ্ করতে নেই। তুই তো বিয়ে থা করিসনি, বুঝবি কি! এই যেমন রায়বাঘিনী! রায়বাঘিনীকে

কি করে পোষ মানাতে হয় জানিস্?

ফকিরের গল্পে সবাই সশঙ্ক হয়ে উঠেছিল। রায়বাঘিনীর কথা বলতেই সবাই হেসে উঠলো। খানিকটা বেশি করেই হাসলো, মনের ভয়কে দূর করবার জন্য।

কলিম কিন্তু জাহাজ ও বন্দুকের কথাই ভাবছিল। গল্প থেমে যায় দেখে বলে,—ফকির, তারপর কি হলো?

—কি আর হবে! ছেলে-ছোকরার দল তো বড়-মেঞার পেছনে লাগার জন্য ব্যস্ত। ডাঙ্গায় উঠে দল বেঁধে ওর পেছনে লাগবে। ঠেকাতেই পারি না দেখে বললাম, বেশ যেতে পারো কিন্তু যে-কাজে তোমরা এসেছ, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। যদি ভণ্ডুল না করতে চাও তো এ বাদা ছেড়ে পাশের বাদায় চলো। তবেই তো তারা এ বাদা ছাড়লো। কিন্তু ছাড়লে কি হবে, আরও ছ-সাত দিন কেটে গেল। সে জাহাজও এলো না, সে বন্দুকও এলো না। তারপর ভালোয় ভালোয় ওদের বড় রাজার কাছে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ঘরের ছেলে ঘরে দিয়ে তবে আমার সোয়াস্তি।

আট

১৭৪ নম্বর এবার বুঝি বা নিরামিষ যাবে। এক পূর্ণিমা ছেড়ে আরেক পূর্ণিমা এলো বলে। জোয়ার-ভাটার দেশে পূর্ণিমা অমাবস্যার হিসাব রাখাই সহজ।

দিন আসে, যায়। নৌকাও বোঝাই হয়ে এসেছে। সবে বেলা গড়িয়েছে। গুরু-শিষ্য নৌকায়। সহসা কলিম দাঁড়িয়ে পড়ে বলে,—শুনছ ফকির, কি একটা যেন হুল্লোড়!

ফকিরও কান খাড়া করে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে আছে। হঠাৎ বলে,—কলিম, ওদের ডাক্।

—ওদের ডাকবার কি আছে!

—আছে বলেই তো বলছি।

দ্বিতীয় কথাটি না বলে কলিম সবাইকে ডেকে আনে। সকলে প্রায় ছুটেই এলো। ফকির বললো,—তোরা নিশ্চিন্তে কাজ করে যা। ভয় নেই, আমি আসছি। নিশ্চয় কেউ বিপদে পড়েছে। শুনতে পাস্ নি!

কয়েকজনে প্রায় এক সঙ্গেই বলল:

—তা কি পালি হয়?

—তোমার যেতে হবে কেন?

—আমরা একলা পড়ে থাকবো নাকি?

আক্রাম গর্জে ওঠে,—না, তা হয় না, বাউলের ওপর বিবির কড়া আদেশ। বনে কেউ বিপদে পড়লে, রক্ষে করতে যেতেই হবে। যেতেই হবে।

ফকিরের দাড়ির দৃঢ় ঝাঁকানির সামনে ওজর করতে কারও সাহসে কুলোয় না। ফল এই হলো, সেদিন কেউ আর কাজে যায় না। সোজা যে যার নৌকায়।

ছোট ঘুঘু ডিঙি করে ফকির ও কলিম চলেছে। শব্দ লক্ষ্য করে চলেছে। একটু এগিয়ে ফকির নির্দেশ দেয়,—মরদ! ভাটো থেকে সাড়া আসছে, সামনের বাঁ-হাতি খাল ধর্।

—মনে লয়, বেশ দূরন্তর।

—তা হোক, যেতে হবে। ফকির হবার শখ, বিপদে আপদে কাজে আসবি না, তা হয় না।

—না, তা বলছি না। বিপদ তো নাও হতে পারে! নিজেরাই হয়ত খাবলা-খাবলি

করছে।

—ধুত্, তাই হয় নাকি ! বয়সে শুনিনি কোন দিন, নিজেরা কেউ ঝগড়াঝাটি করেছে বাদায় এসে। বাদায় যে যার সব ঝগড়া ভুলে যায়। ভুলতেই হবে।

কলিম চুপ করে যায়। দূরের শব্দ ক্রমেই কাছে আসছে। আক্রাম গলুইতে সামনে মুখ করে বোঠে টেনে চলেছে। একবার বোঠেখানা কোলের ওপর রেখে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল,—কলিম, মন্ত্রটা মনে আছে তো ? পড়ে নে একবার।

—এতো আগে ?

—নে, পড়ে নে।

মন্ত্রের ব্যাপারে গুরুর আদেশ। কলিম কয়েকবার মন্ত্র আউড়ে নিল। নিল বটে, কিন্তু মনে খটকা লাগে। এ কেমন মন্তর ! যার নামে মন্তর, তার খোঁজ নেই—আগেই পড়া

মুহূর্তের মধ্যে সোরগোল বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভীতি বিহ্বল মানুষের আর্তনাদ আক্রাম বেশ উৎসাহিত,—দ্যাখ্ তাহলে তোর দীক্ষা বোধ হয় এ গোনে পুরো। এবার কিন্তু শোনার চেয়ে দেখা। দেখেই শিখতে হবে বেশি।

কাছেই এসে গেছে। সামনে খালের বাঁক কাছিমের পিঠের মত।

গলুই আরেকটু ঘুরতেই কলিম ভ্রূ কুঁচকে চোখ পিট্‌পিট্ করে হাসতে আরম্ভ করেছে

—কি-রে ! হাসছিস্ কেন রে ?

—দ্যাখো, দ্যাখো, রগড় দেখছ না গুরু !

কলিমের হাসিতে আক্রামেরও হাসি এসে যায়। চেপে হাসি বন্ধ করে আক্রাম এক তাড় লাগায়,—পাগলামি করবি না ! হাসবি না !!

কলিম এমনিতে শব্দ করে হাসে না। কিন্তু হাসবার সময় ফোডন কাটবে আর হাসবে তাই কথার শব্দে হাসির সুর জড়িয়ে থাকে।

—দ্যাখো না ফকির ! দ্যা-খো, কেমন বাদুড়-ঝোলা ! তোদের বাদায় আসতে বলে কে রে !

একদল লোক, বিশ-ত্রিশ হবে। সবাই মিলে এক বানের 'ছিটে' উঠবার হুড়োহুড়ি নিতান্ত চারা বান গাছ। ভারে ডালপালা মাটি পর্যন্ত নেমে আসছে, তবু তাতেই উঠবে সবাই। সবাই মিলে ত্রাসে কথা বলছে। দল-ছাড়া কেউই হতে চায় ন। একজন উপর থেকে পড়ে গেল। তাতে কি হবে, আবার সেই গাছেই উঠবার চেষ্টা।

কাছে এসেই কলিম যেন আর ফকিরের অপেক্ষা করতে চায় না। চিৎকার করে ওঠে,—হু-হু-হু-ই ! হু-হু-হু-ই !

চিৎকারেও কলিমের ব্যঙ্গ সুব। মতলব ছিল ওদের লজ্জা দেবে। কাজও হলো। সাড় পেয়েই ওরা চুপ। কিন্তু ডিঙি মাটিতে লাগাতেই আর এক বিপদ। সবাই মিলে এক সাথে কথা বলতে চায়। ফকির ধমক দিয়ে উঠলো। ধমক দিতে দিতে চর পেরিয়ে গাছের গোড়ায় এলো। সামনের বুড়োকে প্রশ্ন করতেই সে তো ভেউ-ভেউ করে কেঁদে অস্থির তারই ভাইকে নিয়ে গেছে সবার চোখের সামনে।

শান্ত করার ফাঁকে ফাঁকে আক্রাম ঘটনা জানবার চেষ্টা করে। কলিমের কিন্তু অসোয়াস্তি লাগে ওদের গাছে ওঠার কাণ্ড দেখে। প্রায় জোর করে গাছ থেকে সবাইকে টেনে নামাল যেন সে-ই এবার বাউলে বনে গেছে ! বাউলের সুরেই কথা বলে,—মানুষ নিয়েছে তো কি হয়েছে ! একটার বেশি দুটো আজ নেবে না। না, তা নেয় না, কোনও দিনও নেয় না। নামো গাছ থেকে।

ধমকের মতই কথাগুলি। তবু কলিম হাসতে হাসতেই বলে। ভয়ঙ্কর বনে ও এমন বিপদের মধ্যেও অমন হাসি দেখে লজ্জা ওরা পাক আর না পাক, ওদের সম্বিৎ খানিকটা যেন ফিরে এলো।

এটা ওটা কথা হচ্ছে। সহসা আক্রাম প্রশ্ন করে, বেশ জোরেই করে,—কি চাস্ তোরা, বল্! বাড়ি ফিরে যাবি, না লাস আনতে চাস্, বল্?

কে উত্তর দেবে! উত্তর দেবার মত কারও অবস্থা নেই। একে আক্রামের চিৎকার, তার উপর 'লাসের' কথা!

আক্রাম নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়,—চল্ তবে, লাস নিয়ে আসি।

এই অবস্থায় বনের বিপদের কথা একটু বাড়িয়ে বললেই যেকোন দলকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা অতি সহজ। কিন্তু পরে এর জন্য আসে যেমন অনুশোচনা, তেমনি অপবাদও। পথ না পেয়ে তখন সকলেই দোষে বাওয়ালিকে। সুন্দরবনের বাওয়ালি এ দোষের ভাগী হতে চায় না। তাছাড়া, কলিম তার সঙ্গে। আক্রাম এ যাত্রা বাঘের মুখোমুখি হতেই ব্যগ্র। বলল,—জানি, তোরা সকলে সঙ্গে যেতে চা'বি। তা হয় না। জনা দশেক মাত্র! বাকি সব নৌকায় থাক্।

আক্রাম কলিমকে একটু কাছে টেনে আস্তে আস্তে বলে,—চাউনি দেখে দেখে জনা দশেক বেছে নে এবার।

ইঙ্গিতে বুঝে নিয়ে কলিম বাছাই করতে লেগে যায়। বাছাই করতে গিয়ে সে কিন্তু চোখের দিকে বিশেষ নজর দেয় না। ঠোঁটের হাসিই তার লক্ষ্য। তা ফুক্কুড়িতে কে কেমন হাসে, তাই দেখে দেখে বাছাই করে। কলিমের কাণ্ড দেখে ফকিরের কি জানি কেন, সেই সেদিনের বিবির শেষ কথাটা একবার মনে পড়লো।

অন্যেরা নৌকায় উঠলে জনা দশেক সঙ্গে নিয়ে ফকির ও কলিম বনের ভিতর এগিয়ে চলল। খোঁচ দেখে দেখে। আক্রাম একবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করল,—খবরদার! কেউ দৌড়ে ভাগ্‌বি না। ভেগেছিস্ কি মরেছিস্। আস্তে আস্তে ঠিক আমাদের পিঠ্ পিঠ্ আসবি। বললে তবে চিৎকার করবি। ভীষণ চিৎকার! কোন ভয় নেই। পালাবার চেষ্টা করলে বড় মেঞা তারই ঘাড় মাট্‌কাবে। খবরদার!

কলিমের দিকে চোখ পড়তেই ফকির অবাক,—করেছিস কি? বড় মেঞার সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাচ্ছিস্, না মল্লযুদ্ধ করতে যাচ্ছিস্! ওরকম সাঁটো কাপড় পরেছিস্ কেন?

কলিম এমন গোটো ও জোরে কাপড় পরেছে যে গোটা উরু দেখা যায়। খালি গা। বুকে বিশেষ লোম নেই। কাঁধের পেশী অস্বাভাবিক উঁচু। এদেশের লোকের অবশ্য কাঁধের পেশী এমনিতেই সবল থাকে; রাতদিন বোঠের খোঁচ তো এদের মারতেই হয়। তার উপর কলিমের ঘাড়কে গর্দান বলাই ভাল। মাথায় আবার গামছার পেখম ধরা ফেটা। দেখলেই সত্যি মনে হবে, কুস্তিগির হাতাহাতি করতে চলেছে।

আক্রামের কথায় কলিম লজ্জা পেল। মুখে অবশ্য বলল,—একবার বাদার দোয়ায় বন্দুক হারাতে হয়েছে। এবার তো আর কিছু নেই। কাপড়টা না হারাই! তাই!

কলিমের কথায় কান না দিয়ে ফকির দৃঢ়ভাবে বলল,—চল্। বলল বটে, কিন্তু নিজে পা বাড়ায় না। কেমন যেন অন্যমনস্ক। বনের চারিদিকে তাকায়। সামনেই বাঘের পদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়, বরাবর চলে গেছে।

সবাই চুপ। ফকির যেন নিরীক্ষণ করে। বাঁ থেকে ডান দিক পর্যন্ত সামনের গোটা

বনটাই নিরীক্ষণ করল। যেমন করে স্টীমারের সার্চ লাইট নদীর এ-কূল থেকে ও-কূল পর্যন্ত একে একে ঘোরায়।

এই নিরীক্ষণ করতে গিয়ে ফকিরের গলা যেন ভারি হয়ে উঠেছে। চাপা ভারি গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলল,—চুপ্! আমি যা করি, তাই করে যা শুধু।

কলিমকে এ-কথা বলা অনাবশ্যকই ছিল। ইতিমধ্যে সে ফকিরের সর্বভঙ্গি অনুসরণ যেমন করেছে, তেমনি অনুকরণও করতে শুরু করেছে।

বাঘের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। বেশ অনেকখানি পথ এসেছে। সামনে ফকির, পাশেই কলিম। বাকি সবাই ঘন হয়ে পিছু পিছু চলেছে। কিছুদূর এগিয়েই একটা মরা 'শিষে', ক্ষীণ স্রোতধারার বাহক। শীতকালে আরও মরা, শুকিয়ে গেছে। তারই দুই তীরে কেঁচকী বনের ঝাড়। ওপারের বনতল চোখের আড়ালে। ফকিরের গতি ধীর। নিঃশব্দ।

দলের মাঝ থেকে শিকার নিয়েছে। তাতে দলের মধ্যে সোরগোল চলতে থাকবে এ তো জানা কথা। এতে বাঘ অভ্যস্ত। তাতে ওর আহারের ব্যাঘাত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আহারের সন্নিকটে পদাচরণের কোনও সাড়া পেলে সচকিত হয়ে উঠবেই। তাই শিকারে না বেরুলেও ফকিরকে শিকারীর মত এগুতে হচ্ছে।

শিষের এপারের কেঁচকী ঝাড় অতি সন্তর্পণে পেরুবে। এপার-ওপার দুই ঘন ঝাড়ের মাঝে শিষের খাদে নিভৃতে আহার সমাপন করবে, এমন আশাই আক্রাম করেছিল। একবার ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে পিছনের সকলকে সতর্ক করে নিল। সতর্ক করলে কি হবে, অতোগুলি অনভ্যস্ত—শুধু অনভ্যস্ত নয়, ভীতিগ্রস্ত পদ সঞ্চারণে একটু আধটু শব্দ হচ্ছেই। তবুও ফকির নিজে সাবধানীর মত শূলোর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে উঁকি মেরে দেখে দেখে চলে।

বাঘ একবার টের পেলে লাস ফেলে রেখে পাশের কোন ঝাড় বা ঘন গুড়ির ফাঁকে এমন গা ঢাকা দেবে যে এতগুলি জোড়া চোখে তার ছায়াও ধরা পড়বে না। সারা সুন্দরবনে গাছের শিকড় থেকে ছোট বড় আধ-হাত বর্শার ফলকের মত শক্ত শক্ত শূলো বেরিয়ে আছে। এক গজের মধ্যেই দশ-বারোটি শূলো। কোথাও বা তারও বেশি। এই শূলোর ফাঁকেই বাঘ আড়াল নেবার ক্ষমতা রাখে। তা না হলে হয়ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পক্ষে সুন্দরবনের মত ফাঁকা বনে জীবিকার সংগ্রামে বংশরক্ষা করা সম্ভব হতো না। জীবন-যুদ্ধের প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়ত বা সুন্দরবনের বাঘের পিঠের দুপাশে সোজা সোজা কালো রেখা দেখা দিয়েছে। শিকার প্রতীক্ষায় যখন গোটা শরীরটা শূলোর মাঝে দাবিয়ে দেয়, তখন এই ঋজু কালো রেখা ও শূলো একাকার হয়ে যায়। ভীতিবিহ্বল শিকার অথবা সন্ধানী শিকারীর পক্ষে তখন এই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সহসা নজরে আনা দুষ্কর।

কাছাকাছি এসে খাদের গভীরতা দেখে তো ফকির হতাশ। গাছগাছড়াশূন্য এমন নিভৃত আশ্রয় অলসভরে আহার সমাপন করার মত স্থান বটে। কিন্তু যেখানে বসে সম্ভাব্য শত্রুকে দূর থেকে লক্ষ্যে রাখা যায়, তেমন স্থানে বাঘ কখনও আশ্রয় নেয় না। তা যতই না কেন নিরাপদ হোক। আক্রামের নজরে আসে, বাঘের স্পষ্ট পদচিহ্ন সোজা খাদ পার হয়ে গেছে। ওপারেও ঘন কেঁচকী ঝাড়। সে আর অনুসরণ করতে চায় না। দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওপারে কেঁচকী ঝাড়ের ঠিক পাশেই যদি বসে থাকে! সন্দেহ হতেই আক্রাম আকার ইঙ্গিতে দলকে পিছু হটালো। ডাইনে অনেকখানি ঘুরে তবে খাদ পার হল। ওপারে কেঁচকী ঝাড়ও সবাই একে একে পেরিয়েছে। এবার সবাই বাঁ-দিকে এগিয়ে আবার খোঁচ ধরবে।

ধরতে হয় না। ফাঁকা বনে ফকির যেন হঠাৎ উন্মত্তের মত ক্ষেপে চিৎকার করে

ওঠে,—ঐ যে শালা ! খবরদার !!

দেখতে পাক, না পাক, কলিমও চিৎকার করে উঠলো,—খবরদার ! খবরদার !

নিঝুম বনে আচমকা আওয়াজে পেছনে ক'জনের চৈতন্য হারাবার অবস্থা । আক্রামের আড়ালে সবাই জড় হতে চায় । কেউ কেউ চিৎকার করতে চাইলে কি হবে—মুখ দিয়ে শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরুলো । ঘুমের ঘোরে ভয়ার্ত গোঙানির মত ।

আক্রাম অশ্লীল গালি দিয়ে ওঠে । মাথায় খুন চাপলে যেমন হয় তেমনি গালি ও রাগে সর্বদেহ তার কেঁপে কেঁপে ওঠে । গালির তোড়ে এক একবার দু'পা-ই যেন শূন্যে উঠছে ।

কলিমও তার ফেটার পেখমে ঝাঁকা মেরে মেরে চিৎকার করে । আক্রামের মত সেও অ্যাক্রোশ বাইতে সংক্রামিত । আশেপাশে কে কি করছে, সে খেয়াল নেই । একবার খানিকটা এগিয়ে পড়েছিলো । গালি ও চিৎকারের মাঝেই ফকির তাকে হাতে ধরে টেনে নিজের পাশেই দাঁড় করিয়ে দিল । ফকির চিৎকার করে বটে, কিন্তু একটুও এগোয় না । পেছনের লোকের একমাত্র লক্ষ্য ও আশঙ্কা—আক্রাম যেন ওদের ফেলে এদিক ওদিক কোন দিকেও না চলে যায় !

সাড়া পেতেই বাঘ মাথা উঁচু করেছিল । সঙ্গে সঙ্গেই আক্রামের চিৎকার ; তা না হলে যে রক্ষা নেই ! সে যে লক্ষ্যে এসেছে, সে কথা বুঝতে না দিলে এই হিংস্র জীব তখনই লুকিয়ে অনুসরণকারীকে অগ্রসর হবার জন্য প্রলুব্ধ করতে ছাড়ে না । আর একবার লুকোবার সুযোগ দিলে রক্ষা নেই ।

বাঘ ঘাড় উঁচু করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে । এতদূর থেকেও সে দৃষ্টির তীক্ষ্নতা ধরা পড়ে । এই তীক্ষ্নতা কোন এক বিন্দুতে নিবদ্ধ থাকলেও, সামনের অর্ধবৃত্তাকারের মধ্যে যা কিছু আছে তার গতিবিধি এই দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে । কোন একক বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকলেও একই সময়ে বাঘ সামনেব সবটাই দেখে । পাশের অন্যকিছুকে লক্ষ্য করবার জন্য তাকে মাথা ঘোরাতে বা চোখের মণি ঘোরাতে হয় না । তাই বাঘের দৃষ্টি স্থির ও অপলক । দৃষ্টির প্রখরতা আর এই স্থিরতাই সম্মুখের যে-কোন জীবকে নিথর ও নিশ্চল করে দেবেই দেবে । ফকির এই অবশকারী চাহনিকেই উপেক্ষা করতে চায় ।

কলিমের প্রথমে উন্মাদনা আসে । ফকির এগিয়ে গেলে কলিমের পক্ষে এই উন্মাদনায় বেপরোয়া হয়ে এগিয়ে যাওয়া অসাধ্য ছিল না । এগিয়েও যেতে চাইছিল । ফকির কিন্তু দেরো মিনিট ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে । এই দীর্ঘ অপেক্ষা কলিমের উন্মাদনা স্তিমিত করে আনে । মনে খটকা লাগার বুঝি অবকাশও আসে । বাঘের মতলব কি ? ফকিরেরই বা মতলব কি ? এমনি দাঁড়িয়ে থাকা কি ঠিক ? না, পিছিয়ে যাওয়াই রীতি ? ফকির চিৎকার থামাতে চায় না, বাকি সবাই সমভাবে ঠায় চিৎকার করে চলেছে । কলিমও থামতে চায়নি, থামবার উপায়ও ছিল না ।

তবুও কলিমের দেহ ও মনে যেন ভীতির ও শিথিলতার আভাষ আসে । আক্রামের চোখ নড়ায় না । ব্যাঘ্রকে স্তব্ধ করতে অভ্যস্ত আক্রামের চক্ষুও বুঝি এই হিংস্র জন্তুর আচরণ অনুকরণে সিদ্ধ । দৃষ্টি ফেরাবার পথ নেই । তবুও সে চোখে বাঘের মত আশপাশের সব কিছুকেই লক্ষ্যে রাখতে হচ্ছে । আক্রাম বেপরোয়া ভাবে হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—এইবার ! এইবার !!

বাঘ এবার সামনের দুই থাবার উপর ভর দিয়ে উঠেছে । গর্জে উঠল ভীষণ ভাবে । এতক্ষণ ছিল চাপা গোঙানি । গালি ও চিৎকারকে তা বিশেষ ছাপিয়ে ওঠেনি । এবার বন কম্পিত গুরু গর্জন । সবাই সন্ত্রস্ত । দেবে না ওদের ত্রস্ত হতে ফকির ।

হুকুম দিল,—চল্, এগিয়ে চল্।

ফকির পাঁচ-ছয় কদম এগিয়ে গেল। ফকিরকে কাছ-ছাড়া করা এ সময়ে কারও পক্ষে সম্ভব না। ত্রাসে ও নেশায় সবাই সঙ্গে সঙ্গে ফকিরের কাছে এগিয়ে এল। গর্জন দুই তরফে সমানে চলেছে।

কয়েক লহমা কাটতে না কাটতে আবার একই ভাবে এগিয়ে যায় পাঁচ-ছয় কদম। তারপর আবার পাঁচ-ছয় কদম। কিন্তু আর না। ফকির আর এগুতে চায় না। যেন খুঁটি নিল। বাঘ গোঙাতে গোঙাতে লাসটার দিকে একবার তাকিয়ে এ-দিক ও-দিক ঘাড় ঘুরিয়ে বীরদর্পে চাহনি দেয়। গালাগালির মুখেই ফকিরের ভর্ৎসনা,—খবরদার! এগুবি না। খাড়া থাক্। —শুধু বলা না, হাত বাড়িয়ে যেন কলিমকে আগলে রাখলো।

বাঘ ধীরে ধীরে পাক খেলো ঐ ছোট্ট চত্বরের মাঝেই। ফকির ও বাঘের ব্যবহারে কলিম সচকিত। আচম্‌কা কিছু ঘটবার আশঙ্কায় চোখ ভ্রূ পর্যন্ত বিস্ফারিত। কি জানি, এবার কি হবে! আরেক পাক খাবার পর বাঘের ভীষণতম এক 'গাক্' করা আওয়াজ। বিলম্বিত হুঙ্কার নয়, ছোট অথচ তার তীব্রতার সীমা নেই। দলের সকলে যেন তাদের দেহে ও মনে এক তীব্র ঝাঁকানি খেল।......সঙ্গে সঙ্গে আক্রামের শাসানি,—খবরদার! এগুবি তো মরবি! খবরদার!

বাঘ পাশ ফিরে পাশের ঝোপের দিকে কদম নিয়েছে। হ্যাঁ, কদমই। ধীরে ধীরে অলসভাবে চলার কদম। ফকির নিজের ভয়ঙ্কর হুঙ্কার থামালো বটে, কিন্তু অপর সকলকে চিৎকার থামাতে বারণ করে। ওদের গালি ও চিৎকারের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না তাল-বেতালের চিৎকার, সব কিছু মিলে একটা হট্টগোলের আওয়াজ।

বাঘ ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল। কলিম হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস নিল। যেন ধাতস্থ হয়েছে। অপরাধীর মত বলল,—গুরু! মন্ত্র পড়ব?

—ধুত্! চিৎকার থামাস্ না! গালি দিতে পারিস্ না! —দম নিয়ে ধমক দিয়ে আবার বলে উঠল,—চল্, এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্।

লাসের কাছে সবাই চুপ। অমন সদ্য আধ-খাওয়া লাস দেখলে শত অভয় চিৎকারের মধ্যেও কার না বুক শুকিয়ে ওঠে। ওস্তাদ ফকির খামোকাই যেন একবার বাঘের গতি-পথের দিকে মুখ করে তড়পায়,—শালা. এগুবি তো শেষ করব!

তড়িৎ আঘাতে যেন সকলের শিরদাঁড়া আবার খাড়া হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষার তাগিদে বুঝি চিৎকারে গালি দিয়ে উঠলো। কলিম কিন্তু এবার হল্লায় যোগ দেয়নি। ফকিরের কাণ্ড দেখতেই ব্যস্ত। মুখে ভ্রূ কোঁচকান মুচকি হাসি। বৃদ্ধ আক্রাম এদিকে ক্লান্ত। বিশেষ গালি দিতে পারে না। শুধু হুমকিই দিচ্ছে।

ফকির ইঙ্গিত করতেই কলিম লাসটি গামছায় ঝুলিয়ে কাঁধে নিল। লাসের বিশে অবশিষ্ট ছিল না। কোনমতে নিয়ে চলে। ফকির অন্য সকলকে নিয়ে বাঘের গতি-পথে দিকে মুখ করে পেছনে পা ফেলে দক্ষিণ দিকে আরেক পাশ-খালে এলো। এখন আ অবিরাম নয়, মাঝে মাঝে হাঁক দেয় মাত্র।

নির্দেশমত সবাই মিলে গোলপাতার উপর লাস রেখে জলে ভাসিয়ে রাখল। পাশ-খা খুব বেশি বড় নয়। কোমর জলে খুটি পুঁতে কোনমতে খালের মাঝামাঝি ভাসিয়ে রাখল এত অল্প জলে কামোট এলেও কুমির আসার সম্ভাবনা কম।

কলিমের পিঠ ও নিম্নাঙ্গ সবই রক্তাক্ত হয়ে গেছে। জলে ধুতে ধুতে বলল,—এ রক্তও ছিল চাষার গায়ে! আচ্ছা ফকির, তোমার কাণ্ড বুঝি না, কি হবে এই পর্‌সাদ নিয়ে

—থাম্ ! আবাদের মানুষকে বাদায় মাটি দেব কেন ! জয় পরাজয় আছে তো ! বাদায় এসে কোনদিনও পরাজয় মান্‌বি না কিন্তু। বুঝলি !

ঝট্‌পট কাজ শেষ করে ফকির ও কলিম বাকি সবাইকে নিয়ে নৌকায় চলল। ওরা এ াবৎ কোনও কথা বলেনি। কথা বলার অবস্থাও ছিল না। শুধু ফকির ও কলিমের কথায় ায় দিয়েছে আর চিৎকার করেছে। ফকির এবার ওদের কথা বলাবার চেষ্টা করছে। পচাপ না হয়ে যায় ! একে সবাই ক্লান্ত, তার উপর বনের নিস্তব্ধতা। বন যেন মানুষকে াপনা থেকেই মূক করে দেয়। সুন্দরবনে প্রাণ-প্রাচুর্যের অভাব নেই। যেদিকে তাকাও সংখ্য বৃক্ষরাজি। জীবনের প্রতীক সবুজ রঙের মেলা। বৃক্ষরাজির একে অন্যের সঙ্গে াল্লাপাল্লি। লতা ও গুল্মের জড়াজড়ি। নদী ও খালে গতিশীল জলরাশি। সর্বত্রই জীবনের পন্দন। কিন্তু নিঃশব্দ স্পন্দন। নির্জীবের নীরবতা আমাদের বাঙ্ময় হয়ে উঠবার আবেগ ানে, আর সুন্দরবনের সজীবের নীরবতা করে তোলে মানুষকে নির্বাক।

নিঃশব্দে যাওয়া ঠিক নয় ভেবে কলিম বললো,—আচ্ছা, তোমরা তো সবাই মেঞা াহেব ? না ? বলতো. আজ যে-মুখ দেখলে সে-মুখ সুন্দর, না বিবির মুখ সুন্দর ?

ঠাট্টা মস্করার সময় নয়, তবুও সবার মুখে হাসি দেখা দিল। কলিম অবশ্য তাদের বিবির খ ভাবতে বলে, নিজে কার মুখ ভাবলো তা কে জানে ! ভাবুক আর নাই ভাবুক, একটু থমে নিজেই উত্তর দেয়,—সময় বিশেষে দুই-ই সমান ! তাই না ?

বড় খালে এসে তাড়াতাড়ি সবাই মাটি ছেড়ে নৌকায় উঠল। পায়ের কাদা ধোয়ারও বকাশ নেয়নি। আশ্রয়ে এসে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নেবার জন্যই এতো ব্যগ্রতা।

ফকির বললো,—নে, আর কাদা ধুতে হবে না ! এক হাতেই কাজ সেরে আসা যাক্। ল্ ডিঙি নিয়ে সব।

বললে কি হবে, এবার অনেকেই পাশ কাটাতে চায়। তবে নতুনদের কেউ কেউ এই রামাঞ্চকর ঘটনার শরিক হতে ইচ্ছুক। বড় বিপদ তো কেটে গেছে ! তাদেরই ক'জনকে য়ে গুরু-শিষ্য আবার চললো।

সামনের গলুইতে কলিম। মাঝ-গুরোতে ফকির। ফকিরের আগে-পিছু জনা পাঁচ-ছয়। ডিঙি করে যাবে আর চট করে লাস নিয়ে আসবে। বিপদ যা ছিল তা তো কেটেই গেছে। ীভাবে যাবে. বা কি কি করতে হবে তা নিয়ে ফকির মাথা ঘামাবার আবশ্যক বিশেষ বোধ রেনি। একবার শুধু কলিমকে বলল,—মরদ ! সামনে বস্‌লি ! তা বোস্, সামনে বসেই শু ডিঙির হাল ঠিক রাখবি।

ছোট পাশ-খাল। সুন্দরবনে ছোট খালও দু [illegible] কি ঘুরতেই লাস চোখে পড়বে। লাসের যে করুণ ও বীভৎস বর্ণনা শুনেছে সেই ছবি ঙ্গীদের চোখের সামনে। দেখতে চায়, কিন্তু দেখবাব অপেক্ষায় তারা জড়সড় !

সে জড়সড়ভাবে কোথায় উবে গেল কলিমের বীভৎসতম হাঁকে। লাস আছে কই,—বাঘ এক থাবার ভরে বুক-জলে দাঁড়িয়ে আরেক থাবায় গোলপাতা টেনে আনবার ষ্টা করছে। ডাঙায় পেছনের দু'পা। দীর্ঘ লেজটি অস্বাভাবিক ভাবে উঁচু হয়ে আছে। কই ভাবে থাবা ও পা রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল। চোর ধরা পড়লে যেমন ভাবে কায়। না, তা ঠিক নয়। বনের সে একচ্ছত্রপতি। সে-দৃষ্টি সর্বজীবকে থম্‌কে দেয়। াজা কাছে আসবার সাহস করলে রক্ষা নেই।

কলিমও সাহস করেনি। ডিঙি থামিয়ে দিয়েছে। গলুইতে বোটের আঘাতে আর বীভৎস ৎকারে এবার কলিম একাই রুখে দাঁড়িয়েছে। দেখাদেখি কেউ কেউ জলের উপর বোটের

বাড়ি মেরে সোরগোল তুলতে চায়। ফকির কিন্তু এ যাত্রা চুপচাপ। কলিমের উদ্দেশে একবার শুধু বলল,—সাবাস্ মরদ!

পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ এতো সহসা পাবে তা ফকিরও ভাবেনি।

কলিমের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। শুধু একটা অঘটন কলি লক্ষ্যে আনতে পারেনি। সঙ্গীদের একজন সুন্দরবনের 'শ্রীমূর্তি' দেখেই বজ্রাহতের মত কা হয়ে খালের জলে পড়বার মত হয়েছিল। ফকির তক্ষুনি বোটের গুঁতো মেরে তাকে ডিঙি খোলে ফেলে দেয়।

বেপরোয়া, কিন্তু বল্গাহীন বেপরোয়া নয়—এই মূল মন্ত্রেই ফকিরের অনুকরণে কলি লাস ফিরিয়ে আনে।

★ ★ ★ ★

১৭৪ নম্বরে আর বেশি দিন ওদের থাকতে হয়নি। ব্যাঘ্রের মত শক্তিশালী জীবকে ব আনার মাঝে এক মাদকতা আছে। যে মাদকতার পথে শক্তিমত্তার সর্বনাশ আসতে পারে। ফকির তারই আশঙ্কায় চিন্তামগ্ন। উঠতে বসতে, কথাবার্তায়, ঠাট্টা-রসিকতায় ফকি যেন কলিমের কাছ থেকে তারই ইঙ্গিত পেয়েছিল। মুখে কিছু বলেনি। তবে সেদিন বাদ ছেড়ে আসবার পথে বনের শেষ সীমানায় কলিমকে হাতে ধরে নিয়ে সহসা ডাঙ্গায় উঠল আঙুলে করে বনের পলিমাটি খানিকটা তুলে নিজের কপালে ও কলিমের কপালে লেপটে লাগিয়ে দিল। তারপর বনের দিকে মুখ করে মুদিত নয়নে মাথা নিচু করে রইল। কলিম অনুগতের মত অনুকরণ করে।

মাথা উঁচু করে ফকির হঠাৎ বেশ জোরে প্রশ্ন করে,—কি ভাব্‌লি? কার কথা ভাব্‌লি?

—কেন! বনের কথা,......বনবিবির কথা!

—না, শুধু তা নয়! বনবিবির বাহনের নামেও মাথা নোয়া।

দুজনেই আবার চৈতের রৌদ্রস্নাত গাঢ় সবুজ স্নিগ্ধ বনের সামনে মাথা নোয়াল—যেম করে ভক্তের দল পশ্চিমের নীল মহাকাশের সামনে নেমাজে মগ্ন হয়ে ওঠে।

নয়

কাঠুরিয়াদের নৌকার বহর মঠবাড়ির ঘাটে চাপান দিতেই কলিম প্রায় জোর ক আক্রামকে টেনে নামাল। একবারটি গুরুকে বাড়িতে না নিয়ে ছাড়বে না। ঘাটের ডিঙিয়ে ভেড়িতে উঠে ফকির প্রশ্ন করে,—কই তোদের কাছারি বাড়ি? মিত্তিরদে কাছারি?

—কেন গুরু! বাদায় উঠে পেরথমেই বাঘের খোঁজ!

—কেন হবে না, বিপদ আপদকে তো পেরথমেই আমল দিতে হবে! না, তা ঠিক কি জানিস্! মনে পড়লো তোর তুরুং ঠোকার কথা।

—ওঃ! তুমি সে কথা আজও ভুললে না!

কথা আর এগোয় না। কলিম ও ফকিরকে দেখে আশেপাশে যে যেখানে ছিল, সব ছুটে এসেছে। ওদের দুজনের কপালে সুন্দরবনের লোনা পলিমাটির দাগ তখন শুকি স্পষ্ট সাদা হয়ে উঠেছে। অনেকের মনে অনেক প্রশ্নই ছিল। কপালের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বে

ব প্রশ্নই স্তব্ধ করে দিল তখনকার মত।

এক একটা মানুষ থাকে যারা কোন এক বাড়িতে উঠলে মনে হয়, তারা গোটা গাঁয়েরই তিথি। আক্রাম আজ তেমনি এক অভ্যাগত। সকলেই ত্রস্ত ব্যস্ত। সকলেই আদর যত্ন, কা-খাওয়ার তদারক করতে ব্যগ্র। আনাগোনার ফাঁকে ফাঁকে কত লোকে কতভাবে লিমকে সজাগ করে দিচ্ছে :

—কই কলিম, মাছের তেষ্টা দেখো!

—দুধের তেষ্টা কি করেছ কলিম?

—না হয় তো, দে তোর ক্ষেপলা জালটা, এক্ষুনি মাছ এনে দিচ্ছি।

ইতিমধ্যেই নিধু মোড়ল, আনন্দ গাজী, জয়নুদ্দিন, করিম ঢালি ও আরও কয়েকজনকে লিম সাবুদ জানিয়েছে।

আমিনা তো কল্‌কে ঢালতে আর সাজতেই হিম্‌সিম্‌ খেয়ে উঠেছে। নিরিবিলি মানুষ ফু। চোখে অন্ধকার দেখার মতো। কি দিয়ে কি করবে, তার হদিশ করে উঠতে পারে না। থচ একটা সুরাহা করতেই তো হবে। পথ না পেয়ে পাশের ঘরের পোলাকে পাঠিয়েছে খন-তখনুই লায়লাকে ডেকে আনতে। এমন ডাকে লায়লা সায় দেবে না, তা হতেই পারে। তার ওপর কলিমের বাড়ি, আর আক্রাম বাউলে নিজেই হাজির। লায়লা প্রায় ছুটেই লো কোমরে আঁচল জড়িয়ে।

কারও আদরঅভ্যর্থনা বা আদেশের অপেক্ষা না রেখে লায়লা কাজ নিয়ে মেতে গেছে। খা হলে কলিম একবার শুধু বলল,—যা-ক্‌, রক্ষে এসে গেছ!

—দায়ের ওপর দায়, না এসে উপায় আছে, বলো! কাজের চাপে লায়লার যেন আর ছু কথা বলার উপায় নেই, বলেও না।

পূব ভেড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগুলে কলিমের আঙিনা। প্রথমে পূব-পোতার কখানি দো-চালা ঘর। ভিতরে বাইরে দুদিকে বারান্দা। গোল পাতার ছাউনি। গত সনে তুন ছেয়েছে। পাতার মিষ্টি কাঁচা গন্ধ এখনও যেন নাকে আসে। যে মিষ্টি গন্ধে আবাদের নুষের মনের তলে গৃহের মমতা, আশ্রয়ের আশ্বাস, নির্ভয়ের নিশ্চিন্ততা জেগে ওঠে।

এই বাইরের ঘরের পাশে হোগলা বেড়ার আব্রু পেরিয়ে ভিতর আঙিনায় আসতে হয়। শ খোলামেলা উঠান, বাঁ দিকে ছোট্ট পুকুর বা খানা—সবটাই প্রায় কলমি লতায় ঢাকা। দেশে পুকুর বেশি গভীর করা সম্ভব নয়। পাঁচ ছয় হাত মাটি খুঁড়তেই জলে ভর্তি হয়ে বে। জল যাতে শুকিয়ে না যায় তারই জন্য এমন করে কলমি লতায় ঢাকা। হঠাৎ কেউ আঙিনায় প্রবেশ করলে দেখবে, একদল কালো সাদা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে জলে নেমে , কলমিলতার ডগাগুলি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

উঠানের ডানদিকে আরেকখানা দো-চালা। ডোয়া অস্বাভাবিক উঁচু, দাওয়াই প্রায় তিন হাত খট্‌খটে শুকনো। এই উঁচু ভিতের দেওয়ালে গর্ত করে মুরগী ও হাঁসের বাসা। চিম পোতায় একখানা কুঁড়ে ঘর। রান্নাঘর। তার অর্ধাংশ ঢেঁকি জুড়ে আছে। রান্নার শ ঘেরা থাকলেও ঢেঁকির অংশ খোলামেলা। সাধারণ ঢেঁকিঘর, তবু গাঁয়ের সবার মনে ছাপ আছে। শীতের এক ভোরে দেখা যায় অসংখ্য বাঘের পায়ের ছাপ ঢেঁকির শেপাশে। যে পদচিহ্নের কথা আজও সবার মনে পড়ে।

দক্ষিণ পোতায় খানা পেরিয়ে বেটে ও টানা গোয়াল ঘর। কলিমের ছেলেবেলায় এই য়াল ঘর থেকেই ধলিকে বাঘে নিয়ে যায়।

বাইরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে গাঁয়ের অনেককে নিয়ে ফকির জমিয়ে তুলেছে। চৈতের

রোদে নতুন মাটি দেওয়া ভেড়ি নোনা ফেটে চিক চিক করছে। তাকালে চোখ ঝলসে যায়
তবুও তার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে। দক্ষিণ-পূব কোণে ভেড়ির ও-পারে নদী পর্যন্ত কো
গাছ-গাছড়া বিশেষ নেই। ওপারে বনের পাতার ছাতা স্পষ্ট চোখের ওপর ভাসে। গা
সবুজ রেখা লোনায় ঝলসান দৃষ্টিকে যেন খানিকটা শান্ত করে।

করিম ঢালি এখন বুড়োর মধ্যে। চুলে বেশ পাক ধরেছে। বলল, ফকির, আমরা ভে
ভেবেছিলাম, বিয়ে থা দিয়ে কলিমকে এবার সংসারী বানাব। তুমি তো বানিয়ে বসলে
বাওয়ালি।

—তাতে কি হয়েছে। বাউলে হলে তো সংসারী হতে মানা নেই। তবে কি জানো!
বাউলে হতে তো একটু সময় লাগে, তাই যা। তা আর ক'দিন। চার সন তো কাবার, আ
ছ' বছর মাত্তব! কি রে কলিম! তাই না?

কলিম নির্বিকারের মত বলে—অতো হিসেব নিকেশ কিসে? যা দরকার, তা তো করে
হবে।

আনন্দ গাজী কলিমের সমবয়সী। খানিকটা ঈর্ষা নিয়ে বলে,—'বাউলে হতে' কেন
কলিম তো বাউলে হয়েই আছে। তুমি ফকির কতটা মন্তর দিয়েছ জানি না, সে তো এম
অসুখ-বিসুখ নেই, এমন কাজ অকাজ নেই......সর্বঘটে বাউলেগিরি করে বেড়ায়। ভাটো
মানুষই এমন...সব তাতেই বিশ্বাস!

আনন্দ গাজী শ্লেষ ও ব্যঙ্গ করতে চাইলো, ফল হলো উল্টো। ফকির কলিমের দি
তাকায়, কলিমও ফকিরের দিকে। চোখাচোখি। কলিমের ঠোঁটে আনন্দ গাজীর প্র
অবজ্ঞার হাসি, ফকিরের চোখে মমতার ধারা। ফকির আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নি
আনন্দ গাজীর উদ্দেশে বলে,—শোনো গাজীর পো,...মন্তর! মন্তরের কথা বলছ? ব
আর না বলি, তোমাকেও এখন ইচ্ছা করলে মন্তর বলে দিতে পারি। তাতে কি তুমি বাউ
হতে পারবে?

ফকিরের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাক্যহীন। একটু থেমে ফকির ব
যায়,—শোনো তবে একটা ঘটনা।...সত্যি ঘটনা, ইচ্ছা করলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার
১৭৯ নং লাট তো সবাই জানো। মালঞ্চ গাঙের মোহানা। পূবদিকে হরিখালি। তোম
বোধ হয় দেখেছ, এই গাঙের গায়ে এক পোড়োবাড়ি। জানি না, এখানে নাকি একক
নেমকের খাদাড়ি ছিল।...পনরো ষোলো বছর আগের ঘটনা। বৃদ্ধ এক সাধু। এক স
নাম ছিল গুরুচরণ দাস, ডাকতো সবাই সাধুবাবা বলে। বনে বনে তপস্যা করে বেড়াতো
এর আগে নাকি আশ্রয় ছিল তেরকাটির বাদায়। কত বছর যে এই বাদায় কাটিয়েছে তা
ঠিক্-ঠিকানা নেই। শেষবেশ হরিখালি বাদায় এই পোড়ো বাড়িতে আশ্রম পাতে। জা
তো, হরিখালির বাদাকে বাঘের সাঁই বলা যেতে পারে। এ বনেও তার অনেক
সাধন-ভজন চলে।......তার কি আর মন্তরের অভাব ছিল! না, তা ছিল না।...

—কিন্তু তার শেষ কীভাবে হলো, জানো?—প্রশ্ন করে বড় বড় চোখে এক নাগা
তাকিয়ে রইল আনন্দ গাজীর চোখের ওপর। সবাই স্তব্ধ।

চোখ নামিয়ে এবার কলিমের দিকে তাকিয়ে নিজেই ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—শেষ-
তাকে বাঘের পেটেই যেতে হয়েছিল।

* * *

দুপুর গড়িয়ে গেছে। ভিতর-বাড়ির বারান্দায় পাত পড়েছে। সবাই একসাথে খেতে বসবে। ফকিরের ইচ্ছা তাই। তবুও তার মাঝে ফকিরের আসন একপাশে ভিন্ন করে করা হয়েছে। সবাই বসেছে। কলিমকেও বসতে দেখে ফকির একটু অবাক তা হলে পরিবেশন করবে কে ?

ফকিরের সন্দেহ ভঞ্জন করে পরিবেশক হাজির। সাদা তবন পরনে। ডবল বেড় দিয়ে পরতে গিয়ে আঁচল চুলের গোছা ছুঁয়েছে মাত্র। তাতে কিন্তু 'চলনে-ফেরনে' কোন জড়তা নেই। পরিস্ফুট যৌবনের আবরণেও এমন জড়তাহীনতা বৃদ্ধ ফকিরকেই যেন জড়সড় করে তুলল। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। বাকি কারও মুখে বা কথাবার্তায় কোন সঙ্কোচের প্রতিফলন না দেখে, ফকিরেরও স্বাভাবিক হতে সময় লাগে না। খেতে খেতে প্রশ্ন করল,—এমন রান্না তো অনেকদিন খাইনি ! কে এই কলিম ? এ বাড়ির গিন্নি বুঝি !

গিন্নি উবু হয়ে পরিশেন করছিল। কলিম তার দিকে তাকিয়ে বলল,—না ফকির। এ বাড়ির গিন্নি হতে যাবে কেন। ও হলো বাদার গিন্নি !

—কি রকম !!

মুখরা লায়লা অনেকক্ষণই চুপ করে আছে। যার কাছে প্রত্যাশা থাকে, তার সামনে মুখরাও বুঝি অবলা হয়ে পড়ে। কিন্তু আর কতক্ষণ ! লায়লা পরিবেশনের হাতা হাতেই রেখে নিটোল বাহুর কনুই হাঁটুর ওপর ভর করে ধীরে ধীরে বলল,—বাদার গিন্নি কি ছাই হতে পেরেছি ! তার চেয়ে না হয় বলো, আবাদের গিন্নি !

বাদা-আবাদের বিতর্কে ফকিরের মজাই লাগে। আলোচনা দীর্ঘায়িত করবার ইচ্ছায় ফকির আবারও বিস্ময় প্রকাশ করে,—কি রকম !

আনন্দ গাজী সহসা ব্যগ্র হয়ে বক্রোক্তি করল,—বুঝলে না ফকির, বাদায় যেতে চায়, আর তা তোমার সঙ্গে।

ফকির আরও অবাক। প্রশ্ন করে, কেন, আমার সঙ্গে কেন ?

—উনি যে আবার এ চকের দাই-ডাক্তার। কি জানি মন্তর পড়ে বেড়ায় কিনা ! ওকাজ একবার ওর হাতে এলে আর রক্ষে নেই কিন্তু। কোনও বুড়-বুড়ীর কথা মানবে না, শুধু গরম জল আর গরম জল, আগুন আর আগুন করে বাড়ি মাৎ করে তোলে।

খই ফোটার মত আনন্দ গাজীর কথাকে উপেক্ষা করে ফকিরের পাতে বড় একটা গলদা চিংড়ীর মাথা ঢেলে দিয়ে লায়লা ধীরে ধীরে বলল,—হজ্ না করলে কেউ কি হাজি হতে পারে ! বন-বাদাড়ে বনবিবির দয়া না পেলে কোনও কাজ হাসিল হয় ! না হওয়া সম্ভব !!

কথা শুনে ফকির গলদার মাথার দিকে তাকাবে, না লায়লার মখের দিকে তাকাবে ! সামলে নিয়ে বলল,—তা বেশ ! তোমার আর অসুবিধে কি ? তোমার চকেই তো এই জোয়ান বাউলে রেখে যাচ্ছি। এমন বাউলে আর কোথাও পাবে না কিন্তু !

বেগতিক দেখে কলিম কথা না বলে পারে না,—ঠাগ্‌রোণ ! জানই তো, দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙে ডুবে মরা !

ফকির রাগের ভাণে বলে,—রাখ্, ডোবা-না-ডোবা ঠাকরুণ বুঝবে ! বলেই গলদার লাল টকটকে ঘিলু বুড়ো আঙুলে তুলে ধরে বলল,—কয়রা গাঙের চিংড়ীর সোয়াদই আলাদা ! তাই না !

তখনকার মতো কথার মোড় ঘুরে যায়। আনন্দ ও অপরিসীম তৃপ্তিতে উৎসব শেষ হলো।

* * *

বেলা পড়ে এসেছে, ফকির এবার যাবে। ভাটিতে যেতে হবে, আর দেরি করা ঠিক নয়। কলিম ঘর-বার অনেকবারই করল, কিন্তু লায়লার সঙ্গে দেখা হয় না। কখন যে কলিমের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তা কেউ জানে না। যাবার আগে লায়লার সঙ্গে দেখা হবার আশায় ফকিরও অনেক গড়িমশি করেছে। কিন্তু আর দেরি করলে যে মাঝ পথে বেগোনে পড়তে হবে। কলিমকে জিজ্ঞাসা করলে বললো,—ছেড়ে দাও ওর কথা, ফকির ! ওর কি কোনও তালের ঠিক আছে ! শিক্‌লি কাটা টিয়ে কারও পোষ মানে না। বুঝলে না, ফকির ! ওর আনাগোনার কোনও হিসেব নেই !

আশেপাশের সবাই ভেড়িতে হাজির। পুরো ভাটির টানে লগির মাথা তরতর করে কাঁপছে। যে যার লগি তুলতে উদ্যত। তুলতেই নৌকা চলবে সাঁ সাঁ করে।

এমন সময় লায়লা হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির। হাতে মাটির সানুক। তাতে ভর্তি পান আর সুপুরি। পান-সুপুরি আবাদে দুর্মূল্য বস্তু। তবু তার প্রতি বাদার মানুষের আসক্তির অন্ত নেই। হাটুকাদায় নেমে এসে সানুকখানা টিপ্ করে গলুইতে রেখে বলল,—ফকির, আম্মাকে দিও।

ম্লান হাসি হেসে ফকির বলল,—কেন ? আর কেউ বুঝি ভাগ বসাতে পারবে না !

বিদায় জানাতে অনেকে নেমে এসেছে চরের হাঁটু কাদায়। সবার আগে কলিম ও লায়লা। বাঁধন ছাড়া পেতেই নৌকা স্রোতের টানে পড়ল। চৈতে বাদার স্রোতের টান বড় দুরূহ, যেন সব কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। বৃদ্ধ ফকির তখনও গলুই-এর ওপর দাঁড়িয়ে। দাড়িগুলি হাওয়ায় দুলছে। প্রশান্ত দৃষ্টি চোখে মুখে। একবার শুধু বলল,—কলিম, এই চকের মানুষ কিন্তু তোমার জেম্মায় রইল !

দশ

এই জেম্মার পেছনে কিন্তু কোনও আনুষ্ঠানিক ভিত্তিও নেই, দায়-দায়িত্বও নেই। কে বাওয়ালি হবে, অন্যের প্রতি বাওয়ালিরই বা কি দায়িত্ব থাকবে—তা নিয়ে আবাদ অঞ্চলে কোনও সংহিতার নিধানও যেমন নেই, কোনও পীরের ফরমানও তেমনি নেই। তবু বাদা আবাদের কঠিন বাস্তব যুদ্ধে যে একবার বনওয়ালি বা বাওয়ালি বলে প্রতিষ্ঠিত হলো, তার এ দায় থেকে রেহাই নেই। বাওয়ালিরাও এ দায় থেকে মুক্ত হতে চায় না। চায় না বলেই তো সে বাওয়ালি।

কিন্তু এই 'জেম্মা' কথাটা কানে যেতেই আনন্দ গাজীর মনে খটকা লাগে। অজানিতে মনের গভীর কোণে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অঙ্কুরিত হয়। আবাদের মানুষ বনের আওতায় বটে, কিন্তু বন্যজীবন তো নয়। জীবিকার সন্ধানে এদের লাঙল ও জমিকে তো ভর করতে হয়েছে। আর লাঙল ও জমির ওপর একবার ভর করলে, কালের গতিতে তাকে জমিদারের জেম্মায় গিয়ে পড়তে হবে। হয়েছেও তাই।

তবুও এ অঞ্চলে জমিও যেমন সত্য, বনও তেমনি সত্য। জমি ও বন—এই দ্বন্দ্ব সমগ্র মানুষের মনে ও সামাজিক আচরণে আজও প্রতিফলিত হয়ে আছে। জমিকে কেন্দ্র করে জমিদার হয়ে উঠেছে 'মা-বাপ' আর বনের স্বীকৃতিতে বনওয়ালি আজও হয়ে আছে আপদে-বিপদে ভরসা ও বিশ্বাসের উৎস। এ যেন আবাদের মানুষের জেম্মার অধিকার ও

দায়িত্ব নিয়ে জমির মলিক ও বনবিবির দ্বন্দ্ব। লোক-সাহিত্যও তার সাক্ষ্য দেয়। বনবিবি ও দক্ষিণা রায়ের যুদ্ধ ও বিবাদের পেছনেও এক সময় এই অলঙ্ঘনীয় প্রতিযোগিতাই প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা অঙ্কুরিত হলেও, আনন্দ গাজী কিন্তু জমিদার নয়! তবে জমিদারের অঙ্গ। সমৃদ্ধ চাষী। ক্ষেতকর্ষণকারী কৃষকের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস যেমন তার রক্তে আছে, তেমনি আছে বা দেখা দিয়েছে প্রবঞ্চনায় সমৃদ্ধ হবার প্রবৃত্তি। প্রায় দেড়শ' বিঘার মালিক সে। এর অর্ধেক জমি নিজের জোত, বাকি অর্ধেক বর্গাভাগে। নিজেও যেমন গতরে খাটে, তেমনি অপরের গতরে ভাগ বসাবারও ফিকিরে থাকে। কিন্তু তাতেও বিশষ এসে যেত না। আনন্দ গাজীর বাপ্‌জান 'বুধো লাঠেল' এ চকে নিঃস্ব অবস্থায় আসে। এসেছিল মিত্রদের হাতিয়ার হয়ে। মালিকের শঠবৃত্তির অনুকরণেই বুধো লাঠেলের সংসারে এসেছে এই দেড়শ' বিঘার মালিকানা। তাই জমিদার না হয়েও জমিদারি প্রবঞ্চনার প্রতীক হয়ে উঠেছে আনন্দ গাজী।

ত্রিশ বছর আগের কথা। ষোলো সনের ঝড়েরও কয়েক বছর আগে কলকাতার মিত্ররা মঠবাড়ির মালিকানা আয়ত্তে আনে। ১৮৭৯ সালের বন-আইন তখন খুলনার এ অঞ্চলে পুরো চালু। এই আইনে বন থেকে আবাদই শ্রেয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যে কোনো ভাবে বনাঞ্চল থেকে রাজস্ব বাড়াতে হবে। কাজেই সুন্দরবনের উত্তরাঞ্চল উজাড় হতে থাকে। যে কেউ এসে বনের ৫০০০ হাজার বিঘার লাট চল্লিশ বছরের ইজারা নিয়ে আবাদ করতে পারতো। ছোটদের তো কথাই নই। ২০০ বিঘা পর্যন্ত ইজারা নিলে তো দু'বছর বিনা খাজনায় ভোগ করতে পারতো এবং পরে ত্রিশ বছর মেয়াদে ইজারা নেবার অধিকারী তো মোকরারি স্বত্বে।

মিত্ররা এই সময় জ্বালানি কাঠের ব্যবসা সূত্রে সুন্দরবনে আনাগোনা করে। টাকা হাতে আসতেই এমন সুযোগ ছাড়ার মানেই কিছু ছিল না। মিত্ররাও সুযোগ ছাড়েনি। মঠবাড়ির ই দশ হাজার বিঘার লাট ইজারা নিয়ে মাটি গেড়ে বসলো। পাঁচ ছয় হাত মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অমানুষিক মেহনত করে গাছের গুড়ি উজাড় করতে লোকের অভাব বিশেষ হয়নি। কৃষকের নিঃশ্বাসে মাটির গন্ধ একবার পেলে অসম্ভবকে সম্ভব করা কিছুই না। তারা ভেবেছিল তাদের রক্ত ঝরে যে জমিতে সোনার ফসল ফলবে, তার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে কেউ এগিয়ে আসবে না।

কিন্তু জন ও জমি হলেই জমিদার হওয়া যায় না। ব্যবস্থাপনাও চাই। কে করবে এই ব্যবস্থাপনা। ইংরেজ? লোনা দেশে বন-বাদাড়ে তার আয়োজন করতে তাদের খরচে পোষাবে না। আবশ্যকই বা কি ছিল তার। ফলে দেখা দিয়েছিলো ইজারাদারদের অবাধ আধিপত্য। এই আধিপত্যের সূত্রে অন্য ইজারাদারদের মত মিত্ররা সূত্রপাত করলো পাকরেদ ও লাঠিয়ালের দল।

এলো বুধো লাঠেল। লাঠিই ছিল তার সম্পদ। এক পুরুষের মধ্যে লাঠির সম্পদ রূপ নিল জমির সম্পদে। লাঠেল হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু লাঠির কেরামতি বিশেষ দেখাতে হয়নি। বাদাকে আবাদ বানাতে এসে অপরের পেছনে লাগা অপেক্ষা সকলের সমবেত প্রচেষ্টার আবশ্যকই বেশি। লোনা দেশের শতমূলী গুড়িকে উচ্ছেদ করতে হলে, আর বারো তেরো মাইল ব্যাপী মাটির প্রাচীর তুলতে হলে চকের সমস্ত মানুষের সামগ্রিক চেষ্টা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কাজেই প্রথম প্রথম এক পরিবারের মত বাস করতে হয়েছিল সবাইকে।

কাজ থাকলে কাজী, কাজ ফুরুলে পাজি,—যে সমাজে শোষণের স্বীকৃতি আছে সেখানে

হাজারো নীতিবাক্যের আড়াল দিলেও এই ঘটনা তো অবধারিত। কাজ হাসিল হয়েছে,—জমি উঠেছে, বাঁধও উঠেছে। অমানুষিক পরিশ্রম ও যত্নে লোনা মাটিও হেসে উঠেছে। কয়েক বছর গড়াতে না গড়াতে জেঁকে উঠল মিত্তিরদের কাছারিও। নায়েব, গোমস্তা, পাইক ও বরকন্দাজের আনাগোনায় কাছারি বাড়ি সরগরম। প্রবঞ্চনার পাট শুরু হলো। এলো বিভেদ নীতি, একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগিয়ে জমি বেহাতের কারসাজি। বুধো লাঠেল তো তৈরিই ছিল এর জন্য।

একপুরুষ পরে আনন্দ গাজীও কম কৃতিত্ব দেখায়নি এ কাজে।

কাছারি-বাড়ির বারান্দায় বসে গড়গড়া টানতে টানতে পেরভাস নায়েব হুকুমের সুরে বললেন,—আনন্দ ! পারবে না এ কাজ ?

—এমন কি কাজ আছে নায়েব মশায়, যাতে বুধো লাঠেলের বেটা লেজ গোটাবে : হাজার হলেও তো তারই রক্ত আমার গায়ে ! কিন্তু কি কাজ বলুন তো ?

—তুমি কিচ্ছু না ! কোনও খবর রাখো না।

চতুর আনন্দ গাজী আন্দাজেই ঢিল মারল,—নিশ্চয় মঙ্গলা পাটনির কথা বলছেন !

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! শালার বড় বাড় হয়েছে। বলে কিনা, ছাড়বে না ভিটে মাটি,—বলে কিনা, হয়ে যাক ফাটাফাটি। ছিলি তো বেশ, খাচ্ছিলি দাচ্ছিলি। লোভ হলো কিনা বড়লোক হবার। খোরাকির ধান বেচে এক বাতিল বাছারী ডোঙা কিনে দিলি তো শিব্‌সার গর্ভে !

নায়েবের সুরে সুর মিলিয়ে গাজীও বলতে শুরু করে,—যাবে কোথায় যাদু ! দেনার দায়ে এবার জেরবার ! দেড়াবাড়ির দেনায় পড়লে সরষে ফুল দেখিয়ে ছাড়বো না !

—শুধু কি তাই ? শালার ফন্দি দেখো। নিজের চাষের ধান রাতারাতি নিজে সরিয়ে বলে কিনা, চোর চুরি করেছে !

—যা বলেছেন ! আমি বলে দিতে পারি, কোন্ চকে ও ধান সরিয়েছে। দেনা শোধ দিতে গিয়ে ধান না হয় ঘরে না তুলতে পারতিস্, চক্রবৃদ্ধি সুদে আবার কি তোকে মিত্তিরদের কাছারি ধার দিতো না ! কি বলে তুই অন্য চকে চোরাই ধান চালান দিলি !

নায়েব এবার রাগের বা রাগ দেখাবার ভাণের চরমে। বললেন,—কিছুতেই এ সহ্য করব না ! ওনার চোরাই ধানের জন্য আমরা যাই কিনা অন্য মালিকের সঙ্গে বিবাদ করতে। হবে না, কিছুতেই হবে না।...লাঠেলের পো !—বলেই নায়েব অন্য দিকে তাকালেন।

—যে-আজ্ঞে !

—যে-আজ্ঞে নয়, আজিই ওকে ভিটে ছাড়া করতে হবে !!

—বেশ......দেখবেন, কেমন করে ঘুঘু চরাই !

* * *

মঠবাড়ির পশ্চিম ধারে মঙ্গলা পাটনির নীড়। নিতান্ত অগোছাল ও অপরিচ্ছন্ন মাথা গুঁজবার ঠাঁই। তবুও দূর থেকে দেখলে নীড়ই মনে হবে। শীর্ণ খরস্রোতা শাঁখবেড়ে পশ্চিমের সীমানা। শাঁখবেড়ের সীমানা ধরে এক সার কেওড়া গাছ সমরেখায় দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ ও ঝাঁকাল গাছগুলি। চকের আর কোন অঞ্চলে এমন দীর্ঘ গাছে ! সমন্বয় নেই বললেই হয়। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লে, সবুজ প্রাচীরের কোলে এই আঙিনাগুলিতে আলো ও ছায়া এক মায়াজাল সৃষ্টি করে। বনের মমতা যেন ঝরে পড়ে।

বেলা না গড়াতেই আনন্দ দলবল ও লাঠিসোটা নিয়ে মঙ্গলা পাটনির ভিটেয় হাজির।

আশেপাশের চাষীদের মন তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। ও চোর ! নিজের ধান নিজে চুরি করেছে। পড়াপড়শিরা কেমন করেই বা চোরের পক্ষে দাঁড়ায় ! যতটা সম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে নীরব দর্শক হয়ে রইল ওরা।

দণ্ডধারী আনন্দ আদেশ দিল,—বেরো শালা, সম্বল যা আছে, নিয়ে বেরো ! শীগ্‌গির বেরো !

সম্বল বা সম্পদ আছেই বা কি পাটনির ! ছেড়া কাঁথা ও মাদুর, সুন্দরী কাঠের লাল টকটকে একটা পেট্‌রা, আর কিছু মাটির হাড়িকুড়ি। পাটনি তাই গুছিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে পড়ে। আর তো কিছু তার সম্পদ নেই। তার সততার সম্পদ সে হারিয়েছে। নিজের ধান নিজে চুরি করেছে। চোর সে !

না, তার মস্ত বড় এক সম্পদ আছে। পাটনি বৌ-এর কোলেই সে সম্পদ। মাত্র অল্প ক'দিন হলো এই সম্পদ তার ভাগ্যে এসেছে। পাটনি বউ-এর কোলে কচি শিশু কেঁদে ওঠে। ঘরছাড়া হয়ে তপ্ত রৌদ্রের ঝলক গায়ে লাগতেই মায়ের বুকের উপর মুঠো করা হাতখানা কাঁপাতে কাঁপাতে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে। প্রতিবাদ জানায় বুঝি !

না, প্রতিবাদ জানাবার আরেকজনও ছিল। লায়লা। এই সেদিন সে এই শান্ত ঘরে সারারাত কাটিয়েছে নবজাতককে মায়ের হাতের স্পর্শে এই পৃথিবীতে প্রথম আহ্বান জানাতে, তার আনন্দ ও বেদনার প্রথম অংশীদার হতে। লায়লা প্রতিবাদ জানাল। বলল,—তোমরা বুঝি এর জন্ম ভিটেটাও কসুর করবে না !!

এর পর আর কেউ কিছু বলেনি। কিছু বললেও তা স্বগতমাত্র। লাঠি ও কুড়ুলের আঘাতে মঙ্গলা পাটনির শূন্য নীড় লুটিয়ে পড়ল। সবাই তাকিয়ে ছিল সেদিকে। হাড়িকুড়ি গুছিয়ে নিতে নিতে লায়লা বলে,—পাটনি, আজকের মতো আমাব ঘরেই থাকবে চলো।

এগার

পাটনিকে ভিটে ছাড়া করার পর অনেক দিন কেটে গেছে। পাটনি বা পাটনি বউ-এর খবর কেউ বিশেষ রাখে না। এ চকের সবই প্রায় উড়ে আসা লোক। পাটনিও উড়ে এসেছিল, উড়ে চলে গেছে। এ দেশে ডানা মেলতে সময় লাগে না। ছোট্ট একখানা ডিঙি হলেই হলো। অগণিত নদী নালা-পথে যে কোনও দিকে উবে যাওয়া যায়।

এই উবে যাবার প্রাক্কালে পটানি-সংসারের আনন্দ ও বেদনার কিছুটা ভাগী হয়েছিল লায়লা। এমন ভাগীদার সে অবশ্য এই চকের অনেক সংসারের সঙ্গে। তবুও এই বেদনাসিক্ত বিদায়ের ছাপ লায়লা সহসা মুছে ফেলতে পারেনি।

কাছারি বাড়ি যাবার পথে লায়লা একদিন আনন্দ গাজীর বার-বাড়ির দাওয়ায় এসে লেপ্‌টে বসে পড়ে। মেয়েরা অমন করে লেপ্‌টে বসলে বুঝতে হবে—একটা কিছু কাজ হাসিল করে নিয়ে যাবে বলেই অমন করে বসেছে।

যেখানে বসেছে সেখান থেকে ভিতর-বাড়ির খানিকটা নজরে পড়ে। দেখা যায়, আনন্দের বিবি কুড়ুল নিয়ে একটা গাছের মুড়ো খণ্ড করার চেষ্টা করছে ; পেরে উঠছে না। দেখতেই লায়লার কলিমের কথা মনে পড়ে। বিবিদের কাঠ চালা করতে দেখলেই কলিম যেন রেগে ওঠে ! ফুফুকেও দেয়নি সে এ কাজে কোন দিনও হাত দিতে।

আনন্দ গাজীর সঙ্গে সলাপরামর্শ করা নিয়ে লায়লার কোন আড়ষ্টতা থাকার কথা নয়। আঁতুড় ঘরের কাজে লায়লার আনাগোনা তো আছেই, তার ওপর মৃত্যুর আগে অবধি

সোয়ামী ছাদেক কাজে-অকাজে আনন্দের বন্ধুও ছিল। ইদানীং আবার ফাঁকেফুঁকে লায়লার সঙ্গে গল্প করার ব্যগ্রতাও আনন্দের দেখা দিয়েছে।

আজ অমন করে জাপটে বসতে দেখে বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়েই আনন্দ বলে,—কি গো! কি খবর বলো।

—কি আর বলবো বলো! সেদিন অমন করে পাটনিদের তাড়ালে কেন বলতো?

কথার ধরনেই আনন্দ যেন আন্দাজ করে, এ কথা বলার জন্য লায়লা আজ এমন করে আসেনি। তবুও সংলাপের আগ্রহে বলে,—পুরনো কাসন্দি ঘাটছো কেন? সে তো অনেক দিন হয়ে গেল! তাড়ালাম কি বলছো? ও তো নিজেই তাড়াবার পথ করে দিল।

—কেন, থাকলে কি হতো তোমাদের। তোমাদের তো কোনও লোকসানই হচ্ছিল না।
হচ্ছিল? ধান কেটে তো ক্ষেতের সব ধানই তুলছিলো কাছারিতে। ভাগের ভাগ তো কিছুই নিতে চায়নি সে। সবই তো রাজ-ভাগে দিয়ে দিতো।

—দিতো কি বলো! নিতাম আমরা। কিন্তু তারপর?

—তারপর আর কি ! কর্জ ধান দাও তো! তার তো চক্করবিদ্ধি সুদ। তাতে আবার বছর ঘুরলে দেড়া-বাড়ি। এক বিশ দিলে, ঘরে আসে দেড় বিশ। লোকসান কি ছিল তোমাদের?

—মেয়েলি বুদ্ধি তো! ওর বেশি আর কি বুঝবে!

লায়লাও মেয়েলি প্রতিবাদ করে ওঠে,—যাক্, আর বুঝতে চাই না!

—না চাইলে শুনবো কেন? আরে, রাশিতে তাকে পালি না দিতে দিয়ে গোটা ধানই না হয় নিলাম, তাই বলে তো জমি ফেলে রাখতে পারি না! শাবন মাস এলেই তো জমি পাট করতে হবে। খাইয়ে জিন্দা রাখতেই তো হবে। দফে দফে খোরাকি-ধান দিতে হয় না? না কি?

—তা না হয় দেড়া-বাড়ির সুদে একটু খয়রাতি করলে! মেরে তাড়াতে যাবার দরকার কি ছিল?

—আপত্তি ছিল না। কিন্তু কি জানো? অমন হতে থাকলে চাষ বাস হয়ে আসে বেগার। আর বেগার-চাষে ফলন কি হতে পারে বুঝতেই তো পারো! হবে কেন! মন তখন থাকে বাদার চোরাই কাঠ আর চোরাই মাছের দিকে। তাতে চাষ-আবাদে লাভের লাভ কি হয়, তা ধরেই নিতে পারো। ঐ বনই হয়েছে বিষ!

—মালেকের কাছে বিষ তো বটেই !! তাই অমন লোককে ভিটে-ছাড়া করাই লাভ !!

—লাভ নয় তো কি? জমির মাথায় তো ঐ এক টুক্‌রো ভিটে। ভিটে-ছাড়া না করলে সেখানে নতুন ভাগী আসবে কেন? এলেই বা তারা ঘর বাঁধবে কোথায়?

লাভ-বেলাভের বাকি কথাটা লায়লাও জানে, আনন্দও জানে। নতুন ভাগীদার পত্তন মানে নগদা সেলামী! এই নগদাসেলামীর ভাগীদার যে আনন্দ গাজীও, সে খবর লায়লার কানে নানা পথ ঘুরে এসেছে। আনন্দ তারাই আশঙ্কায় অন্য কথায় যেতে চায়,—বলি, মঠবাড়ির মেয়ে! তোমার বাউলের খবর কি?

কলিমের অনুকরণে এমন মিষ্টি ডাকে রোমাঞ্চিত হলেও 'তোমার বাউলে' কথায় লায়লা চমকে উঠল।

চমক্ ঢাকা দিতে লায়লা তাড়াতাড়ি বলল,—সেই কথাই তো বলতে এসেছিলাম। বলছিলাম কি, আমিও তো এখন দেড়া-বাড়ি সুদের ধকলে। পরপর দু'সন তো আল্লায় ধান দেয়নি। এমন করে তো হয় না। একটা কিছু হদিশ দেখতে তো হয়! নায়েবকে বলবো

কিনা, তাই ভাবছিলাম। বাউলে তো বাদ সাধে! বলে কিনা, ও মুখো হয়ো না।
—ও তো বলবেই। থাকে তো বাদায় পড়ে। আবাদের পেটের জ্বালা ও কি বুঝবে! না, তার ধার ধারে! কি কষ্টে নাই আমরা বাঁচিয়ে রাখছি চকের মানুষগুলোকে! মরলেও এদের সক্কলকে নিয়ে মরতে হবে, বাঁচলেও এদের সক্কলকে নিয়ে বাঁচতে হবে।

কথাগুলি আনন্দ এমন আবেগ নিয়ে বলে যে লায়লার মনেও তার ঝঙ্কার লাগে। পৌরুষোচিত আবেগে সব মেয়েই তো একটা আশ্রয়ের আশ্বাস অনুভব করে। লায়লাও বাদ যায় না। তবু লায়লা নিজেকে সংযত রেখে কোনও কিছু আর বিশেষ বলে না। দাওয়া থেকে উঠে তখন ঝাড়তে ঝাড়তে বলল,—যতো জ্বালা হয়েছে আমারই। আর যাই পারি, মাঠের লোনা কাদা-জলে গিয়ে তো লাঙল জুড়তে পারি না। পারলেও কি হবে, ... অমন কিল-বিলে জোঁকের কামড় কি করে তোমরা সও, তা তোমরাই জানো!......আছে তো মাত্র কয়েক রশি জমি। কিষেণ খরচ দিতেই ডোল কাবার। কোন্ পথে যাই বলো......

কথা বলতে বলতে লায়লা হুড়কো ঠেলে ভেড়িতে উঠবার উপক্রম দেখে আনন্দ দাওয়া থেকে উঠানে নেমে এসে বলল,—তা বেশ, এসো একদিন, কথা হবে।

★ ★ ★

যে কথা লায়লা আনন্দের কাছে পাড়তে এসেছিল, তা না বললেও, আকারে ইঙ্গিতে আভাষ দিয়ে গেল। এরপর আনন্দের কাছে আর সহসা ভিড়তে চায়নি। অভাবের তড়না দিন দিন বাড়লেও, দাঁত কামড়ে যেন পড়ে থাকতে চাইল লায়লা। অন্য কোন কারণে নয়; আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্রের সবগুলি লক্ষণই ছিল—ফসল এবার ঢেলে দেবে ধরিত্রী। অম্বুবাচীর বর্ষণ ধারাই এবার এই আশা প্রথম অঙ্কুরিত করে তোলে। চাষীর আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। অগ্রহায়ণের হিমে পুষ্ট ফসলে ভারাবনত হয়ে নুয়ে পড়ল ধানের শিষ।

কিন্তু বিপদ এলো এবার এই চকের জীবনে অন্য পথে।

মঠবাড়ির উত্তরে চৌকুনির আবাদে হাহাকার উঠেছে। যেন উজাড় হয়ে যাবে আবাদী মানুষ ঝাড়ে বংশে। বন ও আবাদের বিপদকে এরা জানে। তখন এরা লড়াই করে, এবং লড়াই করে এরা বাঁচে। আসুক প্লাবন, ধুয়ে মুছে নিয়ে যাক্। তবু লোনা পানিতে হাবুডুবু খেয়ে কেমন করে এরা যেন সে-সব বিপদ কাটিয়ে ওঠে।

কিন্তু এ যে করাল বিষ! ওলাওঠা। এ যাত্রা যেন নিস্তার নেই। কোথায়, কখন বা কীভাবে এর আগমন, তার অনুসরণ এদের অসাধ্য। আবাদী বেপরোয়া আচরণও এর কাছে নিস্তেজ। চৌকুনি আর কতদূর! গাঙ পার হলেই চৌকুনি। এদেশে সব কিছুই যেন হু হু করে ছোটে। বাতাস হু হু করে ছোটে; নদীও জো-ভাটার টানে সাঁ সাঁ করে ছোটে। ওলাওঠার বিষও যেন মঠবাড়িতে বাতাসের সঙ্গে ছুটে এসে জেঁকে ধরল। এ-পাড়ায় কবর খুঁড়বার, ও-পাড়ায় শ্মশান চিতা নিবুবার যেন অবকাশ নেই।

সন্ধ্যার এক প্রহর কেটে গেছে। এমনিতেই আবাদের মানুষ বলতে গেলে সাঁঝের আগেই শয্যা নেয়। মিছিমিছি টেমি জ্বালিয়ে বে-হিসেবী হতে চায় না। সন্ধ্যা হতে না হতে আবাদ যেন ঝিমিয়ে পড়ে। আবাদী অন্ধকারের রূপই আলাদা। অজস্র খরস্রোতার শুভ্র জলরাশি থেকে বিক্ষিপ্ত আলো আবাদের তমসাচ্ছন্ন অমাবস্যার অন্ধকারকেও রহস্যময়ী করে তোলে। ঝিমিয়ে পড়া সেই আবাদী সন্ধ্যা আজ যেন হয়ে উঠেছে মৃত্যুর করাল ছায়ায়

আরও থম্‌থমে। এমন অন্ধকারে চকের ঘেরে মানুষের ছায়া দেখলে, যে কেউ আঁতকে উঠবেই।

দাওয়ায় অর্ধশায়িত কলিম তেমনি এক ছায়া দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে হাঁক দিল—কে ?...কে ?

কোন জবাব নেই। ছায়া এগিয়ে আসে। কলিম গলা খাঁকার দিয়ে আবার হাঁক দেয়,—কে ?

তবু কোন জবাব নেই। তবে কি সেই নিশাচরী জেন ! যার তপ্ত নিঃশ্বাসে আবাদ আজ এমন ভাবে উজাড় হতে বসেছে।

বাঘের বাউলে অতো সহজে হার মানবে কেন ! কলিম উঠে এসে রুখে দাঁড়াল,—কে ?

—বাউলে ! অমন করো না, আমার ভয় লাগে। চলে এসো, তোমার আসতেই হবে !

কলিম থ' মেরে গেছে,—লায়লাবিবি ! ঠাগরোণ ! তুমি এই রাত্রে ?

আর কেউ হলে তার সামনে লায়লা কখনই কাঁদত না। অনেক আঘাত ও বেদনা তার চোখের জল শুকিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে ঘর ঘর কাজে-অকাজে নেমে পড়ে অনেকের চোখের জল মোছাতে গিয়ে, নিজের চোখের জলের কথা ভুলেই বসেছে। তবু কি জানি, এমন পরিবেশে কলিমের মুখোমুখি হতে সশব্দে কেঁদেই ফেলল।

কলিম অপ্রস্তুত। অন্য সময় হলে তামাশা করে আবহাওয়াকে হাল্‌কা কবতে কলিমের সময় লাগতো না। এ যেন ভিন্ন এক কলিম। কয়েক কদম এগিয়ে লায়লার বাহু স্পর্শ করে বেদনাসিক্ত ভারি গলায় বলল,—কেন ? কি হয়েছে বলো !

লায়লা নির্বাক। অন্ধকারে কলিমের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ ও ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণে চোখের ধারা রুদ্ধ হয়ে এসেছে। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলে,—জানো বাউলে, সর্বানুবিবি যায় যায় ! ভেদবমি ! আমি কি করে ঠেকাই বলো ! চলো তুমি।

মেয়েদের নামের হিসেব কলিম অতো রাখে না,—কার কথা তুমি বলছ ?

—সর্বানুবিবি, ও-পাড়ার ফট্‌কের মা। অমন ফুটফুটে কোলের বাচ্চাকে আমি কার কোলে তুলে দেব ! হবার সময় ছেলেটা কি কষ্টটাই দিয়েছিল আম্মাকে। আমি কার কাছে বাচ্চা ফেলে রাখব। চলো, সর্বানুবিবিকে বাঁচাতেই হবে তোমার !...চলো।

—তা, আমি কি করে বাঁচাব ?

—না, তুমি না মন্তর-পড়া বাউলে ! পারবে না ?

—সে মন্তর তো......

—না, না, তুমি চলো। তুমি গেলেই হবে। তুমি গেলে ওদের ত্রাস কেটে যাবে, ভরসা পাবে। চলো।

এমন আহ্বানে বাউলেদের পেছন-মুখো হবার অধিকার নেই। এ চকের জেম্মা যে কলিমের !

কিন্তু কলিম গিয়ে কি করবে ? জ্বর এলে বা ডরাই হলে ফু' দিয়ে ঝাড়বার কথা না হয় ভাবতে পারতো। এ যে ওলাওঠা ! 'ফু' দিয়ে কিছু করার নেই। লায়লা মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

আবাদের আলো-অন্ধকার। অমাবস্যার হাজার গাঢ় অন্ধকারেও চারিপাশে শুভ্র পলিমাটি-সিক্ত নদীর আলো ভেড়ির এপাশেও প্রতিফলিত হয়ে আসে। সাদা তবনের সঙ্কুচিত ছোট অঞ্চল লায়লার মাথা থেকে ঝরে পড়তে সদ্য অশ্রুস্নাত চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করে উঠল কলিমের চোখে চোখে।

একটু চুপ করে থেকে কলিম হঠাৎ লায়লার পিঠে হাত দিয়ে প্রায় জোর করে তার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বলল,—আচ্ছা চলো।

ভেড়ির পথে দু'চার কদম এগিয়ে আসার পর লায়লা বলল,—কিন্তু ফুফুকে কিছু বলে গেলে, না ? খুঁজে মরবে যে !

—বাউলেদের আবার বলাবলি, বাউলেদের কেউই খোঁজ করে না,···এক বিপদ আপদ ছাড়া !

কলিমের কথায় মনের গভীরে এক অভিমানের সুর যে ঝঙ্কৃত হয়নি, তা বলা যায় না। যে অভিমানের সুরে ও আবেগে নারীর স্পর্শকাতর হৃদয় আবিষ্ট হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু লায়লা আজ এক ভিন্ন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে আছে। সর্বানুবিবির জীবন-মরণ-সংগ্রামে মগ্ন সে। তাহলেও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে পাথর ফেললে, বিক্ষিপ্ত পাথরের ঢেউ দেখা দেয় না বটে, কিন্তু পাথরের ওজন ঠিকই নদীবক্ষ ধারণ করে। একটু চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে লায়লা বলল,—চলো বাউলে, জোরে হেঁটে চলো।

জোরে হেঁটে যাবার বিশেষ কিছু ছিল ন। একটু এগুতেই সার্বানুবিবির কাতর ধ্বনি শোনা যায়। লায়লা শিশুটিকে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখে গিয়েছিল ফকিরকে ডাকতে। কচি শিশুব অবহেলিত হবার অভিমান-ক্রন্দন মায়ের সে কাতর ধ্বনিকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

বাউলে ফকির. বাউলে ফকির এসে গেছে !—চিৎকার করে লায়লা যেন ভরসার আশা জাগিয়ে তোলে। কলিম ইতিমধ্যে মাথায় গামছার ফেটা বেঁধে ফেলেছে। লড়াইয়ের মুখোমুখি। কিছুতেই সে দমবার পাত্র নয়।

সর্বানুবিবির কাতর ধ্বনি যেন চাবিয়ে চাবিয়ে উচ্চারিত হয়,—জ-ল ! জ-ল ! জ-ল !

এলাহি বক্সকে দাব্‌ড়ি দিয়ে উঠল কলিম,—দে না বিবির মুখে জল। দে জল। বদনা করে জল রাখতে পারিস্‌নি !

সঙ্গে সঙ্গে লায়লাকেও ধমক,—দেখছিস্‌ কি দাঁড়িয়ে। ধর ছেলেটাকে, যা আগুন নিয়ে আয়। যা শীগ্‌গীর !

অচমকা তুই-তুকারির দাব্‌ড়িতে সবাই যেন কাঠের পুতুল বনে গেল। মৃতপ্রায় রোগিণীও বুঝি উঠে বসে।

উঠানে দাউ দাউ আগুন। কলিম তারই পাশে ঘুরতে থাকে। শ্লীল অশ্লীল গালাগালি। হঠাৎ বিকট চিৎকার—খবরদার !! খবরদার !!—চিৎকার করতে করতে ভেড়ি মুখো চললো। বিকট চিৎকারের প্রতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হয় সারা মঠবাড়ির চকের উপর দিয়ে। একবার চিৎকার করে পূব দিকে মুখ করে। একবার পশ্চিম দিকে। পরমুহূর্তে দক্ষিণ ও উত্তর দিকে।

ফিরে আসে উঠানে। গুরুগম্ভীর আওয়াজ,—ভয় নেই ! ভয় নেই !—ক্রমশ চড়িয়ে দেয় আওয়াজ,—ভয় নেই ! ভয় নেই ! খবরদার !

হাঁফিয়ে উঠেছে কলিম। তবুও মাথার ফেটায় ঝাঁকি মেরে এপাশ ওপাশ করছে।

আবার সেই চিৎকার। এমন চিৎকার যে আশেপাশের গুঁড়া গাছের ঝাড়ে শিয়ালও আর ডাক দিতে সাহস পায় না। কত প্রহর কেটে গেল তাও বুঝবার উপায় নেই। চিৎকারে উত্তর ও দক্ষিণ ঘেরের কেউ কেউ এসেও পড়েছে।

প্রহর দুই কেটে যেতে কলিম একবার লায়লাকে লক্ষ্য করে বলল—কেমন দেখছিস্‌ ?

লায়লা আর দেখবে কি ! সহসা বলে বসে,—একটু নরমপানা।

—এমন পরিবেশে অন্য কিছু বলার বোধহয় উপায়ও থাকে না।

রোগিণী মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে, হাত-পা ভেঙে আনছে। কলিম এবার যেন ক্ষেপে উঠে লায়লাকে বলল—মজা দেখছিস্! মজা দেখছিস্! দে শীগ্‌গীর, শুকনো কাপড়ে আগুনের সেক্ দে। এই আগুনের সেক্ দে।

তারপর আবার কলিমের চিৎকার। একবার আওয়াজ নামিয়ে বলল—দে হারামজাদী, সেক্ দিয়ে যা। ভয় নেই! আমি এক্ষুণি আসছি। দেরি হলেও ভাবিস্ না। বাগে পেয়েছি···আর কোনও ভয় নেই!

খবরদার! খবরদার! বলতে বলতে কলিম প্রায় ছুটে এলো নদীর খোল ভেড়িতে। ডিঙির বাঁধন খুলে নদীর জোয়ারের টানে পড়ল। মাঝ গাঙে বোটে ধরে ভাঙা গলায় আপনমনে বিড়বিড় করে,—শালা···এ কি বাঘ তাড়ানো !! ডর দেখালেই হয়ে গেলো! হয় না।······বাঁচাও সর্বানুবিবিকে!······কি করে আমি বাঁচাই? বাঘের মন্তর নিয়েছি তো আমি ওলাওঠারও হাকিম !!

সাঁ সাঁ করে ডিঙি চলে। হাঁফ নিতে গিয়ে বাঁকের মুখে বোটের খোঁচ আবার থামিয়েছে। মুচকি হেসে উঠলো কলিম,—সর্বানুবিবি!······সাবি!·····ঢঙ্ করে নাম রাখা হয়েছে সর্বানুবিবি। মনে পড়ে, সাবির সঙ্গে ওর সাদির কথা হয়েছিল বা'জান থাকতেই। পড়শী বাধা তো আর সাদি হলো না।······না! সাদির কথা ভাববে না, সে যে মন্তর-পড়া ফিরে-কবা বাউলে!······যেমন করে হোক সাবিকে—থুড়ি—সর্বানুবিবিকে বাঁচাতে হবে।······বাঁচাও, চলো,—বলেই ক্ষিপ্র বেগে বোটের খোঁচ মারল।

কয়রা গাঙের ডাল-ভাঙা বাঁক পেরিয়ে কুশোডাঙায় আবাদ। এই চকে এক ঘর বেঁধেছে ফ্যাঁসফেঁসে ঠাকুর। কুঁড়ে ঘর। তাই বলে অবজ্ঞা করলে চলবে না। এই কুঁড়ে ঘরে আস্তানা করে বছর বছর খলেনে ধান ওঠে দেড় হাজার মণ। একশো পঁচিশ বিঘার প্রজা।

নোনামাটির মিঠে ধানের টান। যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশালের ভদ্দরলোকেরা সেই টানে পড়ে উড়ে এসে কেউ বাজা হয়, কেউ বা উজাড় হয়। মধুমতীর পুব পারে ফরিদপুর জেলার অধিবাসী—ফণিভূষণ বাড়ুজ্যে। 'ফণিভূষণ' বাদায় এসে ফ্যাঁসফ্যাঁসে হয়নি। গলার স্বর নেই, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কথা বলে, তাই। শুধু ঠাকুর নয়, বদ্যি ঠাকুর। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করে—তাতেও আয় কম নয়। এদেশে কুঁড়ে ঘরে অঘ্রাণ থেকে মাঘ অবধি কাটাতে হয়। সে সময় ডাক্তারিতে যেমন দিন খরচ উঠে আসে, তেমনি প্রতিপত্তি প্রসারের ফিকিরও মেলে!

—ঠাকুর মশায়! ঠাকুর মশায়!—কলিম ডিঙি ছেড়ে ভেড়ির উপর এসে গেছে। অতো জোরে ডাকবার প্রয়োজন ছিল না। কুশোডাঙ্গা ডাঙ্গো-জমি। ইতিমধ্যে খলেনে ধান উঠতে শুরু করেছে। ঠাকুর মশায় সারা রাত প্রায় সজাগ হয়েই থাকেন।

চাদর জড়িয়ে খড়ম পায়ে ঝাপনা সরিয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে ঠাকুর উঠানে হাজির। বৃত্তান্ত শুনে মাথা নিচু করলেন। খলেন ফেলে রাত্রে তার পক্ষে কি যাওয়া সম্ভব! ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললেন,—তা কলিম তুমিই ডাক্তারি করো না, ওষুধ তো আমার কাছেই আছে, নিয়ে যাও। নিয়মমত খাইয়ে দেবে, ব্যস্। আরে, তুমিও তো ফকির! মন্ত্র পড়ে তুমিও তো জল দাও, দাও না? সে জলে এই ওষুধ না হয় দু'এক ফোঁটা ফেলে দিলে, ব্যস্।

ফ্যাঁসফেঁসে ঠাকুর যেন কলিমের মনের কথা টেনে এনে ব্যক্ত করলেন এক উদার 'অনুকম্পার সুরে। অনুকম্পার পেছনে আশঙ্কাও তার কম নয়। ওলাবিবি ঘর ঘর এমনভাবে

বেশি দিন আসর জমালে ঠাকুরকে ধান-টান ফেলে পাত্তা গোটাতে হবে এ বছরের মত।

কলিমের তো হঠাৎ ভেবে হঠাৎ আসা। কিসের টানে এলো—সাবি, না সর্বানু, না লায়লা—হয়ত বা সবারই মিলিত টানে। তবু তার মনের খুঁতখুঁতানি যেতে সময় লাগছিল।

নিয়ম-কানুন বাৎলাতে বাৎলাতে বাড়তি ওষুধের টোপলা থেকে দু' শিশি জলো দাওয়াই হাতে দিয়ে ফ্যাঁসফেঁসে ঠাকুর বারবার সাবধান করলেন,—যাই করো তাই করো ফকির, চক্ সমেত সবাইকে কিন্তু জল ফুটিয়ে খেতে বলবে। তোমরা কোথাকার জল খাও ? কাছারির পুকুরের জল খাও তো ? সাবধান, না ফুটিয়ে খাবে না কিন্তু !

কাছারি-বাড়ির পানি ছাড়া মিঠে পানি পাবে কোথায় চকের লোকেরা ? কোথাও নেই। তবু কাছারি-বাড়ির পুকুরের কথা শুনতেই কলিমের যেন রোখ্ বেড়ে ওঠে। বলে,—কি বললে ঠাকুর, কাছারির পুকুরে বিষ !

—না, না……যে কোন জল খাও ফুটিয়ে খাবে। যে কোনও জল !

অন্যমনস্ক কলিমের কানে শেষ কথাগুলি গেল না, বা শুনেও সে শুনলো না। রোখের মাথায় বা' হাতের মুঠোয় শিশি দুটি চেপে ধরে ডান হাত বাড়িয়ে 'আ-শে' সম্ভাষণের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলল,—ভাটোর টান আসতে দেরি। ডিঙি সড়ায় থাকলো, ঠাকুর। আমি জড়ি-পথ ধরলাম। বলতে গেলে ছুটে এলো সারা পথ কলিম ! এক একবার ছোটে, একবার হাটু ভেঙে চলে। মাথার ফেঁটা চলার ও ছোটার ছন্দে দোলে। শক্ত হাতের মুঠোয় ওষুধের শিশিগুলি যেন ঘেমে ওঠে। ঘাম ছোটে তার মনেও,—মন্তর ! ফকির সে ! বিখালির সাধুবাবাও তো মন্তরের জোরে টিক্‌তে পারেনি। গুরু ঠিকই বলেছিল।……চকের জেম্মা যে তার, এ চককে তার বাঁচাতেই হবে !

বার

কলিম এ যাত্রা চককে বাঁচিয়ে ছিল ঠিকই। সবাইকে রক্ষা করতে না পারলেও, অনেককে তো বাঁচিয়েছে—সর্বানুবিবি, মতিবিবি, ঠাণ্ডাই গাজী, দ্বিজবর কাগের ছেলে, এমনি আরও অনেককে। তা হলেও ওলাবিবির দয়ায় অনেককে প্রাণ দিতে হলো। প্রাণ দিতে হয়েছে অনেক জোয়ান মরদকেও।

ঝিমিয়ে গেছে মঠবাড়ির আবাদ। এমন সময় তো ফি বছর এ গের্দের মানুষ আশা ও আহ্লাদে মেতে ওঠে। সারা বছর নোনা-ফাটা রোদ, বর্ষার নোনা-পচা গন্ধ, মাছি ও মশা, ক্ষেতের জোঁকের কামড় ও প্লাবনের দাপট—সব কিছু পেছনে রেখে হেমন্ত এদের জীবনে আনে জয়ের উল্লাস। মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের উচ্ছ্বাস। এবার কিন্তু সেই মৃত্যুই এনে দিতে চায় অসাড়তা।

মাঠের ধান মাঠেই পড়ে থাকবে বুঝি ! জন কই ! ঘরে ঘরে যে মানুষের অভাব। আবাড়ির ধান কোনবারই চকেব মরদেরা কেটে ঘরে তুলতে পেরে ওঠে না। পরবাসীরা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে এ কাজে মদত্ দিতে। মধুমতীর তাগড়া নমো জোয়ানদের বরাদ্দ এ ক। ওলাওঠা সর্বনাশ ডেকে এনেছে। কেউই এবার এ-মুখো হতে চায় না। মাঘের ধান মাঠেই নষ্ট হবার উপক্রম। হলও তাই। মেয়ে, মরদ, বুড়ো, ছোকরা যে যা পারে বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে হাসি ফোটে না এদের জীবনে।

চকের জেম্মা যার হাতে সে তো মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে কসুর করেনি। কিন্তু এবার অভাব বুভুক্ষা। বাউলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে বনে বনে ঘুরতে লাগলো। বনের ডাকও যে তার

অবহেলা করার উপায় নেই। কাঠের ও গোলপাতার নৌকার এবার ছড়াছড়ি। বড়ব বেতনাই ও করপাই নৌকার বহর আসতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। বাউলেরও বিশ্রাম নেই

এদিকে ওলাওঠার করাল ছায়া কাটতেই আনন্দ গাজী ঘর ঘর ঘোরাফেরায় নে পড়েছে। তার এই ঘোরাফেরাকে কেবল জমি দখল বা হাত বদলের ফিকিরের দর ভাবলে ভুলই হবে। নিজের গোলাজাত ধান আনন্দ গাজী এবার বিলুচ্ছে প্রায় বেহিসেবী মত।

ওলাওঠার জের হিসেবে লায়লার মনে উত্তজনা চলেছে সমানে। সর্বক্ষেত্রে লায় অভাবীদের মুখপাত্র হয়ে আনন্দের কাছে বলতে আসে। লায়লার মুখ চেয়েই বুঝি আন গাজী প্রথম প্রথম হাতের মুঠো আলগা করেছিল।

লায়লা ভেড়ির পথে। সঙ্গে ভোলা বিশ্বেস। ভোলার মাথায় ছালা। ছালায় কোন মো নেই। খালি ছালা, ভাজ করে মাথার ওপর ফেলে রেখেছে। রোদটা বেশ কড়াই। ভো পোদ-পাড়ার লোক। চকের সারা দক্ষিণ ঘেরি বেড় দিয়ে লায়লার কাছে এসেছে। রো ঘেমে উঠেছে।

টিনের চালায় যাবে, মানে আনন্দ গাজীর কাছে। কাছারি ছাড়া এক আনন্দ গাজীরই আবাদে টিনের চালা আছে। ভেড়ির কোলে নেমে হুড়কো ঠেলতেই আনন্দ ব উঠল,—এসেছ! বলি, এইবার নিয়ে কত গোন্ হলো?

—অতো গোন--বেগোনের হিসেব তুমিই রেখো; এসেছি এই ভাগ্যি!

—তাই নাকি! তবে হবে না, যাও।

লায়লা চুপ। থেমে দাঁড়িয়ে গেছে। আনন্দের দিকে একবার তাকিয়েই ঝমাৎ ক পেছন ফিরেছে। মনে হয় যেন হুড়কো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গর্‌গব্ করে ভেড়িতে গি উঠবে।

ভোলা বিশ্বেস তো হক্‌চকিয়ে গেছে। ভেবে পায় না কি করবে সে। ভাবছে, ছুটে গি আনন্দের হাত ধরে কেঁদে পড়বে কিনা। খালি হাতে ফিরে গেলে তার যে আর চলে না পোলাগুলো যে কাল থেকে কিছু মুখে দিতে পায়নি!

আনন্দ তাড়াতাড়ি ছুটে এসে লায়লার সামনে গিয়ে বললো,—আরে অতো গোঁসা কে চলো···চলো। খালি হাতে ফিরতে দিতে পারি! হাজার হলেও বুধো লাঠেলের ভিটে বে এ ভিটেয় বিপদে আশ্রয় পাবে না তাই কি হয়! চলো, কত দিতে হবে, চলে

—না দিতে চাও, দেবে না। আমার কি আসে যায়!

—কার কি এসে যায়! আমারই বা কি এসে যায়!

—যায় না?···যায় না? চকে মানুষ থাকলে তবে তো তাদের ওপর দাপটি করবে

—দাপটি করি না করি, চলো দাওয়ায় বসে হবে!

লায়লা দাওয়ায় বসতে না বসতে আনন্দের হাঁক্ ডাক্ শুরু হয়। ছালা ভর্তি করে ভো বিশ্বেস খুশি মনে ঘরে ফিরল।

শুধু বিশ্বেসই নয়, অনেক ঢালি, মোড়ল, গাজী, সানা ও বক্সই খুশি মন নিয়ে ফিরে বুধো লাঠেলের পো আনন্দের বাড়ি থেকে। প্রতিবারই লায়লাকে সামনে রেখে নারাজ দরাজের মহড়া চলে। নারাজের মহড়া লায়লাকে লক্ষ্য করে। লায়লাকে যেন আ বারবার বলতে চায়, তুমি না হলে দিতাম না ধান, তুমি বললে তবে দিতে পারি। দরাজের মহড়া বুধো লাঠেলের বংশগত। জন-বল যে মহা বল এবং জন-বলই যে অর্থ আনে—আনন্দ তার বা'জানের আমল থেকে তা বহুভাবে পরখ করেছে।

লায়লা প্রথম প্রথম আনন্দের এই দরাজ ভাবে ধান বিলিকে অজানা আশঙ্কায় দেখতো। কি জানি, এর শোধ কি তুলবে না! সুদে আসলে এর মাশুল কি দিতে হবে না এদের! পাটনি সংসারকে কেমন করেই না আনন্দ ভিটে ছাড়া করেছিল।

কিন্তু তারপর কয়েক মাস ধরে বিনা হিসেবেই সে যে-ভাবে ধান ছাড়ল, ততে লায়লা মুগ্ধ।

এমনি মুগ্ধ মনে একদিন যখন লায়লা আনন্দের দাওয়ায় বসে, একলা পেয়ে আনন্দ বলল,—লায়লা! তুমি একলা একলা অমন ভিটে আগলাচ্ছ কেন?......এসো না? আমার কাছেই এসো না?......জানই তো, আমার বিবি তো আসা অবধি যেমন পোলাবান ছিল তেমনই আছে। তুমি এলে তো তুমিই আমার বড়বিবি হয়ে থাকবে। বড়বিবি! ইচ্ছে হয় না?

আনন্দ ভাবতো,—এই কি কখনও হয়, এত ধান লায়লার হাত দিয়ে পার হল, তার ছিটেফোঁটাও লায়লার খলেনে ঝরে পড়েনি! সে কি কোনও সূত্রে তার বাঁধনে বাঁধা পড়েনি? তা হতেই পারে না। এমন হওয়া কি সম্ভব!

অনেকের পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু লায়লা এদিকে কৃচ্ছ্রতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। সেবার পীর বুড়া খাঁর মসজিদকুড়ে গিয়েছিল। নেমাজের দিনে। আসবার পথে প্রমাদি হয়ে আসে। গোলোক-চাঁপা ফুল গাছের তলায় বুড়া খাঁর কবর। সে ফুল গাছে মানত করে ইঁট বেঁধে আসতে দেরি হয়ে যায় দেখে এক সম্পন্ন হিন্দু-বাড়িতে রাতের মত আশ্রয় নেয়। তখন দেখে আসে ওদের ঘরের বিধবারা কেমন করে একাহারী থাকে। তখন অবশ্য লায়লার মনে ছায়াপাত করেনি। আজ অভাবের তাড়নায় তারই অনুকরণে লায়লা একাহারী হয়ে উঠেছে।

লায়লা জোর করে ভাবে, বেশ তো দিন কেটে যাচ্ছে! ভাবলে কি হবে, জোর তো সব সময় খাটে না। আনন্দের মিনতির সামনে লায়লার মুখরা হয়ে উঠবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তারই সুযোগে আনন্দ থেমে থেমে অনেক সময় নিয়ে কথাগুলি বললো।

লায়লার মুখে কোনও সাড়া নেই। ধানের বিরাট মরাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কত ধানই না ধরে! সত্যই আনন্দের মনটা দরাজ। গোলার জানালা খুলে দিয়েছে দরাজ হাতে। লায়লার মাথায় কিসের যেন ঘুরপাক খায়।

দুজনেই চুপ হয়ে আছে। একে অপরের নিঃশ্বাস শুনতে পায়। আনন্দ অস্বাভাবিকভাবে কাছে এসে নিতান্ত ব্যগ্রভরে উন্মুখ হয়ে আছে, লায়লার মুখের কথা শুনবার জন্য। হঠাৎ লায়লা অনুভব করে, কথা তো তার বলতেই হয়; কথা না বললে আনন্দ কি জানি কি করে বসে! প্রথমেই যা মনে এলো তাই বলতে লাগে,—জানো, সেদিন সর্বানুবিবি কি কষ্টটাই পাচ্ছিল! ছট্‌ফট্ করেছে। কচি পোলা তো কেঁদে পাড়া মাৎ করেছে। রক্ষে দিন বাউলে...বা-উ-লে......

লায়লা স্তব্ধ। শেষ কথাটা ঠোঁট থেকে কানে যেতেই স্তব্ধ। সামনে দুরন্ত ফাঁকা মাঠ, আনন্দের মুখের দিকে চাহনি সরিয়ে নিয়ে সেদিকে তাকাল। গোটা মঠবাড়ির সারা দেবালয়ের নীড়গুলি দেখা যায়; কোনও একক নীড়ের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। ঘাস-আগাছায় ঢাকা সমস্ত নীড়গুলিই যেন একত্রে প্রতিবিম্বিত তার চোখে।

—আনন্দ! আনন্দ!—নায়েবের গলার স্বর। পের্‌ভাস নায়েব উপস্থিত। আনন্দ চমক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। লায়লা জড়সড় হয়ে নড়ে বসলো। নায়েব হুড়কো ঠেলে উঠানে এসে পড়েন।

ওলাওঠার দাপট হতেই নায়েব এটা-ওটা ছুতো করে সরে পড়েছিলেন। তখন নায়েবে
কথা উঠলে কলিম বলত,—ওঃ, চাচা-আপন-বাচা!

সেই চাচা-আপন-বাচাকে দেখতে লায়লা একবার আয়ত নয়নে তাকাল। সেই চো
দেখে নায়েব যেন চোখ সরাতেই পারেন ন।

মাথার উপর তবনের ছোট আঁচল শক্ত করে টেনে ধরে শান্ত স্বরে লায়লা আনন্দ
বলল,—আমি এখন যাই। —বলেই কোণাকুণি খলেন পার হয়ে পাশের বাড়ি চলে যায়

নায়েব এবার আবাদে ফিরে এসে খবরাখবর নিতে বেরিয়েছিলেন। আনন্দ কত
কাছারির ধান বাঁচাতে পেরেছে, তারই হিসেব। মুখে সেই সব প্রশ্ন করতে থাকলেও চো
তার লায়লার গতিপথে। লায়লা অদৃশ্য হতে না হতে হঠাৎ বে-খাপ্পা প্র
করলেন,—মাগীটা কে? এই বুঝি তোমাদের লায়লা ঠাকরুণ!

হুঁ,—বলেই চট্ করে আনন্দ ধানের হিসেবের এটা-সেটা অঙ্ক বলতে লাগে অ
হিসেবীর মত।

তের

লায়লাকে সেদিন আনন্দের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়নি। তা না দিতে হলে কি হবে
প্রশ্নের জবাব প্রতি নারীকে তার নিজের কাছে অন্তত দিতেই হয়! তবুও আজ ক'দিন
লায়লা তা না দেবার চেষ্টা করেছে। হাতে কাজ নেই, কিন্তু অকাজে নিজেকে ব্যতিব্য
রাখার বিরাম নেই। বাড়িতে এক দণ্ড থাকে না। এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে সময় কাটা
ক্লান্তও হয়ে পড়ে। ক্লান্ত হয়ে অবশেষে অঘোরে ঘুমোতে চায়।

ঘুমোতে চাইলে কি ছাই ঘুম আসে। রাত পহর খানেক পার হয়ে এলো। চাঁ
আবছায়া আলো মানষালয়, সারা চক্ ও বনের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন গোলপাত
ছাউনিগুলি চাঁদের ঢিমে আলোতেও চিক্চিক্ করে! আবাদের মানুষ সন্ তারিখ বলতে
পারলে কি হবে, তিথির হিসেব এদের উঠতে বসতে। বেশ বলে দিতে পারে, আ
কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী। আর কিছুক্ষণ পরেই জোয়ারের টান ধরবে, তারপর আসবে দু
ভাসিয়ে প্লাবন।

প্লাবনের কথাই লায়লা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। দাওয়ায় মর্জানপাড়ের বারো বছরের ছে
জেরাবদি এসেও শুয়ে পড়েছে। লায়লা অধুনা ওকে রাতের গার্জেন বানিয়েছে। তা
হলে শূন্য আঙিনা যে বড় খাঁ খাঁ করে।

চোখে ঘুম নেই। লায়লা মাদুরের ওপর এপাশ ওপাশ করে। জেরাবদির যেন এক
মনে হলো, ভাবি কান্নার শ্বাস নিচ্ছে। ইচ্ছে করেই লায়লা ওর সঙ্গে ভাবির সম্প
পাতিয়েছে। ভাবিকে সে বরাবরই দেখেছে, গাঁয়ের গিন্নি হিসেবে—কাউকে সে ছেড়ে ক
কয় না, কাউকে সে না ভালবেসেও পারে না। ছোট ছেলে-পিলে হলে তো কথাটি নে
কান্নার শ্বাসে অবাক ও আশঙ্কায় জেরাবদি প্রশ্ন করলো,—ভাবি! ভাবি, কি হলো তোমা
তুমি কাঁদছ?

লায়লা চোখের জল গড়িয়ে পড়তে বাধা দেয় না। তবু হেসে ওঠে, সশব্দেই হেসে উ
বলে,—দূর পাগলা! কাঁদতে যাব কেন রে!

দুজনেই চুপ। লায়লা ঘরে, জেরাবদি দাওয়ায়। সময় কেটে যায়। পাশের ও
শুকনো ডোবায় পাতাড়ি মাছ সশব্দে আফালি দিল।

এবার লায়লা ধীরে ধীরে বলে,—আচ্ছা জেরাবদি সোনা, বলতে পারিস্ মিঠেপানির দেশ ভাল, না নোনাপানির দেশ ?

জেরাবদি সটান্ জবাব দেয়,—মিঠেপানি।

—কেন ?

—কেন, আবার কি ? তেষ্টায় পানি যখন খুশি, যেথায় খুশি মিলবে।

—বা-রে ! মিঠেপানিতে কি নোনাপানির মত ধান পাবি ?

—আর তেষ্টার পানি !!

—তেষ্টার পানি না হয় পেলি, কিন্তু পেটের জ্বালা ?

জেরাবদি সমস্যায় পড়ে। বলে,—অতো জানি না, তেষ্টা তো মিটবে।

—নাঃ, তুই কিচ্ছু বুঝিস্ না—বলে লায়লা পাশ ফিরে বালিশের ভাজে কান চেপে শুলো। মিঠেপানি-নোনাপানির হিসেব অতো পোলাবান কি করে বুঝবে ! হয়ত ঠিক বলেছে, হয়ত ঠিক বলেনি। লায়লা কূল পায় না। মিঠেপানির তল গভীর, নোনাপানিরও তল গভীর।

ক'দিন কেটে গেছে। লায়লা একদিন রাঁধতে গিয়ে দেখে, চাল যা ঘরে কোটা ছিল ফুরিয়ে গেছে। ধান ভান্‌তে হবে। খুশিই হল মনে মনে। এবার একটা কাজের মত কাজ হাতে এসেছে।

উৎসাহে ধানের আউরিতে হাত দিতে গিয়েও তল পায় না। এবার......এবার তাহলে ! জীবনে কোন দিকেই সে তল পায় না।

কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা ছিল ধামায় তুলে বেপরোয়ার মত বাকিটার জন্য বীজধানে হাত দিল। কিছুটা নিয়ে আবার কাদামাটি দিয়ে বীজধানের মৌড়িব মুখ জোরে জোরে অনেকক্ষণ ধরে লেপটে দিতে থাকে। যেন আর তার শ্রাবণের আগে খুলতে হবে না ! মনে মনে বিড়বিড় করে বলল,—কি আর করব ! আসুক বাউলে। দু'একদিনের মধ্যে আসবে নিশ্চয় !

* * * *

সত্যি সত্যি বাউলেও এসে পড়ল বলে। আসবার কথা ছিল না। তবুও আসতে হলো, এক ঘটনার দরুন। তা না হলে, আরও ক'দিন হয়ত কাটিয়ে আসতো আড়পাঙাশিয়ার বনে।

এই খেপে চৈত্র মাসে বাউলে বনে যায়। তারপর দু'বার পূর্ণিমার কাটাল কেটে গেছে। অমাবস্যার কোটাল সামনে। কাঠও বোঝাই প্রায় হয়ে এসেছে।

এবার দলে ভারি। নৌকাও গুণতিতে বারো। জনের হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ জন। মহামারীর দাপটে বাউলে খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। ফলে কলিমের দলও এবার ক্রমশ ভারি হয়ে ওঠে !

দূর দূরন্তর থেকে যারা কাঠুরিয়ার দলে জোটে, তারা সবাই যে বনের নেশায় বা পয়সা ও মারার তালে, তা নয়। অনেকেই আসে দাদনের বাঁধনে। অভাবের সময় দাদনের টাকায় এইসব চাষীদের মহাজনেরা বেঁধে ফেলে বনে যাবার সর্তে। কোনমতে বনের খেপ দিতে পারলেই দাদনের ধার থেকে এদের মুক্তি ! তাই বনের নোঙর তুলবার জন্য দলের বাকজন উশ্‌খুশ্ করতে থাকে।

তা'ছাড়া, আজ দেড় মাসের বেশি বনে এসেছে। কতদিন বাড়া-ভাত খায় না। মন সবারই আনচান্। এখন তো কথা উঠলেই বউ-বিবিদের ছাড়া কথা নেই। বাউলেকেও সেই তালে তাল দিতে হয়।

—তুমি বাউলে কি বুঝবে! বিয়ে সাদির তো ধার ধারোনি!

—না ধার ধারতে পারি, কিন্তু তোদের দেখ্ছি বড্ড নরমপানা। আরে! অতো নরম হোস্ না। জানিস্ তো, মেয়েমানুষ নরমের বাঘ, গরমের শেয়াল।

—আর তুমি বাউলে বুঝি, নরমের নরম আর গরমের গরম!

—দেখছি তোদের উপোসী মনে মেয়েমানুষের বড্ড বাহার লেগেছে!

—লাগবে না! ঝোলপানা মাছ আর ভাতে গালে যে নোনাশেওলা। না আছে ঝাল, না আছে চাট্নি।

—দাঁড়া, কাল তোদের বিবির সোহাগ এনে খাওয়াব। তখন বিবিকে ভুলবি তো?

সবাই ভাবে, বনের মাঝে বিবির সোহাগ, সেটা আবার কি! হবেও বা কিছু! ফকির তো, অসাধ্যি কিছুই নেই!

★ ★ ★ ★

দেবতা গড়াতে গড়াতে আকাশ মেঘলা। বোশেখের দমকা হাওয়াতেও মেঘ কাটে না। টিপ্ টিপ্ করে ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ততক্ষণে সবাই যে যার নৌকায় জড়ো।

বিস্তীর্ণ বাঁশপাতা খাল। বাঁশ গাছের পাতার মতনই। নদীর মুখ বেশ চওড়া হলেও, অনতিদূরে অস্বাভাবিক সরু হয়ে বনের গহনে প্রবেশ করেছে। নদীর মুখ অবধি খালের ভেতর বরাবর সার দিয়ে নৌকাগুলি চাপানো। মাঝ-গাঙে নোঙর কবা। কাছি বেঁধে বনের 'মালো'র সঙ্গে যোগ রাখতে চায় না। রাতের অন্ধকারে তেমন যোগ রাখাও বারণ আছে। মেঘলা আকাশে ইলশেগুঁড়ি পড়লেও বনের আলো তখনও নিস্তেজ হয়নি। নদীর ও খালের এপার-ওপার, চারিদিকে গাঢ় সবুজ বনের পাঁচিল।

বিষ্টি পড়তে যে যার খুপরিতে জমাটি হয়ে বসেছে। খুপরির পাশ থেকে প্রায় সব ক'টি নৌকা থেকেই ধোঁয়া উঠছে। রান্না চাপিয়েছে সবাই।

কলিম খালি বস্তার একটা কোণ আরেকটা কোণের মধ্যে ঢুকিয়ে টোপ বানিয়ে মাথায় দিল। ইল্শেগুঁড়িতে এমন ছাতাই যথেষ্ট, কাজেরও সুবিধা। হোগলার টোপের মত ঢকর-ঢকর করে না, কান ও পিঠের ওপর লেপ্‌টে থাকে। বিয়ের টোপরের মত ছালার এক কোণ মাথার পেছনে উঁচু হয়ে আছে। বেশ দেখায়। আদলই যেন বদলে যায়—আঁধো-আলোয় দূর থেকে মানুষই বলে মনে হয় না।

ঘুঘু-ডিঙি খুলে নিয়ে বাউলে মালোর পানে মুখ করতেই খুপরি থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে বলল,—কি গো ফকির! বিষ্টি মুড়ি চল্‌লে কোথায়?

—আর বলিস্‌নে, বাউলে হয়েছি তো, বাঘের দুধও এনে দিতে হবে! দেখি মেলে কিনা? কাল বলিনি! বিবির সোহাগ খাওয়াব তোদের। দেখি, জোটে কিনা।

—মেঞা ভাইরা! দেখো সবাই, দেখো সবাই, বাউলের পাগলামি!—চিৎকার করে চাউর করে দিল খবরটা।

—পাগল না হলে কি কেউ বিবি ছেড়ে বনবিবির রাজ্যে আসে! কেন আসিস্ তোরা মরতে!—বলতে বলতে বাউলে এক ধাক্কায় ঘুঘু চাপিয়ে দিল ডঙ্গায় ওড়া-ঝাড়ের ওপর

নয়ে।

গামছার ফেটা বাঁধা কোমরে। খুলে নিয়ে অভ্যাস মত পেখম ঝুলিয়ে ছালার উপর দয়েই মাথায় বাঁধল। এবার নিজের চেহারাটা কেমন তা ভাবতে কলিমের হাসি পায়। াসতে হাসতে আঙুল টিপে হাটু ভেঙে এগিয়ে চলল। মাথার উপর বনের পাতার-ছাতা ারে পড়া জলে পলিমাটির প্রলেপ পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্য একটি কেওড়া গাছ। কাল বনে উঠবার সময় সন্ধান পায় এই গাছের। তারই াগ-ডালে কয়েক থোক্ কেওড়া ফল। বছরে এমন সময়ে কেওড়া ফল পাওয়া যাবে, তা াগে ভাবেনি। নৌকার বহর থেকে খুব বেশি দূরেও নয়! তা'হলেও বনের ও ঝোপের াড়ালে।

সুন্দরবনে একমাত্র কেওড়া ফলই মুখে তোলার মত। খেতে টক্। তেতুলের কাজ রে। সেদ্ধ করে নুন জারিয়ে নিলে ভাতের ডেলা এতে গো-গ্রাসে গেলা যায়। চাট্‌নি তো, বিবির সোহাগের মত বৈ কি!

কেওড়া গাছ খুঁজেপেতে নিতে কলিমের দেরি না হলেও, গাছের মগ-ডালে উঠতে দেরি য়ে। ভিজে গেছে, ওঠাও হাঙ্গামা। নিঃসাড়ে উঠবার কথা নয়, তবুও বনে উঠলে বাউলে ানুষের সতর্ক হয়েই চলা দস্তুর। ধীরে ধীরে চুপিসারে উঠছে। থেমে থেমে উঠছে। এবার াগ-ডলের কাছে হাজির। একে একে কেওড়া ফল কোঁচড়ে পুরে ফেলতে লাগে।

কি জানি কেন বাউলে একবার নীচে তাকিয়েছে। তাকাতে হয় না! দূরে চার-পাঁচ হাত ালো লম্বা রেখা। চিনবার জন্য চমক ভাঙার পলক ফেলতে হয় না বাউলের। চার পায়ের াধ্যে দেহ বসিয়ে দিয়ে গলা লম্বা করে ঘাপটি মেরে সুড়সুড় করে নৌকোর বহর মুখো এগিয়ে চলেছে।

মগ-ডালে বাউলে নিমেষে খাঁকার দিয়ে ওঠে,—শালা! ফেরেববাজ! মতলববাজ! —ডালে ঝাঁকি মেরে মোটা ভাষায় অশ্লীল গালি দিয়ে ওঠে।

শূন্যে আওয়াজ শূন্য মনে হয় বন্যজীবের কাছে। আকাশের মেঘ-গর্জন মাটির হিংস্রতম জীব অবহেলা করতে অভ্যস্ত। যে গাছে উঠেছে, সে তো পলাতক! তাকে সমীহ করবার কই বা আছে! তেমনি ঘাপটি মেরেই মাথা ঘুরিয়ে বনের এপাশ ওপাশ একবার দেখে নিল াত্র। তারপর আবার এগুতে থাকে আগের মত সুড়সুড় করে।

বাউলেও বোঝে, নিরাপদ স্থান থেকে হাজার চিল্লিয়েও সুন্দরবনের বড়-মেঞাকে াপদের ভয় দেখান বৃথা। ওর মতলব ও হাসিল করবেই করবে। কয়েক হাতের পানির ্যবধান ওর আক্রমণকে ব্যাহত করবে না। বহর থেকে একজনকে নেবেই নেবে।

তড়াক্ করে মড়্‌মড়্ শব্দে দু'হাতে দু'খানা শিষ-ডাল ভেঙে নিল। নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল াগডাল থেকে মাটিতে। পায়ের চাপে কেওড়া গাছের কয়েকটা নরম শূলো সশব্দে দুমড়ে ভেঙে গেল।

এবার মাটিতে। এবার সমানে সমানে। চোর ধরা পড়লে যে-অবস্থা হয়, বাঘের সেই অবস্থা। তবে চুরি করাটা তার কপটতা মাত্র, আসলে সে দুর্জয়ের প্রতিমূর্তি। চার পায়ে খাড়া হয়ে উঠল। মুখোমুখি! ছালায় আবৃত কিম্ভূতকিমাকার জীবকে চিনতে বোধ হয় খট্‌কা লাগে।

বাউলে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করে। দু'হাতে ডালের বীভৎস ঝাঁকানি আর বিকৃত মুখে হিংস্র গালাগালি। চলাকি দিয়ে ভয় দেখান যায় না, অন্তত সুন্দরবনের নরখাদককে তো নয়ই। এমন মুহূর্তে সত্যি সত্যি রক্ত টগ্‌বগ্ করে ওঠে বাউলেদেরও।

টগ্‌বগে রক্তে দেহে এমন শক্তি জড়ো হয়,—মনে হবে হাতাহাতির আবর্তে পড়লে তারা বুঝি টেনে ছিড়ে ছিড়ে ফেলবে নরখাদককে।

নরখাদক প্রথমে বিদ্যুৎ ঝলকানো দৃষ্টিতে, বিস্ফারিত দন্তে, গিরি-গহ্বরসম কণ্ঠের ঝংকৃত আওয়াজে আর গোলাকৃত ভ্রূ-যুগলের তীব্র ঝাঁকানিতে বিমূঢ় ও সম্মোহিত করতে চায় আস্ফালনকারীকে।

তাতে ব্যর্থ হয়ে চার হাত-পা নেড়ে কোন্ পথে বা কীভাবে সে আক্রান্ত হতে পারে সেই অনুমানে তৈরি হতে থাকে বুঝি। মুখে এবার গোঙানি, দেহে রাগ তুলবার গর্‌গর্ আওয়াজ।

দু-এক পা সামনে এগিয়ে বাউলে আগের মতই আস্ফালন করতে থাকে।

নরখাদক বুঝে নেয় এতক্ষণে,—আস্ফালনকারী পলাতক না হবার স্পর্ধা রাখে, তেড়ে এসেও আক্রমণ করতে চায় না! সমীহ করেছে ওকে। ...এইবার দেহের পেশী শিথিল করে বিকট দু'একটা হুঙ্কার তোলে নরখাদক। যেন জানান দিল,—খবরদার! আর এগুতে এসো না!!

বিকট হুঙ্কার শুনতে না শুনতে, দলের লোকেরা যে যার নৌকোর উপর লাঠি সোটা নিয়ে 'মার শালা, মার শালা' বলে চিল্লিয়ে উঠেছে। পঞ্চাশ জনের একত্রে চিৎকার।

নরখাদক পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। মাটির কাছে মুখ নিয়ে শেষ হুঙ্কার দিতে দিতে চলে গেল, হয়ত বা দূরে আড়াল নিল।

তেমনি দু'হাতে দুই ডাল, কোঁচড়ে কেওড়া ফল, মাথায় ফেটা বাঁধা টোপ্—মুচ্‌কি হাসতে হাসতে কলিম হঠাৎ বহরের সামনে হাজির। বাউলেকে দেখেই ওদের চিৎকাব থেমে গেছে। বাউলে হাঁক দেয়,—চিল্লা, থামিস্ না!

পায়ের এক ধাক্কায় বাউলের ঘুঘু-ডিঙি বড় নৌকার গায়ে এসে লাগে। সবাই একত্রে জড়ো। বাউলের মুচকি হাসিতেও ওদের বুকের কাঁপুনি থামতে চায় না যেন।

—তোরা ঠিকই করেছিস! সাবাস! তোদের চিল্লানিতেই তো সহজে মিটলো। তোদের সাড় না পেলে ভোগান্তি ছিল! সাবাস্!—বাউলের কথা তখনকার মত যেন মন্ত্রের কাজ করল। আত্মবিশ্বাস ধাতস্থ হতে সাহায্য করে ওদের।

সুযোগ পেয়ে কলিম কোচড় থেকে একমুঠো কেওড়া ফল তুলে ধরে বলে,—দেখছিস্ তো! বিবির সোহাগ পাওয়া কি কষ্ট!!

ওরা না হেসে পারে না। কলিমের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখে ও চিবুকে গালাগালির ফেনা তখনও লেগে আছে বীভৎসভাবে। হাসি থামতেই বলে,—যা, এক বদনা মিঠে পানি আন্ শিগগীর! তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে......মিঠেপানি!

চৌদ্দ

রাতের জো'তে কাঠুরিয়ারদল সরে পড়তে চায় বন থেকে। কলিম কিছুতেই আসতে দেবে না। এরা আর কবে কখন বনে উঠবে কে জানে; কলিমকে যে বারবার আসতে হবে বনে। পলাতকও সে হতে চায় না। পলাতকের পক্ষে বনবিবির আশীর্বাদ মেলা ভার।

কাঠুরিয়ারা বলে, আর কাঠ তারা কাটবে না; নৌকা প্রায় সব ক'খানাই তো বোঝাই, আর দরকার নেই এ-যাত্রা। তবুও কলিম ওদের আসতে দেয় না অন্তত রাতের মত। বলল,—কোনও ভয় নেই, নিশ্চিন্তে ঘুমো সব। আমি রাত ভোর পাহারা দেব এই বোঝাই

কাঠের ওপর বসে। হলো তো!

দিলও পাহারা একা একা বসে। কিছুক্ষণ হাসি-মস্‌করা করে খুপরির লোকগুলির সঙ্গে। সপ্তমীর চাঁদ মাথায় উঠতে না উঠতে খুপরির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফকির এবার একা। আকাশে মেঘ কেটে গেছে। বৃষ্টিস্নাত নিস্তব্ধ গহন অরণ্য। সবুজ বনে ও শ্বেত জলধারায় যদি বা কোনও রুক্ষতা থেকে থাকে, সে রুক্ষতাও মোলায়েম করে দিয়েছে সপ্তমী চাঁদের স্তিমিত শুভ্র আলো। ফকির প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে—

ও গুরুর ভাব দাঁড়াবে কিসেরে
মনের মানুষ না হলে।
অগ্নি ম'লো জল পিয়াসে
গঙ্গা ম'লো জাড়ে।
ওরে পানির তলে ঘুঘুর বাসা
হারে ডিম রহিল ডালে,
হারে আসমান জোড়া গাছের গোড়া
জমি জোড়া ডালরে,
ওরে ফুল ছাড়া তোর ফল ধরেছে,
সাঁইজীর হাতে কলরে।
মনের মানুষ না হলে।
ওরে উত্তরে মাথাখানি
পূবে তার হস্ত।
ওরে দক্ষিণে পদ দু'খানি
পশ্চিমে কয় কথারে।
মনের মানুষ না হলে ॥

পরপর ক'খানা ভাবগান গাইল। গান গাইতে গাইতে মনে পড়ে লায়লার কথা। কেমন করে সে না জানি দিন কাটাচ্ছে। অমন মেয়ে হয় না আর! ......আবাদকে যেন দুহাতে আগল দিয়ে রেখেছে। আনন্দ গাজী অমন করে ওর দিকে তাকায় কেন? ভাল লাগে না তার তাকানি। লায়লা কেন তবু আনন্দের বাড়ি আনাগোনা করে। ......করুক, মন যা চায়! মনে পড়ে সেই যে গভীর রাতের অন্ধকারে লায়লার সজল চোখ। ......এবার চকে গিয়ে দেখা হলেই কত মজা করে গল্প করবে 'বিবির সোহাগ আনার' কথা। ......কলিমের ক্লান্ত চোখে ঘুম এসে যেতে থাকে। গোটো হয়ে বসে বসে বুঝি ঘুমিয়েও পড়ে।

পরদিন ওদের বহর আড়পাঙাসিয়ার পেঁখালি বন-কর অপিসে হাজিরা দিতে চলল। বনে প্রবেশ করার সময় যেমন, তেমনি বন ছেড়ে আসার সময়ও বনকর অপিসে সেলাম জানাতে হয়। সেলাম মানে সেলামীও বটে। পাশ নেওয়া ও ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। সেলামীর দৌড়টা ঘটে, নৌকার মাপজোখে আর গুড়ির ঘেরের মাপে। নৌকোর মাপ হয় থোকে—পঁচিশ, একশ' বা হাজার মণী হিসেবে। থোকের মাপে ফাঁক ও ফাঁকিও আছে। এই কাজে বাউলেদেরই সাহায্য করতে হয়। বন-বাদাড়ে বাউলেদের খাতির সর্বত্র, মায় বনকর আপিসেও।

পেঁখালি অপিস হয়ে মঠবাড়ির চকে পৌঁছতে কলিমের দু'একদিন দেরি হল। এসেছে রাতের গোনে। ফুফুকে কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল,—কৈ গা ফুফু! বলি, মাণিক

এসেছে, এবার শানুক পাতো।

বুড়ী ফুফুও রসান দেয়,—শানুক পাতলেই কি মাণিক বসে!

—কেন, কি হলো আবার?

এই তো, দুপুর গোনেই তো। লায়লা এসেছিল। কত করে বললাম, দুটো মুখে দিয়ে যা। তাই কি দেয়! দিলো না কিছুতেই।

—লায়লা ঠাগরোণ! কেন? কিছু বলল?

—না। ও কি সহজে কিছু বলতে চায়!

—তা মরুক গে! আমি তো তোমার পোষমানা মাণিক! এক শানুক কড়কড়ে ভাত সাপটে নেব ঠিক।

ফুফু একটু চুপ হয়ে আছে। হাত পা ধুতে ধুতে কলিম বলল,—কি গো চুপ মারলে যে! কার কথা ভাবছ? লায়লার কথা! ছেড়ে দাও ওর কথা। জানই তো শিকলি-ছেঁড়া টিয়ে পোষ মানে না। ওর দশা হলো গে তাই।

—নে, তুই আর খুট্টুমি করিস্ না। গিলতে বস্ এখন।

সকালে উঠেই কলিম চলেছে ইরু ঢালির বাড়ি। ইরু ঢালি সম্পন্ন গৃহস্থ। সম্পন্ন মানে দু'দশ টাকা ধার কর্জ দিতে পারে। বনে উঠবার আগে ঢালির কাছ থেকে কলিম কিছু টাকা ধার নেয় সংসারের খরচ বাবদ। এবার বউলেগিরি কাজে যা পেয়েছিল তার প্রায় সবটাই নিয়ে চলল ধার শোধ দিতে। ইরু ঢালির বাড়ির পথে পড়বে লায়লার ঘর। ভেড়িতে উঠতেই সর্বানুবিবির মিন্‌সে ইলাহি বক্সের সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই বক্স যেন হাপ্ ছেড়ে বলে,—যাক্, বাউলে তুমি এসে গেছ!

—কেন, তাক্ মারলে যে! সর্বানুবিবি ভাল আছে তো?

—না, তেমন কিছু না। তুমি তো ছিলে না; একটা 'সং' দেবারও লোক নেই তল্লাটে।

—ওঃ, আমি সং দেব, আর তোমরা বুঝি অসৎ কম্ম করে বেড়াবে।

—রগড় না বাউলে, কি কষ্টটাই আজ দু'মাস ধরে! ভাগ্যি লায়লা ছিল। আনন্দ গাজী যেন মন্তাই খুলে দিয়েছে, তাই রক্ষে। কি জানি কি ওর মতলব! লায়লা সঙ্গে নিয়ে গেলেই হলো, খালি হাতে তার আর ফিরতে হয় না। তাই বলছিলাম, লায়লা ছিল তাই রক্ষে।

কলিমের খট্‌কা লাগে। চেপে গেল। মুখে বলল,—ঠাগরোণ না হলে কে বাঁচাবে বলো। সেবার তো তোমার বিবিকে ঠাগরোণই বাঁচাল, তাই না!

কথা বলতে বলতে লায়লার ভেড়িতে পৌঁছে গেছে। খপ্ করে ফকিরের হাত ধরে ইলাহি বলল,—চলো ফকির, তোমার ঠাগরোণের সঙ্গে মোলাকাত করে আসি।

লায়লা ঝাঁটা হাতে করে আঙিনায় গোবর জলের আস্তরণ দিচ্ছিল। ওদের দু'জনকে দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। ক'দিন ধরে ভাবছে, বাউলের সঙ্গে দেখা হলে কি কি বলবে। কত কথাই তো ওর ছিল। কিন্তু সে সব তো একান্তের কথা। তার জন্য সে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। আজ দু'জনকে দেখে যেন একটু বিরক্তও হলো। এর আগে কিন্তু এমন ঘটনায় কোনওদিনই বিরক্ত হয়নি। মনে মনে বোধ হয় ভেঙ্‌চি দিল, একলা আসতে পারা গেল না, সঙ্গী নিয়ে আসা হয়েছে!

কলিমের কিন্তু মনের খট্‌কা-টট্‌কা চাপা পড়ে গেছে। খাসা দেখাচ্ছিল লায়লাকে। এ চেহারা আগে তো কোনদিন দেখেনি। গোবরমাখা ঝাঁটা হাতে, মাথার আঁচলে কোমর জড়ান গিন্নি। বাঙলাদেশের গাঁয়ের ভোরে যত কিছু মাধুর্য, যত কিছু প্রাণবন্ততা তা সবই যেন বাঙলার মানুষের শিশু-মন থেকে গোবর-জলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

কলিম ঝমাৎ করে বলে ফেলল,—কি গো ঠাগরোণ ! ঝাঁটা হাতেই অভ্যর্থনা !
লায়লা লজ্জা পায়। দেহে ঝাঁকা মেরে ঝাঁটাখানা দাওয়ার কোলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলল,—ঝাঁটার মরণ !—বলেই নিজের কথায় নিজে হেসে ফেলে। গোবর জলের ঢিলে যেমন ছিল তেমনই হাঁ করে পড়ে রইল ! ছুটে দু'খানা পিড়ে নিয়ে আসে। কোমর থেকে আঁচল খুলে পিড়ে দু'খানা মুছে দিতে দিতে দ্রুত বলল,—এসো, দাওয়ায় এসে বসো। কাঁচা গোবরজল মাড়াতে হবে না। এ পাশ দিয়ে ঘুরে এসে বসো,...কই !

কলিম ফুক্কুড়ি কাটবে কি, ইলাহি তো লায়লার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লায়লা সবুর না করে ইলাহির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে,—জানো ফকির, আনন্দ গাজী কি সহজে দিতে চায় ধান ! দেবে তো কর্জ, তাও তার হাত সরে না। বললাম. জনই যদি কাবার হয়ে যায় তুমি চকের নোনামাটি ধুয়ে খাবে ! শেষ-বেস্ মন্তাই খুলল। খুললো তো খুললো! এমন খুললো যে ভয় লাগে,—কি জানি ওর মতলব কি ? যাহোক দিলো তো ! মানুষ বাঁচলো তো ! বলিহারি দিতে হয় বৈ কি। তুমি ছিলে না, কোন দিশে পাইনি।

এক নিঃশ্বাসে যেন বলে গেল লায়লা। মুখে খই ফোটার মত। কিন্তু যে-কথা মন খুলে ফকিরকে বলতে চায়, এড়িয়ে গেল। এড়িয়ে গেলেও—প্রায় সব কথাই বুঝি বলে ফেলেছে। কলিম কি মনে করল. কলিমই জানে। মুখে শুধু বলল,—জবর ঘোলায় পড়েছিলে তো !

ইলাহি বলে,—হ্যাঁ গো এখনও পড়ে আছি। গেরহের ফের, কিসে কি হবে খোদায় জানে ! অম্বুবাচি এসে গেল বলে। মাঠে গিয়ে পড়তে হবে, এদিকে ঘরে হাঁড়ি ঠন্-ঠন্।

ফকির লায়লার দিকে তাকিয়ে বলে.—মন্তাই যখন খোলাতে পেরেছ, বন্ধ করতে দিও না। তুমি ঠিক পারবে। বলতো আমিও খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারি।

এরপর আরও দু'চারটে এটা-সেটা কথা হয়। উঠে যাবার সময় বাউলে মিষ্টি হেসে বলল,—ঠাগরোণ, দেখো যেন ! অভাবীর শতেক যন্ত্রণা। মরা গাঙে বড়ো কুমির আসে।

সিক্ত অধরে হাসি টেনে আড় চোখে লায়লা বলল,—কিন্তু যদি জো' আসে ?

—লায়লার কথায় কলিমের যেন হার মানতে ইচ্ছা হলো। হার মেনেই লায়লার মুখের পর হাসতে হাসতে মনের আনন্দে ভেড়ি-পথ ধরলো।

পনের

সেদিন লায়লার কীভাবে কাটে, বলাই দুঃসাধ্য। ঠিক করে ফেলেছে, রাত-ভোর হতেই বাউলের দাওয়ায় যেতে হবে। ভোরে যাবে, আর যত বাধাই আসুক জোর করে বলে ফেলবে তার অনটনের কথা।

যতই আপদে পড়ুক না কেন, কারও কাছে লায়লা এ যাবৎ হাত পাতেনি। এই হাত না-পাতার মাঝে কোনও আত্মম্ভরিতা ছিল না। যেমন করে হোক, দিন কেটে গেছে। মঠবাড়ির চকে এমন হাহাকার তার জীবনে আগে দেখেনি। কাজে অকাজে তার ডাক ছিল, নেমন্তন্ন সাবুদ ছিল ! চলে যেত দিন। পিরথিমে নতুন মানুষ আসা চাষীর জীবনে এক মহা আহ্লাদ। এই আহ্লাদের ক্ষণে লায়লার আদর ছিল অবধারিত। মহামারি যেন চকের জীবনে কয়েক মাস অবধি সে আহ্লাদও সংকুচিত করে এনেছে। লায়লার দিন আর কাটে না।

ভোরে কলিম কেওড়া গাছের একটা ডাল ভাঙছিল। দাঁতন বানাবে। এই দাঁতন মুখে করে একটু এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে আসা ওর চিরদিনের অভ্যাস। সহসা লায়লাকে দেখতে

পেয়ে সটান্ নিজের ছুড়কোতে ফিরে এলো। কাঁধের ওপর গামছা ফেলা আছে, লজ্জা পাবার কিছু ছিল না। বিশাল বুকখানাতে এক গাছিও চুল নেই। তবুও তাড়াতাড়ি গামছা খুলে চাদরের মত বুকখানা ঢেকে ফেলল।

—কি গো বাউলে! গামছা জড়িয়ে বাবু সেজে ফেললে যে!

চোর ধরা পড়েছে। হক্‌চকিয়ে উত্তর দিল,—এমনি! শীত করছিল তাই গায়ে……

—ভিজে গামছায় শীত মানাল!

—রাখো, কি সমাচার বলো—এই ভোর সকালে যে, ঠাগরোণ?

লায়লাকে সুমুখ দাওয়ায় নিয়ে বসিয়ে কলিম আবার বলল,—বলো, কি মতলব?

লায়লা মাটির দিকে মুখ নিচু করে যেন দম আটকে বলে ফেলল,—জানো, আমার বীজ ধানেও হাত পড়ে গেছে।

—সে কি!

—বীজধানও তো প্রায় কাবার হয়ে এলো!

—এমন কথা তো আগে বলোনি!

—কখন বলব বলো, তুমি কি ছিলে ছাই আবাদে?

—কেন, কাল যখন তোমার দাওয়ায়, তখনও তো কিছু বললে না।

—বাঃ, তখন কি বলার কথা। গেলে তো এক সঙ্ সাথে করে।

—কেন, তাতে কি হয়েছে! ধানের কথা বলবে তাতে আবার……

—নাঃ, আমার বুঝি কোনও সরম-টরম নেই।

—দেখো তো, কাল যদি বলতে! তখনও আমার হাত খালি না। এবার বাদায় যা জুটলো, তা তো তখন কাল সকালেই ইরু ঢালির কর্জ মিটিয়ে এলাম। তখন যদি বলতে! তখনই তো যাচ্ছিলাম ইরু ঢালির বাড়ি।

লায়লা চুপ। চলতি ডিঙির গলুই চরে আটকালে যেমন খচ করে থেমে যায়, তেমনি ভাবেই লায়লা থেমে গেছে। এমন ভাবে থেমে গেছে যে বাউলের মুখেও কথা নেই। চরে আটক ডিঙিকে চালু করতে, সামনে ঠেললে হবে না, পিছু মুখো ঠেলতে হবে। সেই পিছু ধাক্কা দিতেই যেন লায়লা এবার হঠাৎ বলে উঠল,—কি রকম মরদ তুমি বাউলে! দুটো টাকাও কর্জ দিতে পার না?

যে অবস্থায় পড়ে লায়লা হাত পাততে এসেছে, তাতে ঠাট্টার কোনও অবকাশ ছিল না। ছিলও না লায়লার সুরে বিন্দুমাত্র তার কোনও আভাস। ধীর স্থির ভাবে যেন কলিমের পৌরুষে আঘাত করতে চাইলো।

আগে থাকতে এর জন্য বিন্দু বিসর্গও কিন্তু প্রস্তুত হয়ে ছিল না লায়লা। তাই নিজের কথাগুলি যেন নিজেই সহ্য করতে পেরে ওঠে না। কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে রইল। বাউলেও রইল। বাউলেও নিস্তব্ধ। কোনদিনও তো লায়লা এমন সুরে তার সঙ্গে কথা বলেনি। আঘাত ও অভিমানে আহত বাউলে শুধু একবার গলায় চাপা খাঁকার দিল।

লায়লা আর একবারটিও বাউলের মুখের দিকে না তাকিয়ে আঙিনা পেরিয়ে ভেড়ি পথ ধরল। কলিম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে লায়লার গতি পথে। পুরু তবনে পায়ের আঘাতে পত্‌পত্ শব্দ ওঠে। দেহের গতি যেন তবনের বেড় মানতে চায় না। একবার তবনের বেড়ে হোচট্ খেয়ে পড়ে যায় যায় বুঝি। অমনি কলিম দাওয়া থেকে তড়াক্ করে উঠে পড়েছে। না, লায়লা সামলে নিল। সামলে নিয়েই আবার চলল, একবারটিও পিছন ফিরে তাকাল না।

কলিম বসেই আছে বার-বাড়িতে। ফুফু একটু পরে এসে বলল—কিরে, লায়লার গলা শুনলাম যেন ?—চমকে ওঠে কলিম। ও বুঝি বাঘের সামনেও এমন চমকে ওঠে না। বলে,—হ্যাঁগো, এই তো এসেছিল !

—এলো, তা একবার বসতেও বললি না ? ভেতরেও একবার নিয়ে এলি না ? তুই যেমন !

—না, ও বসবার নয়। বসতে কি আর চায় ! ছেড়ে দাও ওর কথা, ফুফু।

ছেড়ে দাও বললে কি ছাড়া যায়। কলিম ভেবে মরে, কি দিয়ে কি করবে। অনেক ভেবে ঠিক করেছে, নিধু শিকারির শরণাপন্ন হবে ! কিন্তু তার পাত্তা পাওয়াই যে দায় ! দোকানদারি এখন তার সম্বল। আবাদে দোকানদারির কিন্তু কোনও স্থিতি নেই। বাজার বলে কোনও কিছুই নেই ভাটো দেশে। শুধু হাট। কিছুদূর অন্তর অন্তর এক একটি হাট নদী বা খালের ত্রিমোহানাতে, যাতে নানাদিক থেকে লোক এসে জড়ো হতে পারে। নদীপথে জড়ো হতেও বেগ পেতে হয় না। সপ্তাহে এক-এক দিনে এক-এক জায়গায় হাট। দোকানদারদের নৌকোতেই থাকতে হয়। বাসা বা মালখানা ওদের নৌকোতেই। জোয়ার ভাটা গুনে গুনে এ-হাট সে-হাটে বিকি-কিনি করে বেড়ায়।

রবিবার বড়দলের হাট, সোমবার বগার ও হোগলার হাট, মঙ্গলবার বেনেখালির হাট, বুধবার সূতীর হাট, বিষ্যুৎবার খড়েলকাঠির হাট, শুক্রবার আমাদির হাট, শনিবার ঘুঘরোঘাটির হাট—রবিবারে ফিরে আসে আবার বড়দলের হাট। এ তো গেল যে-সব হাটে জো'তে গিয়ে সেই ভাটায়, বা ভাটায় গিয়ে সেই জো'তে ফেরা যায়। এ ছাড়া আছে অগুনতি হাট এই গের্দ ছাড়িয়ে।

হাটের দিনে এই সব ত্রিমোহনাতে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। পরদিন আবার যেমন তেমনি, যেন খাঁখাঁ করতে থাকে। লোক নেই, জন নেই, চার খুঁটির মাথায় কয়েকটি ছাউনি হয়ত দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। আর চারিদিকের অপরিসর চত্বর বনের হরিণের চটের মত অজস্র পদচিহ্নে জর্জরিত হয়ে পড়ে আছে।

এমনি কোন এক হাটের দিনে বেলা থাকতে ধরতে হবে নিধুশিকারিকে। চকের লোকেরা সব হাট ধরে না, ধরার আবশ্যকও নেই। পরপর হাটগুলির জন্য হাটুরে ডিঙ্গি পাওয়াও যায় না। তাই কলিমের হাটে হাটে নিধু শিকারির খোঁজ নিতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

নিধু শিকারি কলিমের অতীত জীবনের যেন এক সাক্ষ্য। ওকে দেখলেই অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ে কলিমের। 'কেমন তুমি মরদ, বাউলে !'—এই কথাটা আজ কলিমকে অতীতে নিয়ে ফেলেছে। অতীতের জাবর কেটে রসসিঞ্চিত হয়ে যেন সে বাঁচতে চায়। তাই নিধু শিকারির শরণাপন্ন হবার কথা প্রথমেই মনে হয়েছিল।

নিধু শিকারিও হতাশ করেনি ; বলে,—তা আর এমন কথা কি ! ওলাওঠার দিনে তুই যে কি করে আমাকে বাঁচিয়েছিলি ! তাই তো আজ পোলাদের যে করে হোক মুখে দুটো অন্ন জুটছে।

কলিম কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে,—প্রাণ বাঁচে তো, মান বাঁচে না। প্রাণ বাঁচান বোধ হয় সোজা, মান বাঁচানই দায় দেখছি, চাচা !

শিকারিকে কলিম সব কথা খুলে বলেনি। সে নিজের মত করে বুঝে নিল ; বলল,—তুই আমার কাছে কর্জ মাগুলি, তাতে মানের কথা তুলিস্ কেন ?

—না চাচা, ও এক কবি-গানের ধূয়ো কপ্চালাম। কি ঝকমারি বলো তো, বাদায় উঠে